অনেক সাগর পেরিয়ে

১ম সংস্করণ

ভাদ্র : ১৩৬৪

প্রকাশক

শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ

১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

কলিকাতা-৩।

একমাত্র পরিবেশক

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ

পত্রিকা হাউস। কলিকাতা-৩।

মুদ্রাকর

শ্রীঅজিত মোহন গুপ্ত

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

৭২।১, কলেজ ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

এক্‌স্ এল ষ্টুডিও

দাম : চার টাকা

অনেক সাগর পেরিয়ে

চিত্রিতা দেবী
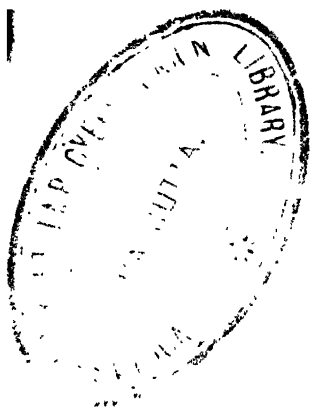
প্রজ্ঞা প্রকাশনী

১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন

॥ কলিকাতা—৩ ॥

।। গোড়ার কথা ।।

দেশভ্রমণের সখ আর পাঁচজনের মতই ছোটবেলা থেকে আমারো মনে স্বপ্নের জাল বুনত। কিন্তু সেই দিবাস্বপ্ন যে কোনদিন অপেক্ষাকৃত সত্যভাবে আমার এই অর্দ্ধসত্য জীবনের দ্বারে এসে পৌঁছবে, একথা কে ভাবতে পেরেছিলো?—দিন কাটত ঘরের কোণে। খাঁচার পাখীর কাছে খাঁচার মত ঘরের দেয়ালগুলিই অতিমাত্রায় সত্য হয়ে দেখা দিত চোখের সামনে। সেই বদ্ধজীবনের নিশ্চিন্ত আরামের সুখকে যখন ভালোবাসতে শিখে নিয়েছি, এমন সময় হঠাৎ এল দূরের ডাক।—শিশুকালে যে ডাক শুনতে পেতাম ছুটির দুপুরে নীলাকাশের ইসারায়,—মাঝে মাঝে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার চূড়ার ভঙ্গীতে,—ভূগোল আর ভ্রমণ কাহিনীর পাতায়, তারা সবাই যেন একসঙ্গে কাণের কাছে এসে ড্রাম বাজাতে লাগল।—আমি লাফিয়ে উঠে বললাম,—যাব।

তখন ১৯৪৭ সাল। এপ্রিলের মাঝামাঝি।—যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে সৈনিকের পদধ্বনি তখনো থামে নি। তাদের বীরদর্পে তখনো মেদিনী টলমল। তখনো সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনে যুদ্ধের বিভীষিকা ছায়া মেলে আছে। তখনো কত মায়ের সন্তানরিক্ত কোল থেকে থেকে হাহাকার করে উঠছে।—দুঃখশোক ইয়োরোপের ঘরে ঘরে উথলে উঠছে। মৃত্যু এসে হানা দিয়েছে সুখের বাসায়।—আর জীবন হয়ে উঠেছে

মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ। দুর্ভিক্ষে আর দারিদ্রে আর অসম ধনের বিষম ভারে জর্জরিত ভারতবর্ষের গ্রামে নগরে তখন সুরু হয়েছে আর এক তাণ্ডব লীলা—ধর্মের নামে মিথ্যা দোহাই দিয়ে মানুষের প্রাণ নিয়ে অকারণে ছিনিমিনি খেলা। নিতান্ত সাধারণ পোষমানা জীবনের ঘরোয়া ঘরের মাঝখানে হঠাৎ ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠেছে হানাহানির তরোয়াল;—ছোট ছোট দুঃখ সুখগুলি রক্তে লাল হয়ে বীভৎস হয়ে উঠেছে;—হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে মানুষ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাতে সুরু করেছে;—আত্মসম্মান, সততা, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি বড় বড় কথাগুলো নিতান্ত ছোট হয়ে তুচ্ছ হয়ে কোথায় পড়ে গেছে ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না, হঠাৎ যেন ঘরের সামনে একটা অন্ধকার ঝড় প্রচণ্ড গর্জনে বইতে আরম্ভ করেছে; আর ঠিক এই সময়েই হঠাৎ দেখা গেল ভারতবর্ষের বহু যুগের দিবাস্বপ্নে যেন একটা সত্যের আভা এসে পড়ছে। যেমন গুমোট গরমে আম পাকে, তেমনি দারুণ দুঃখের দুরন্ত গ্রীষ্মের ছোঁয়ায় স্বাধীনতার ফলটিতে হঠাৎ যেন রং ধরতে সুরু করেছে।

কিন্তু বিরাট যখন তার বিরাট ব্যাপ্তি নিয়ে সমগ্রকে গ্রাস করে, তখনো প্রতি বিশেষ কণা তার বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে পারে না।—তাই যখন মানবজীবন নিয়ে দেশে দেশে ক্রিকেট খেলা চলছিল, তখনো প্রতি মানুষ তার বিশেষ দুনিয়াটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। নিজের সুখদুঃখ হাসি কান্নায় গড়া মানুষের বিশেষ জীবনভূমি বিশ্ব মহাজীবনের অন্তর্গত বটে, তবু তা তার নিজেরও;—সেখানে তার নিজের আশা, নিজের স্বপ্ন, নিজের ভবিষ্যৎ—রঙিন মূর্তি নিয়ে মন ভোলায়। আর নিজের দুঃখ নিজের আশাভঙ্গ অন্ধকার ছায়া ফেলে, বিরাটকে আড়াল করে রাখে।—বিশ্বের সঙ্গে যার আদি অন্ত যোগ, বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করেই তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

তুমুল ঝড়ের দাপটে যখন সারা ভারত বিপর্যস্ত—তখনো সেই ঝাপটের প্রতিক্রিয়া প্রতি বিশেষ ঘরে বিশেষ রকমভাবে পড়েছিল।

সেই রকমই একটা বিশেষ ঘরে, আমরা প্রিয় পরিচিত ক'জন মিলে একটা বিশেষ দুনিয়া বহন করে চলেছিলাম। চারিপাশের ঘনঘটাচ্ছন্ন দুর্দিনের মনস্তাপ ও হতাশ্বাসের ছায়া বারবার সে-ঘর অন্ধকার করে তুলছিল,—তবু তারি মধ্যে আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত ছোট একটা আশা হঠাৎ সফল হতে এগিয়ে এল ;—বহুদিনলগ্ন একটা অর্দ্ধবিস্মৃত স্বপ্ন বাস্তবকে ছুঁতে এল।—সুযোগ এল বিদেশ যাত্রার।—কিন্তু এমন সময়ে, যখন তার স্বাদ গেছে চলে, ধার গেছে মরে ; এখন গেলেও যা, না গেলেও যেন প্রায় তাই।—যে ইয়োরোপ কল্পনায় ছিল, আর যাকে বাস্তবে দেখতে পাব, —তারা কি এক ?—"না কখনোই নয়",—ভয় দেখাতে এগিয়ে এল পাঁচজন, বিশেষ করে যারা একবার ওদেশে ঘুরে এসেছে। বল্লে,—সুখের স্বর্গ এখন যুদ্ধ-দানবের অত্যাচারে ভেঙে-চুরে তছ্‌নছ্‌ হয়ে গেছে।—এখন সেই ভাঙা হাটে কি দেখতেই বা যাবে ?—কেউ বল্লে,—খেতে পাবে না।—কেউ বল্লে,—শুতে পাবে না। বিছানা যদি বা জোটে তার নীচে লেপ নেই,—কম্বল যদি বা জোটে তার নীচে চাদর নেই।—কেউ বল্লে, ধোপা পাবে না। নিজে কাপড় কাচতে হবে।—কেউ বল্লে, সাবানই পাবে না, তা আবার কাপড়কাচা।—অবাক কাণ্ড! যুদ্ধে কি বিলেতের বাজার থেকে সাবানও উঠে গেল—সাধারণ পাড়াগাঁয়েও তো ওসব জিনিষ মেলে,—আর সেখানে,—না সাবান, না তেল,—না দাঁতমাজন !—"নয়ই তো," হিতৈষীরা বল্লেন,—তাছাড়া পাড়াগাঁয়ের সুবিধেটুকুও নেই, এমন কি একটা নিমগাছও পাবে না যে ডাল ভেঙে ভেঙে দাঁতন করা চলবে।—

এদিকে আমার যিনি escort, অর্থাৎ রক্ষক, তিনিও ওদেশটা

আগেই ঘুরে এসেছেন।—তিনি হেসে বল্লেন—"ওসব দাঁতন টাতন সঙ্গে নেবার কিছু দরকার নেই, খুব কম জিনিষপত্র নিয়ে চল।—যতই যুদ্ধ হোক, সবই সেখানে পাওয়া যাবে।—র‍্যশন আছে তাতে কী? গিয়েই কার্ড করিয়ে নেব।"

কিন্তু বেশী পরিচিতদের চেয়ে স্বল্প পরিচিতদের উপরেই মানুষের বিশ্বাস বেশী; বিশেষত সঙ্গে আছে ছোট মেয়ে;— যদি অসুখ করে যায়। দিশী ওষুধ তো আর ওখানে পাওয়া যাবে না;—তারপরে ঘোড়া আর অক্টোপাসের মাংস খেয়ে যদি কিছু একটা ঘটে যায়;—তাই বেঙ্গল কেমিক্যালের জয় ঘোষণা ক'রে 'যোয়ানের জল' ইত্যাদিরাও সঙ্গে চলল। অগত্যা আমার সঙ্গী মুচকি হাসলেন,—"কপালে তোমার দুঃখ আছে;—ঘোড়ার মাংস অত সস্তা নয়;—পাবে কোথায় অত ঘোড়া? তুমি কি ভেবেছ, ওখানে সেই মোগল আমলের মত কেবল সওয়ারী লড়াই চলেছে? আর যত লড়াইএর ঘোড়া, সব ইংলণ্ডে চালান যাচ্ছে তোমার পাতে পড়বার জন্যে?"

কথাটায় যুক্তি থাকলেও, 'যদির' কোন যুক্তি নেই।—হিতৈষীদের সেই 'যদি'র তাড়ায় আমি একটা প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কে রাজ্যের টিনের খাবার, টিনের দুধ,—যার অধিকাংশই ওদেশ থেকে টিনজাত হয়ে এখানের বাজারে আবির্ভূত হয়েছে,—সাবান, তেল, স্নো, পাউডার, ওষুধ বিষুধ বোঝাই করে নিয়েছিলাম। সেই ট্রাঙ্ক যখন ওদেশে গিয়ে খোলা হোল, তখন সবাই হেসে আকুল;—এসব কি! এত সাবান, টুথপেষ্ট?—এসব দিয়ে হবে কী? তুমি কি আফ্রিকার interiorএ কোন গভীর অরণ্যসঙ্কুল প্রান্তে যাবে বলে তৈরী হয়ে এসেছিলে নাকি?—এই সব অদ্ভুত জিনিষ নিয়ে এসেছ?—ইংলণ্ডে সাবান পাওয়া যায় না?—"হ্যাঁ, না, মানে ঠিক তা নয়,"—আমি একটু চাল দেখাবার চেষ্টা করি;—"এই সব বিশেষ makeএর দেশী সাবান, দেশী তেল ব্যবহার করা অভ্যেস কিনা তাই।" "ও হ্যাঁ

তাও তো বটে!" কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবার আগেই বিশ্বাসঘাতকের মত উনি বলে উঠলেন,—"না হে না, ইংলণ্ডকে ও ঐ ধরণেরই কিছু ঠাউরেছিল—ভেবেছিলো যুদ্ধের তাড়ায় তোমরা সবাই সাবান মাখা দাঁড়িকামানো ছেড়ে দিয়ে হাফব্রহ্মচারী বনে গেছ।" ব্রহ্মচর্য নিয়ে সেদিন খুব খানিকটা হাসি ও আলোচনা চলেছিলো।—সে যাই হোক, খাবারের টিনগুলো দেখে ওদের চোখে যে চক্‌চকে আলো জ্বলে উঠেছিলো, আমি তা দেখতে পেয়েছিলাম।—বিশেষত 'সসেজ' জাতীয় মাংসের খাবারগুলি।

ওরা টিনগুলি উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল।—ওমা এযে ওয়ালস্‌। এই সসেজগুলি খুব ভালো,—আঃ এটা বেস্ট, এসব তোমরা কেন এনেছ?—ওরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। সেই মুহূর্তে মন তার কাজ ঠিক করে নিলো, যা সে আগের মুহূর্তেও ভাবে নি,—মুখ তার বাহন হয়ে বলে গেল,—

—"কেন এনেছি?—বল দেখি?"—আমি হাসলাম,—"তোমাদের জন্যে।"

"সত্যি?" ওরা লাফিয়ে উঠল—"না না ওসব হয়ত তোমরা নিজেদের জন্যেই এনেছিলে।"—

—"সত্যিই তোমাদের জন্যে।"

—"বেশ তবে তুমিই ভাগ করে দাও।"

চকোলেটের বাক্স পেয়ে শিশু যেমন খুসী হয়, এই খাবারের টিনগুলি পেয়ে সেদিন বয়স্ক মানুষেরা তার চেয়ে কিছু কম খুসী হয় নি।—কতকাল এরা এসব জিনিষ চক্ষে দেখে নি।—চেডারের চীজ টিনজাত হয়ে চলে যেত বিদেশে—বেশী দামে বিকোবে বলে;—দেশে আসবে আরো স্টার্লিং।—ভালো ফল ভালো মাংস পৃথিবীময় ছড়িয়ে যেত সৈন্যদের খিদে মেটাতে। তাই গত ছ'বছর ধরে অশনে বসনে শ্রমে বিশ্রামে এদের কৃচ্ছ্র সাধন করতে হয়েছে।—যারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে লড়াই করতে পারে নি—দেশে বসেই তারাও

লড়েছে।—ক্ষুধা ও লোভ সংযত করার এই লড়াই, কেউ বা করেছে সগৌরবে, কেউ বা দায়ে পড়ে মেনে নিয়েছে।—এমন সময় দূর ভারতবর্ষ থেকে কে তাদের জন্যে মনে করে নিয়ে এল, তাদেরই দেশের টিনের প্যাকেটে করা সসেজ।—কি বলে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পেল না ওরা। সেদিন রাতে সবাই চলে গেলে, আমরা দু'জনে একসঙ্গে স্বীকার করেছিলাম যে, ভাগ্যে টিনগুলো সঙ্গে এনেছিলাম।

সেই আমার প্রথম বিদেশ যাত্রা।—প্রথম সমুদ্রযাত্রাও বটে।—কে জানে কেন হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করেছিলেন। সে যুগেও কি বত্রিশদাঁড়ী নৌকায় করে ভাগ্যান্বেষী সওদাগরপুত্রেরা ভাগ্যের খোঁজে বিদেশে গিয়ে শেষে সেই ভাগ্যকেই বিকিয়ে আসত? তাই কি রাজনীতির প্রয়োজনকে শাস্ত্রে বচনের হুমকি দিয়ে মানানো হত?—কে জানে কেন,—সে যুগের খবর জানি না। কিন্তু এ যুগে দেখছি ভারতবর্ষে আবার সমুদ্রযাত্রা নিষেধ হোল।—সে যুগে ছিল শাস্ত্রের নিষেধ। এ যুগে আইনের। তাই এখন ভাবছি, ভাগ্যে এ ক'বছরে সমুদ্রপারের কিছু কিছু দেশ দেখে এসেছি।

সেবারে জাহাজে উঠে প্রথম চমকটা লেগেছিলো খুব। তখন যুদ্ধশেষে সাধারণ যাত্রীর সমুদ্র পথে যাবার ছাড়পত্র সবে মিলেছে। এতকাল বিলাসতরণীগুলি যুদ্ধজাহাজে রূপান্তরিত হয়ে, মারাত্মক সব অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দলে দলে সৈন্য নিয়ে সাগর পারাপার করত। তখন সবে তারা তাদের অস্ত্রসজ্জা পরিত্যাগ করে অসামরিক যাত্রীদের জন্যে কিছু কিছু যায়গা ছেড়ে দিতে সুরু করেছে। হাজার দেড়েক সৈন্য আর শ'তিনেক যাত্রী নিয়ে,—সে জাহাজ পনেরো দিনে চারটে সাগর অতিক্রম করে আমাদের ইংলণ্ডে পৌঁছে দিয়েছিলো। সমুদ্রে তরণীবাসের

সেই প্রথম অভিজ্ঞতার কাহিনী ফিরে এসে 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেছিলাম।—এ বইয়ের প্রথম কাহিনী সেইটেই।—

সেবারে ইয়োরোপ ও ইংলণ্ড ঘুরে ফিরে আসার পরে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন,—ভ্রমণ কথা লিখুন। কিন্তু বারে বারেই আমার খটকা লেগেছে। ইয়োরোপ তো আজকাল প্রায় ডালভাতের মতই পরিচিত। সবাই তো তাকে অতি-মাত্রায় জানে। সে নিজেই তো তার কথা আজ কতকাল ধরে বলে আসছে,—গল্পে প্রবন্ধে কবিতায়।—শুধু কি এই?—তার সঙ্গে আরো কত নিগূঢ় কঠিন পরিচয় আমাদের বেঁধেছে পাকে পাকে। তার লোভ ও অত্যাচারের কত অপ্রকাশিত কবিতা আজো আমাদের মর্মে মর্মে দংশনমুখর ভ্রমরের মত ভোঁ ভোঁ করে ফিরছে। ইয়োরোপ, বিশেষত ইংলণ্ডের বিষয় আমি কি বা বলব—ইংলণ্ডের প্রধান সহরগুলির বিপুল বিচিত্র ঐশ্বর্যসম্ভারের কথা জানে না এমন লোক বিরল।—তার পাতালপুরীর বিদ্যুৎ ঝলকিত ট্রেন, তার এস্কেলিটার সিঁড়ি, তার বিরাট বিরাট সব হোটেল,—তার ওয়েস্টমিনিস্টার, সেণ্টপল্‌স, আর তার পার্লামেণ্ট, এসবের খবর কে না জানে।

সেবারে মনে আছে আমরা পার্লামেণ্টে ডিবেট শুনতে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল সাংবাদিকের কার্ড।—বসার যায়গা পাওয়া গেল ভালোই। তখন হাউস অব কমন্সের সিটিং বসত হাউস অব লর্ডসে। কারণ কমন্সের নিজস্ব বাড়ীর কিছুটা গিয়েছিল বোমায় উড়ে। লাল ও সোনালী গিল্টী করা দেয়াল, লাল কার্পেট মোড়া ঘরে লাল গদীর আসনে বসে আমরা সেদিন শ্রীযুত এটলির বক্তৃতা শুনেছিলাম।

যতদিন যুদ্ধ চলছিল, চার্চিল ছিলেন দেশের কর্ণধার।—যুদ্ধের প্রয়োজনে, শ্রমিক দলও নীরবে মেনেছে টোরী সরকারের সিদ্ধান্ত।—কিন্তু যুদ্ধ শেষে ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গী গেল বদলে।—

শ্রমিকদল বসল এসে কর্তার গদীতে। নতুন ভাবে দেশকে গড়ার নতুন পরীক্ষায় তখন ব্রিটেনের যুক্তরাজ্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।—সেই ব্যগ্রতায় ভারতের স্বাধীনতার ফলটী তাড়াতাড়ি পেকে উঠল।

মনে আছে সেটা স্মরণীয় দিন। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে তার নাম। ভারতের উপরে শ্বেতপত্র, অর্থাৎ white paper পড়লেন শ্রীযুক্ত এটলী।—ভারতকে স্বাধীনতাদানের প্রতিজ্ঞাপত্র। শুনতে শুনতে বিরুদ্ধভাবে মন উদ্বেল হয়ে উঠল।—ভালো লাগল, তবু যেন পুরোপুরি লাগল না। কোথায় যেন খিঁচ রয়ে গেল।—দেশ তবে সত্যিই স্বাধীন হোল!—একবছর আগেও যা ছিল নেহাৎ জল্পনা কল্পনা, তা সত্য হয়ে দেখা দিল,—কিন্তু এ যেন কেমনতর আসা! কেমন যেন পানসে পানসে স্বাদ এর, মুষড়ে পড়া রূপ। স্বাধীনতা তার সাজ তাজ খুলে ফেলে যেন নিতান্ত সামান্য বেশে নতমুখে এসে দাঁড়াল। আমাদের অঞ্জলিবদ্ধ ভিক্ষুহস্তে কারা যেন অতি সাবধানে ফেলে দিল ভগ্ন স্বাধীনতার দ্বিখণ্ডিত ফল। আমরা নিজেই কেন লাফিয়ে উঠে পেড়ে নিতে পারলাম না সেই ফল?—কেন নিজের ধন চোরাবাজারে কিনে নিতে হাত পেতে দাঁড়ালাম?

চার্চিল উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষকে সমর্থন করলেন;—বোধহয় জীবনে এই প্রথম;—বল্লেন, এতো আমাদেরই পরিকল্পনা। আমরা তো বহুদিন ধরেই এই প্ল্যান করে আসছি।—কবে কিভাবে ভারতকে স্বাধীনতা দিতে পারব!—সেই আমাদেরই স্কীম যে অপরপক্ষ গ্রহণ করেছে, এতেই আমরা খুসী।

পরদিন থেকে সুরু হোল সব খবরের কাগজ জুড়ে ইংলণ্ডের আত্মস্তুতি।—কী স্বার্থত্যাগ, কী আত্মত্যাগ, কী মহান মনুষ্যত্ব ও মর্যাদাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, ইংলণ্ড আজ ভারতকে স্বাধীনতা দিল,—তারি ব্যাখ্যা।—এই দানক্রিয়া ঘটানোর মধ্যে

ভারতের দিক থেকেও কিছু কি অবদান ছিলো?—তার যুদ্ধপদ্ধতি তার অস্ত্র ব্যবহারের মধ্যেও কিছু কি অভিনবত্ব ছিল?—কে জানে? —অন্তত ইংলণ্ডের কাগজগুলি থেকে সেকথা অনুমান করার উপায় ছিল না। ওরা কাগজের মারফৎ প্রমাণ করে দিল যে, ভারতকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিকযুগের চৌকাঠ পার করে আনবার যে দায়িত্ব ব্রিটীশ সরকার একদিন গ্রহণ করেছিল, দীর্ঘদিন ধরে ধীরে ধীরে সে দায়িত্ব পালন করে আজ ব্রত সফল হোল তার,—পূর্ণ মনস্কাম।

শুনে শুনে যেন জ্বলুনি ধরে গায়ে,—ইচ্ছে করে খুব কষে একটা প্রতিবাদ করি।—ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন খুব উৎসাহ করে বল্লেন,—"লিখুন না সত্যি;—খুব একটা বিদ্রূপ করে লিখুন"। অন্যেরা বুদ্ধিমান বেশী; বললে, লিখে শুধু সময় নষ্ট হবে,—কারণ কেউ ছাপবে না। সব এক প্রপাগাণ্ডা চালাতে চায়,—তার মধ্যে বিরুদ্ধ সুর কেনে নেবে তারা।—ভারতের কৃতিত্ব স্বীকার করতে গেলে, ইংলণ্ডের কৃতিত্ব কিছু কমাতে হয়।—তাতে কেন রাজী হবে?—এরা যে দেশভক্ত জাত;—আর যদি বা ছাপে, দেখবেন তার কথাটথা বদলে এমন মোড় ঘুরিয়ে দেবে যে আপনার বক্তব্যই যাবে উল্টে।

কথাটা সত্যি। কাজেই হজম করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের উপরে প্রভুত্ব করার সুযোগ ওদের চিরকাল আমরাই দিয়ে এসেছি। আজ জাতীয় জীবনের এই পরমসন্ধিক্ষণে দিলাম তাদের মুরুব্বিয়ানা করার সুযোগ।—এমনি কত সুযোগ হয়ত আরো কতকাল দিয়ে চলব তার ঠিক কী?—কারণ আমরা তো দেশভক্ত নই—বিদেশভক্ত।—পৃথিবীতে আমাদের জাতের ঐটেই বৈশিষ্ট্য।—বিদেশের সব কিছুই আমাদের ভালো লাগে।—ঘরের চেয়ে পরের আদর বেশী।—নিজের ঘরে নিজের লোক শুকিয়ে মরছে, তবু ক্ষুদকুঁড়ো যা আছে তুলে দিই অতিথির পাতে।—

অতিথি মনে করে—বটেই তো, এই তার প্রাপ্য।—আমরা যখন বিদেশের গুণগানে মুখরিত হয়ে উঠি, ওরা ঠোঁট চেপে অল্প একটু হেসে বলে,—বাঃ বাঃ, লিখেছো ভালো,—বলেছ বেশ। কিন্তু আমাদেরো যে কিছু ভালো গুণ আছে, তাও যে উল্লেখযোগ্য সে কথা ওদের সাহিত্য থেকে বোঝবার যো নেই। ভারতবর্ষ যেন হাফ আফ্রিকা আর হাফ মেসোপটেমিয়া।—অর্দ্ধেক বন্য আর অর্দ্ধেক অতীত।—যার বর্তমানই নেই তার ভবিষ্যতের কথা কেই বা বলছে আর কেই বা শুনছে। এমন কি বুক অফ নলেজ, প্রভৃতি সব সাধারণ জ্ঞানের বইতে—ভারতের কথা এত কম যে নিজেদেরই পড়তে যেন লজ্জা হয়।—অথচ আমাদের নিজেদের হাতেও সে লজ্জা দূর করার উপায় নেই। কারণ আমরা নিজেরাই বা কতটুকু জানি।—ভারতবর্ষের বিষয়েও আমাদের যা কিছু জ্ঞান তার বেশীরভাগ ওদেরই পাঠশালায়। ওদের ইস্কুলে না শেখা, নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে আজো আমরা বিশ্বাস করি না।—পাঁচটা ইংরেজী লেখকের উল্লেখ না দিয়ে কোন সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার করা চলে না।—আজকাল তো দেখি, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আলোচনা করতে বসেও নব্য লেখকেরা ইয়োরোপীয় অথরদের মতামতের উপর নির্ভর করতে সুরু করেছেন।—বিলিতী লেখকের প্রামাণ্য বেদপ্রামাণ্যের বাড়া হয়ে উঠেছে।—নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলার মত মনের স্বাধীনতা আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। হাজার বছরের পরাধীনতার এই বুঝি চরমতম কুফল—চিন্তাকেও পরমুখাপেক্ষী করে ফেলা! পরমুখ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে চিন্তা আপন দেহকে পুষ্ট করবে মাত্র, তারপরে নববলে বলীয়ান হয়ে জেগে উঠবে।—চিন্তার এই তেজোদ্দীপ্ত জাগরণীর কোন আভাস আজো দেখা যাচ্ছে না। আমাদের দেশে আধুনিকযুগের খাতায় যারা কবি, শিল্পী, পণ্ডিত ও জ্ঞানরসিক বলে নাম লিখিয়েছেন, ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে নিচ্ছেন

নিজের ভোগে অর্দ্ধশিক্ষিত জনগণের ব্যগ্রমনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ;—তাঁদের অনেকেরই লেখা ও কাজের মধ্যেও তো ইয়োরোপের উচ্ছিষ্টের চর্বিতচর্বন ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখতে পাওয়া যায় না।—"খাদ্যের দুর্ভিক্ষের চেয়ে জ্ঞানের দুর্ভিক্ষই আমাদের বড় সমস্যা," রবীন্দ্রনাথের এই সত্যবাণী আজ মর্মে মর্মে বোঝা যাচ্ছে।

কাজেই আরো কতকাল কত নিন্দাবাদ যে ভারতকে সহ্য করতে হবে, কে জানে।—নিন্দায় ক্ষতি নেই, যদি না তার কারণের মধ্যে কোন সত্যতা থাকে।—অর্থাৎ কাণাকে কাণা বল্লেই তার গায়ে বাজে। পদ্মলোচনকে কাণা বল্লে, তার ক্ষতি কি!

বছরখানেক আগের কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা প্রায় সব বাড়ীতেই টেলিভিশন্ চলে।—শুধু রেডিও আজকাল প্রায় আউট অভ ডেট।—এমনি এক সান্ধ্যমজলিসে টেলিভিশন্ চলছে। শিশুরা খেয়ে দেয়ে তৈরী হয়ে এসে বসেছে। সেদিন শিশু ও কিশোরদের বিশেষ প্রোগ্রাম। তার মধ্যে একটি হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা,—ভারতের বিশেষত্ব তার দারিদ্র।—দূরেক্ষণ যন্ত্রের পর্দায় খণ্ডিত ভারতের ছবি ফুটে উঠল—India,—the land of poverty—দারিদ্রের দেশ! তারপরে একের পরে এক ভিখারীর মিছিল।—মন্দিরের দ্বারে দ্বারে শূন্যমালা হাতে নিয়ে সারা প্রাঙ্গন জুড়ে সারি সারি তাদের হতাশ্বাস বসে থাকা—দারিদ্রের এমন এগ্‌জিবিশন্ বোধহয় সত্যিই পৃথিবীর আর কোথাও নেই!—দেখে দেখে নিজেদের কেমন যেন অপরাধী মনে হয়।—সচ্ছলভাবে বাস করাটাই যেন এদেশে মস্ত অপরাধ।—সুখে ঘরকন্না করার অধিকার এখানে যেন কারুর থাকতে নেই।—প্রত্যেককেই বুদ্ধদেব হতে হবে।—তা ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু ওদেশে বেশীর ভাগ মানুষই সাধারণ মানুষ।—অসীম

দারিদ্র অথবা প্রভূত ধনের ভারে প্রপীড়িত নয়। ওদের দেশের সব চেয়ে স্ফীতকায় সম্প্রদায় হোল,—এই সাধারণ সম্প্রদায়। যার নাম ওদের ভাষায় middle class অর্থাৎ মধ্যশ্রেণী। দেশ বলতে এদেরই কম বেশী অর্থ সামর্থের বৈচিত্র।—এছাড়াও অবশ্য অন্য আরো তুই বিশিষ্ট শ্রেণী আছে যারা খুব গরীব অথবা খুব বড়লোক।—কিন্তু সংখ্যায় এরা একেবারে মাইনরিটি।—অবশ্য তারা যত গরীবই হোক এমন চোখ ধাঁধানো দারিদ্রের জমকালো প্রদর্শনী নেই তাদের।

ইংলণ্ডের বিষয়ে আমি যেটুকু লিখেছি, তাতে বোধহয় দেশটার চেয়ে মানুষের কথাই বেশী আছে।—কারণ দেশ তো আর মাটির ঢেলা নয়,—মাটি ও মানুষের মেশামেশিতেই দেশের জন্ম।—বিশেষত ইংলণ্ডের বেলা মনে হয়,—তার মাটির প্রতি কণা তার মানুষের হাতে গড়া।—তার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশে মানুষের বুদ্ধি, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের যত্নের চিহ্ন মেলা আছে।

ইংলণ্ডের উপরে তার প্রকৃতি বরাবরই সদয়।—খাদ্যের দিক দিয়ে সে তার সন্তানদের দেয় প্রয়োজনের কম।—শাসনে রেখে তাদের কর্মঠ করে তোলে।—আর মনের দিক দিয়ে দেয় অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যের উপহার। উত্তর ইংলণ্ডের পাহাড় নদীহ্রদজড়ানো নানারঙের ফুল ছিটানো মাটির টুকরোগুলি কী আশ্চর্য কী সুন্দর। এত রূপ যে, দেখে দেখে চোখ ভরে না, আশ মেটে না।

—"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল"।—এ কথাই ওয়ার্ডস্বার্থ বলেছিলেন অন্য ভাষায় অন্য ভঙ্গীতে—। এই পথেই পড়ে তাঁর কুটির,—দেখেছিলাম একটু থেমে।—এই পাহাড়ে নদীর ধারে ফুলের বনে তিনি কোন্ কল্পনার কাজলপরা চোখে লুসি গ্রেকে দেখেছিলেন?

এখানে নীল পাহাড়ের গায়ে সরু সরু পাতা ছড়ানো কত শত নাম না জানা গাছ।—কত ফুলে ভরা লতা।—কত ঘাসে ঢাকা জমিতে বুনো ডেইজির বন,—আর তার কোলে কোলে দিগন্ত বিস্তৃত রূপালী হ্রদ। তার উপরে যদি কাশ্মীরের শিকারার মত ছোট ছোট নৌকো করে বয়ে যেত মানুষের মৃদু বাসনার দল, —তাহলে মন্দ হোত না,—কিন্তু না, সেই প্রাচীন মন্দাক্রান্তার তাল এযুগে চলে না, সুর কেটে যায়।—তাই স্বপ্নের মধ্যেও এরা আজকাল গতিকেই বরণ করেছে।—তাই এই মৃদু সুরের মোহ কাটিয়ে, চড়াগলার ভেঁা ভাজিয়ে, স্টিমলঞ্চ ও মোটর লঞ্চগুলি দ্রুত-গতিতে সাঁৎরে চলেছে;—তার শ্বেত ফেননিভ গর্ভে দলে দলে বিলাসমুখর নরনারী—যাকে বলে একেবারে প্রমোদমত্ত। তাদের হোহা চীৎকার, সঙ্গীতের ব্যঙ্গ করা ভাণে, মাঝে মাঝে উন্মত্ত হয়ে উঠছে।—আনন্দে গভীর সহজ সৌন্দর্য বিকৃত আমোদে যেন নেহাৎ সস্তা হয়ে পড়ছে।—এ সব যায়গায় এলে বারে বারেই মনে হয়, এইসব অপার্থিব সৌন্দর্যের স্থলগুলিকে শুধুই বিলাস এবং আমোদ উপভোগের কেন্দ্র রূপে ব্যবহার করে ইংলণ্ড এদের মূল্য কমিয়ে দিয়েছে।—বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে সাধারণ বিলাসোপকরণের মত সস্তা পণ্যে পরিণত করে তার আপন অন্তর্নিহিত রূপরসপিপাসু স্বভাবের প্রতিবাদ করেছে, নিজেই।—আত্মার প্রকাশকে করেছে অবমানিত। সমুদ্রের তীরে তীরেও দেখেছি এই রুচির বিকৃতি।—যেন কার্নিভ্যাল বসে যায় ওদের জনপ্রিয় সাগরতীরগুলিতে।—কার্নিভ্যালের জন্যে আলাদা যায়গা আলাদা সময় ঠিক করে রাখলেই তো হয়!

সব সময় সব যায়গায় কার্নিভ্যাল হতে থাকলে মানুষের প্রাণটা হাঁপ ছাড়বে কোথায়?—অবশ্য হাঁপ ছাড়ার যায়গাও আছে ইংলণ্ডে।—সে তার গ্রাম। গ্রামে এসে সহুরে ইংলণ্ড প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচে।—এ তার অক্সিজেনের থলি। এখানে অমন

কার্নিভ্যাল নেই। ছোট ছোট ক্ষেতে রঙের সমারোহ।— বসন্তে আর শরতে আকাশ নীল,—তখন দলে দলে নরনারী শিশু গ্রামে এসে কিছু সময় কাটিয়ে যায়,—যার যেমন সুবিধে।—এখানে সস্তা আমোদের চোখধাঁধানো ভঙ্গী দিয়ে বিশেষ মানুষের বিশেষ রুচির উপরে জবরদস্তি চলে না;— তাই কাজের মানুষ ইংলণ্ডের ছুটী মেলে গ্রামে।—অবশ্য গ্রামেরও ক্ষেতভরা কাজেরই ফসল।—তবে সেখানে কাজ যেন সাজ বদলে এসেছে।—সে যেন হঠাৎ আকাশের সঙ্গে মাখামাখি করে ছুটীর সুরে সুর মিলিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে বলনাচ নেচে চলেছে। সেই গ্রাম আর ছোট একটা সহরের কিছু কথা, যদিও অনেক আগের লেখা,—তবু জুড়ে দিলাম এইখানে।

গত ক'বছরে, ইয়োরোপের নানা যায়গায় কিছু কিছু ঘুরেছি। তারি অল্প একটু আঁচড়-কাটা বর্ণনা রইল এই বইয়ে।—যা রইলো না তা অবশ্য অনেক বেশী।—বিশেষ করে ইটালীর কাছে রয়ে গেল আমার অকৃতজ্ঞতার দেনা।—তার বিষয়ে কিছুই লেখা হয়নি।—তার শিল্প, তার সৌন্দর্য, তার রোম ফ্লোরেন্স ভেনিস—তার রুক্ষ কঠিন ডলমাইট পর্বতমালা, তার করবীবীথিকাগ্রথিত সমুদ্রতীর, তার পুনরুত্থিত অতীত পম্পিয়া, ভালোয় মন্দয় মেশানো তার মানুষ, কোন কিছুর কথাই লেখা হয় নি।—অবশ্য তার জন্যে ইটালী আমায় শাপ দেবে, না— ধন্যবাদ দেবে, সেটা ঠিক করবেন, পাঠকেরা।

পশ্চিমে যাবার পথে বরাবরই ঈজিপ্টকে দেখে যাবার সাধ আমার মনকে কামড়ে কামড়ে ধরত। কিন্তু সুযোগ মেলে নি কিছুতেই। তাই এবারে আগে থেকে সব ঠিক করে টিকিট কিনে সোজা কায়রোতে পৌঁছেছিলাম। পিরামিড আর নীলনদ দেখবার ইচ্ছে, শিশুকাল থেকে কল্পনায় একটা রহস্যের মায়ালোক সৃষ্টি করেছিল।—তারপরে একটু বড় হলে, বার্ণার্ডশ'র

"সীজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা" সে ইচ্ছার বেগকে তীব্রতর করেছিলো।—কিন্তু ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া সব সময় এমন কিছু কাজের কথা নয়।—যতদিন 'ইচ্ছে, হয়ে থাকে' ততদিনই ওর মূল্য ;—ইচ্ছে পূর্ণ হওয়া মানেই তো ইচ্ছের মৃত্যু।—যাই হোক, কায়রোতে চার পাঁচ দিন কাটিয়ে আমি সে ইচ্ছার সমাপ্তি অথবা মৃত্যু ঘটিয়ে এসেছি বটে,—কিন্তু সেই সঙ্গেই, এরকম ভাবে, দেশ দেখার সার্থকতা যে কত কম, তাও বুঝেছি ভালো করে।—এই ক্ষণিকের চেনাশোনায়, শুধু চেনার চমক্‌টুকুই চমকে ফেরে মনে ; জানার গভীরতায় ডুবে গিয়ে অভিজ্ঞতাকে রসপুষ্ট করতে পারে না।—এ শুধু দেখা মাত্র।—দর্শন নয় !

॥ অস্তরাগের পথে ॥

অবশেষে যাত্রা হ'ল সুরু। যাবার সময় যতই এগিয়ে আসে, ততই এক একটি বিপুল বাধা দাঁড়ায় পথ আগলে। কি করে তাদের এড়িয়ে যাব ভেবে পাই নে। যুদ্ধকালীন 'বিফল দেয়ালে'র মত, তাদের অলিগলির ভিতর দিয়ে কোনমতে বেরিয়ে পড়ে একেবারে ট্রেনে চড়ে বসলাম। কিন্তু মনটা বাঁধা পড়ে রইল। আমাদের দেশে খেতে শুতে চলতে ফিরতে নানা ধরণের অসংখ্য বাধা পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে পথ আটকে রাখে, স্বচ্ছন্দে চলা বিষম দায়। দেহটাকে কোন মতে বের করে আনলেও মনটাকে অত সহজে মুক্ত করা যায় না—সে তার পুরনো কেন্দ্রকে পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরতে থাকে। নূতন জিনিষকে চেয়ে দেখার দৃষ্টি হয়ে যায় ঘোলাটে। কলকাতা থেকে বোম্বে এই পথটুকু তেমনি একটা কুয়াসাচ্ছন্ন ঝাপসা আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে কাটল।

বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলাম তখন সকাল আটটা—ঝক্‌ঝকে নূতন শহরটি সমুদ্রের কোলে ছবির মত জেগে উঠল। বড় বড় ষ্টেশন সব পার হয়ে ট্রেন এসে থামল একেবারে ষ্টীমার-ঘাটের সামনে। সাড়ে দশটায় ডাক্তারি পরীক্ষা হবে, এর মধ্যে খুঁটিনাটি অনেক কাজ সেরে নিতে হ'ল। ডকের উপর-তলায় প্রকাণ্ড হলঘরে গদাগাদি করে বসে অছে মেয়ের দল—ছেলেপিলে, কাচ্চাবাচ্চা সামলাতে ব্যতিব্যস্ত। চুপচাপ বসে আছি অপেক্ষা করে। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতা মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে। খুকু কিন্তু দিব্যি মজায় আছে।

অস্তরাগের পথে : সুয়েজের ধারে

পোর্ট সৈয়দের পণ্যতরী
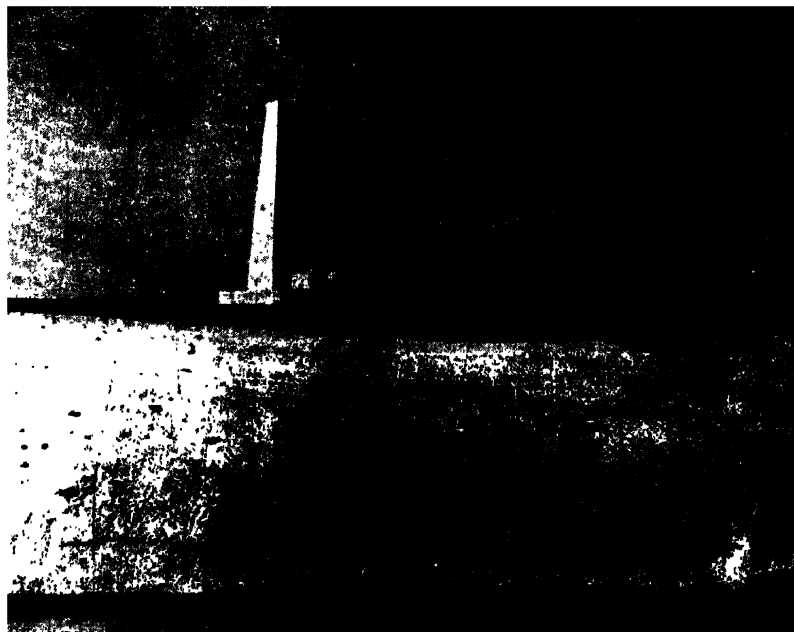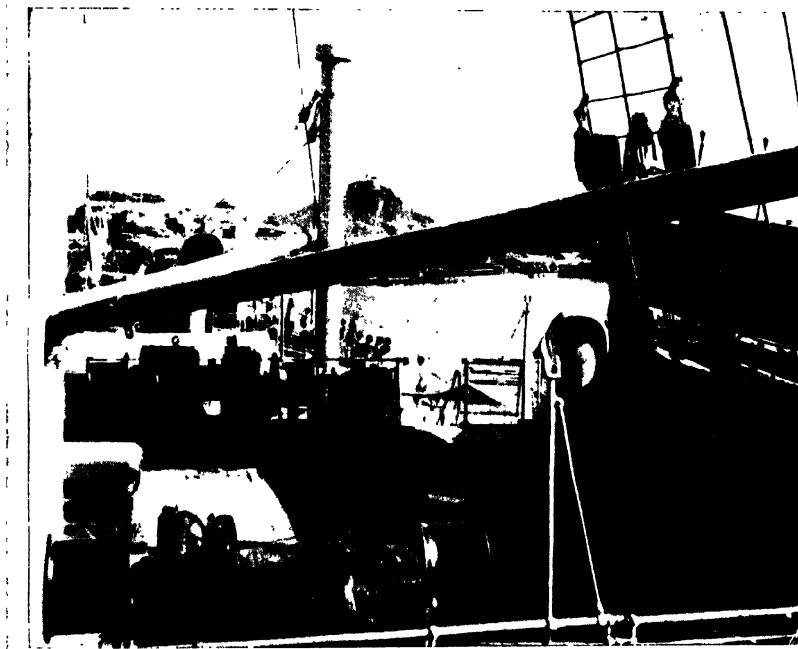
সকালবেলা জ্বর ছেড়ে যাওয়ায় ওকে সুস্থ সুন্দর লাগছে—কুতূহলী দৃষ্টি দিয়ে বাচ্চাদের কাণ্ডকারখানা দেখছে। ডাক্তারকে দেখে মনটা হঠাৎ খুশী হয়ে উঠল—এ যে আমাদেরই একজন। দলে দলে সাদা সাদা রং-করা মুখের মাঝখানে, ভারতের শ্যামল আভা মেশানো পার্শী একটী মেয়ে এসে বসল ডাক্তারের আসনে এবং জাহাজী নীতির একটুও ব্যতিক্রম হতে দিল না। মেয়েরা যখনই মাঝে মাঝে ভিড় করে এগিয়ে আসার চেষ্টা করে, ভারতীয় মেয়ের তর্জনী হেলনে তখনই তাদের ফিরে যেতে হয় নিজের যায়গায়।

কাষ্টম্‌সের কাছে মাল ছাড়ানো, টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি করে যখন জাহাজে এসে উঠলাম তখন গরমে এবং ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। জাহাজটাকে একটা বিরাট খাঁচার মত মনে হচ্ছে—হাওয়া নেই কোথাও। লম্বা লম্বা ডেক জাহাজটাকে ঘিরে রয়েছে —কিন্তু শান্তি নেই সেখানেও। মঙ্গলবার সারাদিন কাটল ভ্যাপসা গরমের মধ্যে—যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে একটা পুরো দিন-রাত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই চিন্তাই মনের মধ্যে একটা বিরুদ্ধ ভাব সঞ্চার করে—তার উপরে হাওয়া নেই। জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত স্নান করা চলবে না। গুমট গরমে সিদ্ধ হতে হতে বিলাতযাত্রার সখকে ধিক্কার দিলাম।

জাহাজটাকে চৌরঙ্গির কোন বড় হোটেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিন হাজার যাত্রী নিয়ে চলেছে। তার মধ্যে অর্ধেক অবশ্য সৈন্যদল। আধখানা ডেক তাঁরা দখল করে বসে আছেন, সেদিকে একটু উঁকি মারতে যাও, ইউনিফর্ম-পরা কেউ এসে বলবেন—Sorry madam, out of bounds—এখানে ওখানে কত যে 'out of bounds' তার ঠিক নেই। সৈন্য চলেছে যুদ্ধ-নীতির অনুশাসনে আবদ্ধ হয়ে। আমাদের মত যে সব অজ্ঞ নাগরিকেরা চলেছে এই জাহাজে, তারা সকলেই এই নিয়মে

পড়েছে বাঁধা। থেকে থেকে বিভিন্ন মাইকে ধ্বনিত হচ্ছে গর্জন—অমুক সৈন্যদল অমুক জায়গায় যাও—পয়লা নম্বরের নাগরিকদল অমুক ঘরে খেতে যাও, ইত্যাদি। মাইকের জ্বালায় মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতে হয়। আমার কেবিনে একটি মেয়ের দু'টি দুরন্ত ছেলে আছে। তারা অনবরত হারিয়ে যায়, আর সেই খবর ধ্বনিত হয় মাইকে। ছেলে দুটি হারিয়ে হারিয়ে বিখ্যাত হয়ে উঠল। বড়দের এই সুবিধা নেই, নইলে আমরা সবাই ঠিক করেছিলাম একবার করে হারিয়ে যাব।

জাহাজটা শুনছি আগে ছিল বিলাস-তরণী। যে কেবিনে আগে দু'টি মাত্র বার্থ ছিল, সঙ্গে ছিল স্নানের ঘর—সেই কেবিনে আজ আটটি বার্থ হয়েছে এবং স্নানের ঘরের চিহ্ন নেই। মেয়েদের জন্যে দুটি মাত্র স্নানের ঘর নির্দিষ্ট। এ যেন বোর্ডিঙে বাস—তবে বোর্ডিঙে এত ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকতে হয় না। জাহাজভর্তি কত যে কাচ্চাবাচ্চা তার ঠিক নেই। আর তাদের দৌড়াদৌড়ি, হুড়োহুড়ির অন্ত নেই। লুকোচুরি খেলছে, ডেকের ওপরে, দোলনায় দুলছে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে, ময়লা জল ফেলে দেবার নর্দমা থেকে জল এনে পুতুল খেলছে—সমস্ত ডেকটা বসে বসে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলে চমৎকার রঙীন পোশাকগুলো কাদামাখা করছে, কেউ কিছু বারণ করছে না। তাদের মায়েরা হয়ত চেয়ারে বসে উল বুনছে, বা লাউঞ্জে গিয়ে তাস খেলছে, কিম্বা 'বারে' গিয়ে মদ খাচ্ছে, অথবা ছাতে গিয়ে রিং খেলছে। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তাদের কাবু করতে পারে না। যদি রেলিং বেয়ে উঠে জলে পড়ে যায়, যদি দুলতে গিয়ে হঠাৎ অসাবধানে চলে যায় ঢেউয়ের দেশে, যদি নোংরা ঘেঁটে অসুখ করে, এই সব "যদি"র বোঝা তাদের মনকে ব্যাকুল করে না। তারা নিশ্চিন্তে নিজের কাজ ও আমোদ প্রমোদ করে এবং শিশুরাও ছোটবেলা থেকে স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এরা স্বাধীন দেশের মানুষ,

এরা স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে। শিশুকাল থেকে স্বাধীনতার হাওয়ায় এরা বর্ধিত। আশ্চর্য এই যে, নিয়মানুবর্তিতা ও স্বাধীনতাকে এরা শিশুকাল থেকে একসঙ্গেই গ্রহণ করে। খাবার ঘণ্টাটি বাজলে ঠিক সময়ে গিয়ে সবাইকে খাবার টেবিলে হাজির হতে হয়, সন্ধ্যা সাতটায় বিছানায় যেতে হবেই, সে তুমি ঘুমোও, চাই, না ঘুমোও। তোমার এলাকায় তুমি যা খুশী কর, কিন্তু যেখানে বড় বড় হরফে লেখা আছে—'শিশুদের প্রবেশ নিষেধ'—সেখানে বড়রা ফিস্‌ফিস্ করে ছোটদের বুঝিয়ে দিচ্ছে ওখানে যাওয়া চলবে না,—কেউ আর পা বাড়াচ্ছে না। একেবারে অপোগণ্ড শিশুরাও সম্পূর্ণ স্বাধীন, তবে তাদের স্বাধীনতার পরিধিটা খুবই সঙ্কীর্ণ। ৭।৮ মাস থেকে প্রায় দু' বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের জন্যে প্রায়ই খোঁয়াড়ের ব্যবস্থা। রঙীন কাঠের উঁচু বেড়া দেওয়া খোঁয়াড়ের ভেতরে সতরঞ্চি বিছিয়ে তারা বসে থাকে নিজেদের সম্পত্তি চার দিকে ছড়িয়ে—পরনে থাকে মোটা তোয়ালের ওপরে রবার অথবা প্ল্যাষ্টিকের পাজামা—ব্যস্, ৩।৪ ঘণ্টার মত সেও নিশ্চিন্ত, তার মাও তাই। শ্রীমতী 'টী' বললেন— "বাবাঃ, আমার একটিই যথেষ্ট, আর সখ নেই—বিশেষত, দেশে এখন চাকর-বাকর পাওয়া যাবে না—বড় ঝঞ্ঝাট।" শ্রীমতী 'কে' তিন মাসের খোকার ছোট দোলনাটি দু' বছরের খুকীর খোঁয়াড়ের পাশে রাখতে রাখতে বললেন—"তা বললে কি হবে, ঝঞ্ঝাট আছে বলে ছেলেপিলে হবে না?" আমি বললাম,—"সত্যিই তো, কিন্তু তোমাদের কাজের কিংবা আমোদ-প্রমোদের অসুবিধে হয় না?" সে বললে, "কেন, শিশুদের নার্সারীতে দিয়ে আমরা কাজে যাই। আমি তো চুল সাজাবার দোকানে ন'টা থেকে বারটা আবার দুটা থেকে পাঁচটা অবধি কাজ করি। আর মজুর ইত্যাদির জন্যে কত যে 'ক্রেসে'র ব্যবস্থা হয়েছে। কাজ সেরে ফিরে এসে ওদের খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দিয়ে ৭টার সময় অনায়াসে তুমি সেজেগুজে সিনেমায় যেতে পার, কিংবা নাচে। ছেলেপিলে

হ'ল বলেই দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হতে দেব কেন ? শিশুদের যা দরকার তাদের জন্যে তা করব বটে, তাই বলে আমাদের জীবনের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় তাকেও তো বাদ দিলে চলবে না। আমার স্বামী খবরের কাগজের আপিসে কেরাণী—সারাদিন আমরা যে-যার কাজে ঘুরি, সন্ধ্যা হলে দু'জনে একটু আমোদ-প্রমোদ না করলে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কিন্তু তাই বলে স্বাস্থ্যবান সবল ছেলেমেয়ের মা হয়ে আমিই বা দেশের উপকার করব না কেন ? অর্থাৎ এক কথায় ছেলেমেয়ে খুব ভাল কিন্তু তাঁদের মাথায় চড়তে দিতে নেই। সন্তানদের প্রতি কর্তব্যে এবং নিজেদের প্রতি কর্তব্যে খুব বেশী সঙ্ঘর্ষ বাঁধবার সম্ভাবনা নেই।"

আমাদের দেশের মেয়েরা ষোল-সতের বছর বয়স থেকেই মাতৃত্বের ভারে নুয়ে পড়ে। এক দিকে নুয়ে-পড়া মায়ের বাঁকা চলন, অন্য দিকে 'বাড়ির কত্তা'র সদম্ভ পদচারণ এবং মা ও চাকরবাকরদের প্রতি বীরবিক্রম দেখে দেখে তারা এক দিকে অতি সহনশীল ও অন্য দিকে বদ্‌মেজাজী হয়ে ওঠে। সবলের কাছে অত্যন্ত নিরীহ ও দুর্বলের কাছে কঠোর প্রভু হয়ে বসে। 'এই ভূতো ওখানে যাসনি, করলি কি, ও যে মেথরের ছেলে, ছুঁয়ে দিলি ? ছি ছি', 'এই রেমো, ফের এসেছিস, শীগ্‌গির যা এখান থেকে'; 'আঃ পেঁচো, আবার কোথায় গেলি, তোকে যে দেখতেই পাওয়া যায় না' ইত্যাদি বিচিত্র এবং বিপরীত শাসনের তর্জন-গর্জন শুনতে শুনতে আমাদের ভূতো, রেমো, পেঁচোর দল এক দিকে যেমন অন্যায় শাসনের অত্যাচার সইতে অভ্যস্ত হয়, অন্য দিকে তেমনি অনুশাসনকে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ হয়ে ওঠে। সব সময়েই যে শিশুকে সহস্র বিধিনিষেধের মধ্যে দিয়ে বড় হয়ে উঠতে হচ্ছে, জীবনে কোন্ নিষেধের সে সত্য মূল্য দেবে একথা ঠিক করা তার পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। 'মিথ্যা কথা বলা' বেশী খারাপ, না, পক্ষীবিশেষ খাওয়া, তা সে ঠিক করতে পারে না,—ফলে শেষ পর্যন্ত সে

কোন নিষেধই মানে না—অর্থাৎ নিষিদ্ধ পক্ষীও খায়, মিথ্যাও বলে। কিন্তু এজন্যে তাকে তো দোষ দেওয়া চলে না।

দোষ আমাদের প্রচলিত সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার, যা আমাদের মনে প্রাণে একান্ত পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। পরমুখাপেক্ষিতা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় তার শিকড়জাল বিস্তার করেছে, ভয় ও নিষেধের পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের বুদ্ধিকে করেছে আবিল, হৃদয়কে করেছে পঙ্কিল। যে-লোক অহোরাত্র সহস্র বন্ধনের অধীন, স্বাধীনতার অর্থ সে কি জানে? আমাদের দেশে বয়স্ক লোকেরাও বাপমায়ের প্রত্যেকটি ইচ্ছার অধীন, স্ত্রী স্বামীর অধীন, ছেলেমেয়েরা পান থেকে চুন খসলেই 'চোরের মার' খাচ্ছে, আবার আব্‌দেরে শিশুর জবরদস্ত কান্নায় মায়েরা সম্পূর্ণ তাদের অধীন। স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবে নিজের পথচলাকে সহজ, ও পরের পথকে সরল করে তোলা আমাদের ধাতে নেই। খেতে শুতে চলতে ফিরতে বাধার অন্ত নেই। এই প্রতিবন্ধকের সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করে করে জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে জীবনের অমৃতকে আহরণ করে আনব, এমন শক্তির সম্বল কোথায়?

—এখানে একসঙ্গে চলেছে তিন হাজার যাত্রী। কোথাও এতটুকু নিরিবিলি স্থান নেই—চেয়ার পেতে সব বসে আছে পাশাপাশি। যার চেয়ার নেই, ওরি মধ্যে মাটিতে একটু জায়গা করে বসে পড়েছে, তবু দেখবে, তোমার চেয়ারখানির মধ্যে তুমি নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীন। তোমার নিজের জায়গায় সভ্যজীবন-সম্মত (ওদের মতে) যা খুশী করবার স্বাধীনতা তোমার আছে। কুতূহলী দৃষ্টি দিয়ে কেউ তোমায় বিঁধবে না, বরং স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি যদি কোথাও ঘটে চোখ ফিরিয়ে চলে যাওয়াটাই ভদ্রতা। এরা স্বাধীন বটে, তবে স্বতন্ত্র নয়। সাধারণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে এদের মজ্জায়। সকলেই সাধারণের পক্ষে

খাটে এমন যে-কোন একটা ব্যবস্থা মেনে চলার পক্ষপাতী। প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এত গোছালো স্বভাব বলেই এরা ঐশ্বর্যকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এই যে বিরাট কারখানা এর কোথাও একটু গোঁজামিলের ঝোঁক নেই। সব যেন কলে চলেছে। যেমন বন্দোবস্ত—তেমনি ঐশ্বর্যও বটে। বিশাল খাবার ঘর শ্বেতপাথরের, তার ওপরে নরম কার্পেট মোড়া, ফুল দিয়ে সাজানো প্রকাণ্ড লাউঞ্জ, 'বার', নাপিতের দোকান, মেয়েদের চুল সাজাবার ঘর, বাচ্চাদের নার্সারী, ডাক্তারখানা, লাইব্রেরি, মনিহারী দোকান, কিছু বাকী নেই। সভ্যজীবন-যাত্রার যত কিছু উপকরণ, সব নিয়ে চলেছে। আগেকার দিনে যাত্রীর সম্বল ছিল, লাঠি এবং পুঁটলী। গৃহের সুখাশ্রয়কে বহু-দিনের জন্যে বর্জন করে নূতন দেশের নূতন পরিবেশের অসংখ্য দুঃখ-অসুবিধার মধ্যে দিয়ে চলতে হ'ত বলেই বোধ হয় যাত্রার জন্যে অত বাধা-নিষেধের সৃষ্টি হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান গৃহ ও পথের মধ্যে কোন ভেদ রাখেনি। আধুনিক গৃহের হাজার রকম খুঁটিনাটির একটি উপকরণও বাদ পড়েনি; ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ আর একটি ছোট দ্বীপ যেন ভেসে চলেছে। তবু লোকের মুখে শুনছি জাহাজে নাকি এত কষ্ট করে কেউ এর আগে কখনও আসেনি। মনে পড়ছে আমাদের দেশের নদী পার হবার ষ্টিমারগুলোর কথা। সেখানে আমাদের সাধারণ লোক হাজারে হাজারে কেমন ভাবে আসা যাওয়া করে, সে কথা এই বিলাসোপকরণ-বহুল জাহাজের আরামকৌচে বসে কল্পনা করাও যায় না। যে পৃথিবীতে এক দলের জন্যে এমন চমৎকার ব্যবস্থা, সেই পৃথিবীতেই অন্য দলের এত দুর্দশা কেন? তবু থেকে থেকে নানা অভি-যোগের আভাস পাওয়া যায়—চাকর-বাকর কমে গেছে, জুতো পালিস করে দিতে কেউ আসে না—খাবারের 'মেনু' বিশেষ

রকমারি নয় ইত্যাদি নালিশের মৃদু গুঞ্জন নানাদিকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। এত আরামের ব্যবস্থার মধ্যেও ছোটখাটো অসুবিধা মাথা তুলে দাঁড়ায়। একটি প্রধান অসুবিধা এত লোকের একসঙ্গে বাস, বিশেষতঃ আমাদের মত গৃহবদ্ধ জীবের পক্ষে। যত বড়ই জাহাজ হোক, এত লোককে জায়গা দেবার মত যথেষ্ট স্থান এতে নেই। খুব কম হলেও সাধারণত মানুষ চায় তার নিজের ছোট একটি নিরালা কোণ, যেখানে দিনের শেষে সে তার নিজের সংসারের মধ্যে বিশ্রাম করতে পারে। কিন্তু এ যেন হাটের মধ্যে আছি—এত বড় জাহাজে কোথাও একটু ফাঁক নেই। কোন রকম গোপনতার অবকাশ নেই। তার মধ্যে আবার প্রেমিক-প্রেমিকার ছড়াছড়ি—এত ভিড়, লোকজন, কাচ্চাবাচ্চা গিস্ গিস্ করছে, তবু তাদের প্রণয়-লীলার ব্যতিক্রম হবার যো নেই। ওরই মধ্যে দেখতে পাবে কোথাও একটু কোণায়, একটু নিভৃত স্থান খুঁজে নিয়ে চল্‌ছে যুগলের লীলা—সঙ্কুচিত হয়ে চলে আসতে হয়, তাদের কোন সঙ্কোচ নেই। এরা সভ্য হতে হতে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে সভ্যতার আবরণ অনায়াসে খুলে ফেলা যায়—অর্থাৎ সভ্যতা যেন রক্তের সঙ্গে মিশে মজ্জায় মজ্জায় গ্রন্থি ফেলে এদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে নি। সভ্যতাকে এরা যেন ঝকমকে চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। চাদরটা একটু সরিয়ে দিলেই আদিম ব্রিটনের আভাস পাওয়া যায়।

এই নিয়ে খুব কষে রাগ করতে গিয়ে মনে পড়ল সেকালের কথা—মেঘদূত আর কুমারসম্ভবের পাতায় পাতায় এদেরই কি বর্ণনা নেই অন্যভাবে? সংস্কৃত কবিদের বর্ণনায়, অজন্তার ছবিতে যেসব মেয়েকে দেখতে পাই তাদেরও শালীনতার চেয়ে ভূষণের বাহুল্য ছিল বেশী। দেহটা ঢাকা দেওয়ার চেয়ে তাকে সাজিয়ে তোলাই ছিল উদ্দেশ্য। তখনও তাদের ঠোঁট ছিল রাঙা, চোখে ছিল অঞ্জন—

বাঁকা হাসি হেসে, কাজল চোখের কুটিল কটাক্ষে তারাও চালাত প্রেমের ছলাকলা। এরাও আজকে সেই জীবনই বেয়ে চলেছে, জীবনযাত্রা-পদ্ধতির ধরণটা বদলেছে মাত্র। তখনকার মেয়েদের ছিল যুগল বসন—এদেরও তাই। গরমে এরা হাঁপিয়ে উঠেছে। কোমর থেকে ছোট্ট একটা ঘোরানো পাজামা হাটুর আধহাত ওপর পর্যন্ত নেমে পায়ের তালে তালে নাচছে—রঙীন কাপড়ের টুকরোয় বক্ষ ঢেকে ফিতে দিয়ে বেঁধে দিয়েছে ঘাড়ের ওপরে এবং পিঠের প্রান্তে। বাকী সমস্ত অঙ্গে শুভ্র মসৃণ নিরাবরণতা। এই সাজে রোদ্দুরে বসে বসে গল্প হচ্ছে পা ছড়িয়ে, হৈ হৈ করে ফ্ল্যাশ চলছে, 'বার'-এ গিয়ে মদ চলছে—দেখে দেখে এক এক সময় গা সির্ সির্ করে উঠছে, মনে হচ্ছে এই অসভ্যদের দেশে চলেছি কেন। জুলু দ্বীপের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের তফাৎ কোথায়?

কিন্তু তবু বলব, এদের প্রাণচঞ্চল প্রবল জীবনস্রোত দেখে চমক লাগে। যেমন অজস্রধারায় জীবনকে ভোগ করছে, তেমনি পুষিয়ে দিচ্ছে তার দাম। আমার কেবিনে যে তিনটি মেয়ে চলেছে, তাদের কথাই ধরা যাক না। ভারতে থাকতে তারা নড়ে বসত না—এখানে ছোট্ট খোপরের ছোট সিঙ্কে যেমন স্ফূর্তির সঙ্গে তারা কাপড়চোপড় কাচছে, ইস্ত্রিঘরে গিয়ে ইস্ত্রি করে আনছে, ছেলেপিলের জুতো ছিঁড়ে গেলে জুতো সেলাই করে ফেলছে চটপট, আবার তেমনি স্ফূর্তির সঙ্গে 'বার'-এ গিয়ে মদ খেয়ে আসছে। পারিপাট্যের এতটুকু ব্যতিক্রম হবার যো নেই—যাহোক করে মানিয়ে নেব—এমনতর মনোভাব কোথাও দেখা যায় না। যত অসুবিধাই হোক প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিই সব সময়ে চালিয়ে নিতে হবে, এটাই তারা জানে—এবং এ চালিয়ে নেবার যোগ্যতাও এদের আছে। এটা যে এই মেয়েদেরই কোন একটা বিশেষ গুণ তা বলতে পারি না, এটা ওদের ছোটবেলার শিক্ষার গুণ। আমাদের দেশের মেয়েরা বিদ্যাবুদ্ধিতে কোন অংশেই এদের চেয়ে হীন নয়,

তবু সংসারের প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেকে চালিয়ে নেবার মত বিশেষ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা তাদের জন্যে নেই।

পড়াশুনার বিষয়ে এদের খুব বেশী একটা যে আগ্রহ আছে তা নয়, তবু বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা সকল শিশুকেই পাঁচ বছর বয়সে স্কুলে দিতে বাধ্য করে। স্কুলে মোটামুটি লিখতে পড়তে শেখে সকলেই, কিন্তু যার ভিতরে জ্ঞানের পিপাসা আছে সেই উঠে যায় ধাপে ধাপে; যার নেই, তাকে কেউ কুইনিনের মত জ্ঞানের বড়ি গিলিয়ে দিতে যায় না। আর অর্থ উপায়ের এত রকম পদ্ধতি এরা জানে যে, সকলকেই পড়াশুনোয় ভীষণ রকম ভাল হয়ে আই-সি-এস হবার জন্যে প্রাণপণ করতে হয় না। আগে এরা মানুষ হয়, তারপরে হয় পণ্ডিত। এদেশে টাকার জন্যে পণ্ডিত হবার দরকার হয় না। আমাদের দেশে স্কুলে যাবার সময় থেকে আরম্ভ হয় ছেলেদের দুঃখের দিন। বাড়ীতে গুরুজনেরা দেখলেই বলছেন—'যা, পড়তে বোস গিয়ে।' ইস্কুলে মাষ্টাররা যাচ্ছে কলের মত পড়িয়ে—যত বড় হয়, তত এর জের বাড়তে থাকে। কলেজে এসে আর উপায় থাকে না। যে বেচারার বুদ্ধির প্রদীপে বেশী তেল পড়েনি, তার কপালে হরিমটর। কিন্তু কেন? বিদ্যাবুদ্ধি বেশী না থাকলেও ভালভাবে বাঁচবার দাবি কারো কমে না। আমাদের দেশেও আগে এর দরকার ছিল না। মানুষ মানুষের মতই বাঁচত, আর বিদগ্ধজন মনের আনন্দে বিদ্যাচর্চায় মগ্ন থাকত। তাই আশ্চর্য লাগে যখন দেখি, নিজের দেশের মানুষের ভালভাবে বাঁচবার দাবি যারা এত বেশী করে জানে, তারা কি করে আমাদের সমস্ত দেশটাকে একটা কেরাণী তৈরীর কারখানা করে তুলেছে! কোথাও যদি প্রাণের কোন লক্ষণ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তাকে ছিন্নভিন্ন দলিত পিষ্ট করে ফেলেছে!

পরদেশের রক্ত শোষণ করে এরা নিজেদের দেশের বিলাসের

উপকরণ সংগ্রহ করে। আমাদের দেশে কখনো এ আদর্শ বড় হয়ে ওঠে নি। সংসারের প্রত্যেক কর্মে পরের জন্যে স্বার্থত্যাগই আমাদের দেশের গৃহীর আদর্শ। অতিথি গৃহে এসে গৃহীকেই কৃতার্থ করেন। এই আদর্শ আমাদের জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেজন্যে বাইরের দিক দিয়ে আমাদের কত যে ক্ষতি হয়েছে সে কথা সকলেই জানেন। আমরা জীবন সংগ্রামে বরাবর হেরেই এসেছি, আমরা চটপট করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারি নি—অন্য দেশের লোভের চাকায় নিজেদের বলি দিয়েছি হতাশভাবে, তবু সকল মানুষের চেয়ে যে বিশেষ ভাবে আমাদেরই বাঁচবার দাবি বেশী এ কথা কখনো মনে করি নি। তাই এখনো, যখন দিগন্ত আচ্ছন্ন করে, বিশ্বের লোভ আমাদের নিঃশেষ করে দিতে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে মুখব্যাদান করে দাঁড়াল, যখন দেশপ্রেমের নবীন বাণীতে আমাদের দেশের মানুষকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তখনো নূতন ভারতের নবযুগের ঋষিরা সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেছেন। দেশপ্রেমের নবনব প্রেরণার বাণীতে দেশকে প্লাবিত করে দিলেও তাঁরা বিশ্বকে বিস্মৃত হন নি। তাঁরা বলেছেন—'হে আমার দেশের মানুষ, তোমরা বড় হও, উচ্চে তোল শির, কিন্তু ভুলো না তোমাদের ঐতিহ্যকে। যে অতীত ভারতের চিত্তের ঐশ্বর্য একদিন পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল সেই ভারতের আদর্শ তোমরা গ্রহণ কর।' তাই যখন উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভেসে চলেছে, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গৃহের প্রান্তে বিশ্বের জন্যে আসন পাতলেন, রচনা করলেন বিশ্বভারতী। হিংসাবিক্ষুব্ধ জনতার মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে কটিবাস পরিহিত মহাত্মা প্রচার করলেন মানবতার বাণী। প্রাচীন ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই মহাপুরুষদের কথা মনে হলে, আশা হয় যে বাঁচবার জন্যে

পশ্চিমের এই সভ্যতাকে অনেকাংশে গ্রহণ করতে হলেও আমরা হয়ত এদের মত শোষক সম্প্রদায়ে পরিণত হব না। মানুষের মত বেঁচে ওঠবার যে নূতন প্রেরণা আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে, সে আমাদের মানুষ করেই গড়ে তুলবে, দানব করে নয়। পুরাকালের দানবের এই রকমই তো বর্ণনা পড়া যায়। কত তাদের সুখসমৃদ্ধি, কত তাদের বিলাস-আয়োজন, রাবণের সুবর্ণ লঙ্কাপুরীর ঝকমকানি, ময়দানবের কত কলাকৌশল। কিন্তু তপোবনের ঋষি এদের ঘৃণাভরে বলেছেন, দানবীমায়া—বলেছেন, এদের দেখে ভুলো না, এদের চোখ-ধাঁধাঁনো আয়োজনে আত্মার ঐশ্বর্যের সন্ধান মেলে না।

কিন্তু তপোবনের ঋষি যে অর্থে বাহ্য আড়ম্বরের নিন্দা করেছিলেন, তা আজ আমাদের কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে। আমরা যে এদের মত জাঁকজমকে রঙচঙে উজ্জ্বল হয়ে নেই সে আমাদের ইচ্ছার অভাব বলে নয়, সে আমাদের অক্ষমতা। আমরা যদি আজ সবল হস্তে নিজের দেশকে উচ্চে তুলে ধরতে পারতাম, যদি মুমূর্ষু দেশবাসীকে ক্ষুধার অন্ন জুগিয়ে, চরিত্রে ও কর্মে তাদের দৃঢ় করে তুলতে পারতাম, তবেই আজ জোর গলায় ইউরোপের প্রতিবাদ করা চলত। আজ আমরা ভিখারীর মত দীনবেশে তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বারে এসে হাত পেতে দাঁড়াই। অত্যন্ত অবহেলাভরে, কুড়োনে-কাচানো উচ্ছিষ্ট কিছু তারা তুলে দেয় আমাদের হাতে। বড় বড় কথা বলার দিন আজ নয়।

*　　*　　*

বুধবার দিন এগারটার সময় জাহাজের লৌহবক্ষে যন্ত্ররাজের গর্জন সুরু হয়—বিশাল প্রাসাদ জলের ওপর দুলে ওঠে। বন্দরে দাঁড়িয়ে বহুলোক রুমাল নাড়ে, কমলালেবু ছুঁড়ে দেয়, হাসে, লাফায়, নৌকা থেকেও ফিরে যায় তার প্রতিদান। ওরি মধ্যে আবার একদল গান ধরে ওঠে—বিদায়কালীন সজল চোখের

ছলছলানি বিশেষ কোথাও দেখা যায় না। ধীরে ধীরে ভাসমান দ্বীপটি এগিয়ে চলে, মুক্ত সাগরের পূর্ণরূপ ভেসে ওঠে। ভারতের উপকূল ছায়ার মত চোখের সামনে মিলিয়ে যায়,—মিলিয়ে যায় নারকেল গাছের পাড়ঘেঁষা সবুজ তটপ্রান্ত, মিলিয়ে যায় সাদা সাদা বাড়ীগুলোর সগম্বুজ চূড়া। ঐ যে লোকটা কমলালেবু ফিরি করছিল তাকে আর দেখা যায় না, কুলীদের ধুলিমাখা মলিন মূর্তিগুলি অস্পষ্ট হয়ে আসে—ভারতবর্ষ তার সমস্ত চেঁচামেচি, হট্টগোল, তার ছিন্নবসনলাঞ্ছিত গোপন ঐশ্বর্যসমেত চোখের সামনে থেকে সরে যায়। সেই মুহূর্তে বুকের ভিতরটা টনটন করে ওঠে। ঐ যে ঝাঁকা মাথায় কমলালেবুওয়ালা, ঐ যে বিনুনীতে ফুল গোঁজা, কাছা দিয়ে শাড়ী পরা মারাঠী মেয়ে চলেছে খালি পায়ে, ঐ যে ছেলেটা খালি গায়ে হাফ প্যাণ্ট পরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ যে বৃদ্ধ মুসলমান দাড়ি নেড়ে হাত দুলিয়ে গল্প করছে, আর ঐ যে রাঙা বালির প্রান্ত ঘিরে সবুজের সীমানা—এদের সকলের সঙ্গে একটা গভীর আত্মীয়তা-বোধ শিরায় উপশিরায় রিন্‌রিন্‌ করে ওঠে। যতই মনে করতে চাই, এ যাওয়া তো নিতান্তই সাময়িক তবু কেমন একটা বিষণ্ণতার সুর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ধরে—যেন বহুদিনের একটা যোগসূত্র ছিন্ন হতে চলেছে। ক্ষণিক বৈরাগ্যের মোহমাখাঁ চোখে তাকিয়ে থাকি। চারদিকে শুধু জল, আর জল, শুধু নীল, আর সবুজ, আর ঘন নীলের ঢেউ কুঞ্চিত হয়ে ঝকঝকে সাদায় ফেটে পড়ে।

এই সমুদ্র কতকাল ধরে, কত কবিকে দিয়েছে প্রেরণা, কত মনীষীর চিন্তা উদ্দীপিত করেছে, আবার কত সাধারণ লোকের চোখের সামনেও মেলে ধরেছে বিরাটের ছবি। তাদের সে বহুবিচিত্র মনোভাবকে বুঝতে চেষ্টা করি, কিন্তু দুর্বল হৃদয় সে বিচিত্রকে অনুভূতির গোচর করতে পারে না। হাল ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। ঢেউখেলানো নীল জল অবিশ্রান্ত ছুটে

চলে,—অথচ নদীর মত এর বিশেষ কোন লক্ষ্য নেই—বিশাল বিরাট একটা স্থিতির মধ্যেই অনুক্ষণ এর উদ্দাম গতির লীলা। 'অনন্ত', 'অসীম', এই সব কথাগুলি আমরা মুখে খুব ব্যবহার করি বটে, কিন্তু এদের যথার্থ মানে বুঝতে গেলে বিহ্বল হতে হয়। তবু সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যেন অসীমের একটা আভাস পাওয়া যায়। একটার পর একটা ছোট ঢেউ ওঠে পড়ে, ছোট ছোট ফেণার ঝিকিমিকি বিকীর্ণ করতে করতে ছুটে চলে—তার কোন লক্ষ্য নেই, তার চলায় সে কোন কিছুকেই অতিক্রম করে না—তবু তার অন্তহীন চলার শেষও তো দেখতে পাই না। দু'দিন ধরে তরঙ্গিত নীল জল মাঝে মাঝে সাদার ছিটে নিয়ে অনবরত ঘুরছে। নিজের মধ্যেই পূর্ণ এর গতি, অনন্তের ছোট একটি ছবি।

অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছে—এইবারে স্নান করতে যাওয়া যাক। ছোট ছোট টব ভর্তি সমুদ্রের জল—পরিচারিকার মেজাজ ভাল থাকলে তার কাছ থেকে এক জগ পরিষ্কার জল হয়ত আদায় করা যায়। এরা এত পরিচ্ছন্ন পরিপাটি, এত সাজানো গোছানো, সুন্দর ঝকঝকে, তবু আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এদের অত্যন্ত নোংরা লাগে। মনে হয় সেই বর্বর জাতির অভ্যাসগুলো, এদের পালিস-করা মুখোসের অন্তরালে আজও আছে লুকিয়ে। আমরা যে মাংস খাই মসলার গন্ধে আর রঙে তার চেহারা যায় বদলে। এদের খাবার পুরোপুরি মাংসের মতই দেখতে—সেই আদিকালে যেমন ভাবে মাংস খেত, আধসেদ্ধ করে কিম্বা পুড়িয়ে—খেতে বসলে, নিহত পশুটার কথা মনে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। সব জিনিষ জলে ধুয়ে পরিষ্কার না করলে আমাদের ভাল লাগে না। এদের সে বালাই নেই। সাড়ে আটটায় জল চলে যায়, ন'টার সময়ে ষ্টুয়ার্ডেস এসে একটা ভিজে ও একটা শুকনো ঝাড়ন দিয়ে কাঁচের গেলাস ও জগগুলো মুছে মুছে চক্‌চকে করে রেখে যায়। জুতোগুলো

ঝেড়েঝুড়ে যার যার বিছানার কোণে বেশ করে সাজিয়ে রেখে দেয়। এখানে ওখানে পড়ে থাকলে, পাঁচ জনের অসুবিধা, তার চেয়ে যার যার বিছানায় থাকা ভাল। ঐ ভয়ে আমি এক জোড়ার বেশী জুতোই বার করলাম না। কিন্তু ভারী ফিটফাট এদের অভ্যাস। এত লোকে এক বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, অথচ মেঝেতে এক ফোঁটা জল পড়ছে না। একসঙ্গে বাস করতে হলে যে সহিষ্ণুতা থাকা দরকার তা এদের আছে। একজনের মুখধোয়া সম্পূর্ণ শেষ হলে তবে আর একজন তাকে জিজ্ঞেস করে এগোয়, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এদের সব কাজ করা অভ্যাস যে, বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। ওদের চরিত্রের মধ্যে যে একটা সতেজ স্বচ্ছন্দ সাবলীলতা আছে, সেটা ঈর্ষার বিষয়। এদের এই গুণটি আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, তাই বলেই যে হুবহু এদের মতই হয়ে উঠতে হবে, তার কোন মানে নেই।

ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙল, তখনই বেশ আলো হয়েছে। স্নান সেরে বেরোতেই হাস্যমুখী পরিচারিকা সাগরের মত নীল পোশাকে সাদা ফেনার মত টুপি পরে জানিয়ে গেল ব্রেকফাষ্ট তৈরি। এখানে ঝি-চাকরদের বড় কদর—কথায় কথায় তাদের ধন্যবাদ দেওয়া হয়। কোন কিছু করতে বললে, 'অনুগ্রহ করে' কথাটি বলাই রীতি।

আমাদের কেবিনে যে চারটি ইংরেজ মেয়ে চলেছে, তাদের ভারতীয় নাম ; অর্থাৎ তাঁরা বৈবাহিক সম্পর্কে ভারতীয়। ভারতের এই বধূরা একটু ফাঁক পেলেই তাঁদের ভারতীয় ঐশ্বর্যের কথা জানাতে ভোলেন না। এঁরা সকলেই কিছু দিনের জন্যে পিতৃগৃহে চলেছেন, আত্মীয়স্বজন যে তাঁদের সুখসমৃদ্ধি, তাঁদের ভৃত্যপ্রতুলতা, তাঁদের আসল হীরা-মোতি বসানো সোনার গয়না দেখে কি রকম চমৎকৃত হয়ে যাবেন একথা তাঁরা প্রায়ই আলোচনা করেন। অর্থাৎ পতিগরবিণী না হলেও এঁরা পতিগৃহগরবিণী বটে। একজন

বললেন—“আমি ইণ্ডিয়াতেই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাব।” আর একজন বললেন—“ইণ্ডিয়াতে আরো বহুদিন পর্যন্ত বিদেশীদের থাকতেই হবে, ভারতেরই ভালোর জন্যে। বিদেশীদের কাছে তাদের অনেক কিছু শেখবার আছে।” বললাম—“ওগো বিদেশিনী, বিদেশের কাছে অবশ্যই ভারতের কিছু শিক্ষা এখনো বাকী আছে, তবে ভারতের কাছেও অন্যান্য দেশের বহু শিক্ষা নেবার আছে। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যদি বিদেশকে এসে ভারতের ঘাড়ে চাপতে হয়, তবে ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই ভারতকেও অদূরবর্তী কালে হয়ত গিয়ে অন্য দেশের ঘাড়ে চাপতে হতে পারে।” ভারতে দুর্বিনীত ভৃত্যের সংখ্যা কি রকম বেড়ে উঠেছে সে বিষয়ে বর্ণনা করতে করতে, একদিন এঁদের মধ্যে একজন (যিনি নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দেন অথচ বাংলা ভাষা জানেন না) বললেন, সেদিন এক পুরোনো ভৃত্যকে মুখে মুখে উত্তর দেওয়ার অপরাধে তিনি তাড়িয়ে দিয়েছেন, যদিও জানেন বিশ্বাসী লোক পাওয়া সহজ নয় তবু কি করবেন—চাকরদের কাছ থেকে দুর্বিনীত ব্যবহার তো সহ্য করা যায় না। গল্প করতে করতে আমরা খাবার টেবিলে এসে বসি। ভারতের গল্প ক্ষণেকের জন্যে মেমসায়েবকে ভারতীয় মেজাজ এনে দেয়। ষ্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে রুক্ষকণ্ঠে তিনি বলেন—“এত ময়লা গেলাসে জল খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।” বলতে বলতে বোধ হয় মনে পড়ে যায়, তিনি এখন ইউরোপের পথে এবং ভৃত্য হচ্ছে একজন পুরোপুরি লালমুখ ইংরেজ, যে, চক্‌চকে কালো প্যাণ্টের ওপরে ঝক্‌ঝকে সাদা কোট পরে তাঁদের খাবার বহন করে আনছে। তক্ষুনি শুধরে নিয়ে মেমসায়েব বললেন—“অনুগ্রহ করে গেলাসটা বদলে দাও।” কিন্তু এত সহজে এদের শান্ত করা যায় না। ষ্টুয়ার্ড একটু গর্ব করার ভঙ্গী করে বললে—“কি করব ম্যাডাম, তুমি এত শীঘ্র সকলের আগে এসে টেবিল দখল করো, যে টেবিল সাজাবার সময় আমরা পাই না।” সাদা মুখ লাল করে বুড়িকে কথাগুলো

হজম করতে হয়। হাসি গোপন করে বলি,—"দেখ তো আস্পর্ধা, ভারত হলে, তুমি নিশ্চয় কর্তাকে বলে ওকে তাড়াবার চেষ্টা করতে।" মুখ গোঁজ করে বুড়ী বললে,—"সে আমি এখনো পারি, তবে থাক গরীব বেচারার সর্বনাশ করে আর লাভ কি?" বস্তুত ষ্টুয়ার্ডের অভিযোগ সত্য। বুড়ী দু'জন সবার আগে টেবিলে বসে ভাল ভাল জিনিষ যথা, জ্যাম মাখন চিনি সব নিজেদের কাছে জড়ো করে রাখত; সেইজন্যে কেউই ওদের বিশেষ পছন্দ করত না।

আমাদের খাবার ঘরে দুটো বৈঠক বসে। প্রথম বৈঠকে একজন ইংরেজ পুলিশ অফিসার আমাদের টেবিলে বসেন।—মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারা—ভারতের ঘি দুধের প্রভাব এঁর দেহের মধ্যভাগ পূর্ণ করে রেখেছে। সে বিষয়ে এঁর দৃষ্টিও খুব প্রখর অর্থাৎ ইনি নিমক-হারাম নন—ভারতের জয়গান সব সময়ে এঁর কণ্ঠে। এই ভদ্রলোক উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একজন অফিসার—অনর্গল পুস্ত বলেন,—সঙ্গে একটি ভারতীয় বন্ধুর ছেলেকে নিয়ে চলেছেন—বিলেত দেশটা দেখাতে। ছেলেটি বয়সে তরুণ, ধর্মে মুসলমান, এক অক্ষরও ইংরিজী বলতে পারে না—চুপচাপ সলজ্জ ভাবে থাকে, সব সময়ে সায়েবের ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। কখনো বা ডেকের এক কোণায় বসে কোন পুস্ত ভাষার বই পড়ে, কিম্বা লেখে ডায়েরী। সায়েবের মনোগত ভাব কি জানা নেই, কিন্তু সুযোগ পেলেই আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে খুব কষে ইংরেজদের গাল পাড়েন এবং বলেন ভারতীয়েরা সব বিষয়ে ইংরেজদের চেয়ে অনেক ভাল।

নৈশ ভোজের বৈঠক বসে ছ'টার সময়ে। ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের মা-বাবার জন্যে নির্দিষ্ট এই বৈঠক। কিন্তু ছ'টার সময়েই রাত্রির আহারপর্ব শেষ করে নেবার কথা ভাবতে আমাদের কি রকম লাগে। তাই একটু চেষ্টা করে দ্বিতীয় বৈঠকে আমাদের স্থান করে নিয়েছিলাম। এ বৈঠকে

খুকুই একমাত্র ছোট তরফের প্রতিনিধি। তাই সকলের দৃষ্টি ওর ওপরে পড়ে। ষ্টুয়ার্ড তো রীতিমত ওর মায়ায় বাঁধা পড়েছে। নানা জিনিষ যা ওর ভালো লাগতে পারে, আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখে, এবং 'খুকুর স্পেশাল' বলে ওর সামনে রেখে দেয়। বুড়ী দু'জনও খুকুর এই আদর-যত্নে খুশী হবার ভান করে, আত্মীয়তা দেখিয়ে বলে, "আমাদের যে হিংসে হচ্ছে খুকুর এত আদর দেখে।" কিন্তু টেবিলের অন্য সকলে বিশেষত, 'এ' সায়েব, কথাটার মধ্যে কিছু সত্যতা দেখতে পায়, এবং বলে যে খুকুকে ওদের সামনে খেতে দেওয়া ঠিক নয়।

তিন দিন ধরে জাহাজ ছুটে চলেছে—দিনে পাঁচ্‌শ মাইল করে পার হয়ে যাচ্ছে। অনেকেই বলছে সমুদ্র দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে—আমাদের কিন্তু এত ভাল লাগছে! সারাদিন ডেকের রেলিঙে ভর দিয়ে শুনছি অসীমের কলরোল—নেশার মত লাগে যেন, ডেক ছেড়ে কোথাও যাওয়া চলে না। ছোট্ট খুকু লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে—সমুদ্রের বেগ ওরও কল্পনায় দিয়েছে দোলা—খালি বলছে, আমি ওই জলের নীচে চলে গিয়ে ঢেউয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ফেনার সঙ্গে লাফিয়ে উঠি।

সারাদিন সমুদ্র শান্ত—হাওয়ার বেগ কমে এসেছে, তরঙ্গিত কালো জলে সাদার ঝিকিমিকি মিলিয়ে এসেছে—কিন্তু আজ সকাল থেকে আমাদের এই ছোট দ্বীপটি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে—চাকর-বাকরদের মধ্যে একটা সন্ত্রস্ত চকিত ভাব—মাঝে মাঝে এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরে চুপি চুপি কথা কইছে। হঠাৎ মাইকে অনুরোধ শোনা গেল—জাহাজে যদি কেউ সেবিকা থাক তবে তোমাদের সেবা আমাদের প্রয়োজন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, জাহাজে দু'জন অসুস্থ। একটি দেড় বছরের

শিশুকে ওপরের বার্থে রেখে তার মা মুখ ধুচ্ছিল, ইতিমধ্যে শিশুটি পড়ে গেছে, তার ক্ষত থেকে এখনো রক্ত ঝরছে। তাকে আর বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। সৈন্যদের মধ্যে একজন মারাত্মক রকম অসুস্থ—তার জন্যে হাওয়ায় লোহার 'লাঙ্‌স্‌' ও অক্সিজেন পাঠাবার জন্যে, হাওয়ায় খবর গেছে এডেনে। সৈন্যদের থাকবার জায়গার কথা মনে পড়ছে—জাহাজে নিম্নতম অংশগুলিতে তারা থাকে দড়ির ঝুলিতে শুয়ে—আমাদের মালপত্রের গুদাম-ঘরে বাক্স পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের দেখেছি—মানুষ কি অমন ভাবে থাকতে পারে? যদিও দিনের বেলায় ডেকের অর্দ্ধেকটা তাদের দখলে থাকে—রাত কিন্তু কাটাতে হয় ঐখানেই।... দুপুরবেলায় শোনা গেল শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। দেড় বছর আগে তার জন্মদিনে কে ভাবতে পেরেছিল যে, লোহিত সাগরের জলরাশি চিরতরে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। বেলা দুটোর সময় জাহাজ থামল দু'মিনিটের জন্যে। শিশুটিকে সমুদ্রে বিসর্জন দিয়ে তিন বার বাঁশী বাজায় জাহাজ, তার পরে আবার ছুটে চলে। মুহূর্তের উত্তেজনা মিলিয়ে যায়, আবার যে যার কাজে মন দেয়,—শুধু একটি মায়ের জীবন শূন্য হয়ে যায়।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি রেলিঙে ভর দিয়ে—গাঢ় নীল জল তেমনি শান্ত স্থির—মায়ের বেদনার ছায়ামাত্র কোথাও পড়েনি। প্রখর সূর্যের আলো জ্বলছে জলের উপরে রূপোর চাঁদের মত। মনটা এখনও পর্যন্ত শ্মশানবৈরাগ্যের ভাবকে মুছে ফেলতে পারেনি। হঠাৎ আবার একটা উত্তেজনার ঢেউ শূন্য ডেককে প্লাবিত করে দেয়—দলে দলে লোক এসে দাঁড়াচ্ছে। রেলিঙে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, এ ওর মাথা টপকে দেখতে চায়—খুকুকে খুঁজতে যাব ভেবে ঘুরেই দেখি একটু দূরে ওর এক ভক্তের কাঁধে চড়ে দেখছে। কি এত ব্যাপার,—সবাই বললে—ঐ দেখ, ঐ দেখ—বড় বড় মাছ লাফাচ্ছে জলের উপরে—এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়ালই

করিনি—বাচ্চাগুলো মাছ দেখে ওদেরই মত লাফাতে লাগল। এদিকে কেউ একটা দেখল, তো, ওদিকে আবার কে চেঁচিয়ে উঠল,—দেখ দেখ, করে,—এতক্ষণের বিষণ্ণতার ছায়া যেন এক নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়। জাহাজের গতি অত্যন্ত ধীর—সেই জন্যেই এত মাছের লাফালাফি দেখা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে জাহাজ থামল। দুপুরবেলার ঘুমের মায়া ত্যাগ করে যারা মাছ দেখতে এসেছিল, বিধাতা তাদের জন্যে আরও একটু উত্তেজনার খোরাক রেখেছিলেন জুটিয়ে। নাবিকেরা নেমে দাঁড়িয়েছে জাহাজের পাশে—একটি ছোট লাইফ বোট বা জীবন-তরী জলে নামিয়ে দিলে—জলের দিকে তাকানো যায় না—প্রচণ্ড সূর্য ছুরির ফলার মত জ্বলছে—দূর থেকে গর্জন করে আসে একটা উড়ো জাহাজ—লাইফ বোটের মাথার ওপরে ঘুরতে ঘুরতে গুমরাতে থাকে, প্যারাসুটে করে নেমে আসে লোহার ফুসফুস, নেমে আসে থলিভর্তি বিশুদ্ধ হাওয়া। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—আহা, সৈন্যটি হয়ত বাঁচবে। জিনিষ দিয়ে ফিরে যায় বিমান, লাইফ বোট তুলে নিয়ে বেঁধে রাখে এরা জাহাজের পাশে—সন্ধ্যাবেলা জানা যায় সৈন্যটির মৃত্যু হয়েছে। মানুষের বুদ্ধি এত চেষ্টা করেও তাকে রাখতে পারে না—'যাবার দিকের পথিক যে', তাকে চলে যেতেই হয়। আবার জাহাজ থামে—আবার বাঁশী বাজে তারপরে আবার ছুটে চলে নিজের লক্ষ্যপথে—সৈন্যেরা মেতে ওঠে নিজেদের খেলা আর গানে।

লোহিত সাগরের জল তেমনি সাদার ছিটে মেশানো গলিত সবুজ। ইকোয়েটারের (বিষুবরেখার) কাছাকাছি—সূর্যকে বড় বেশী প্রখর লাগে। কোথাও ঢেউয়ের সঙ্গে দুলছে সহস্র ছোট ছোট সূর্য—কোথাও রোদ যেন গলে গিয়ে বয়ে যাচ্ছে—কি আশ্চর্য একটা মিশ্র রং ফুলে ফুলে ছুটছে—আর প্রত্যেকটা কিরণরেখা বিভিন্ন রঙে জ্বলে উঠছে—কি আশ্চর্য্য এত রঙের সমারোহ—

অথচ কল খুললে সেই জল বেরোবে অত্যন্ত শ্রীহীন—ফ্যাকশে সাদা পান্‌সে। খুকু অবাক হয়ে গেছে—'রেড্‌সীর' জল কেন লাল নয়?—কেউ বললে এখানে নাকি আগে অনেক লাল মাছ ছিল—তাই এর নাম লাল সাগর, কেউ বা বললে—এর দুই তীরের বালির রং লাল, তাই।

দূর থেকে ছায়ার মত অস্পষ্ট তীরের আভাস দেখা যাচ্ছে সকাল থেকে। দুপুরের দিকে সমুদ্রটা সরু হয়ে এল—একেই বোধ হয় বলে সুয়েজ উপসাগর। দু'দিক থেকে তটরেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে আসছে—রোদের আলোয় ও রৌদ্রপ্রতিফলিত বালির আভায় লালচে পাহাড়গুলো মিশে গেছে কুয়াশাঢাকা আকাশে। একদিকে আফ্রিকা ও অন্য দিকে আরবের মরুভূমি। অত দূর থেকে বোঝা যায় না, মানুষের নিবিড় বসতি ওখানে আছে কি নেই। শুধু বালি-ঢাকা নীচু পাহাড়ের চূড়োগুলো ইসারা করে আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরণ্যের নিবিড় রহস্যের দিকে। কোন্ আদিকালে আরবের সঙ্গে যুক্ত ছিল আফ্রিকা—কোন্ প্রলয়ের উদ্দাম উত্তালে কবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে এশিয়ার অঙ্গ থেকে কে জানে। সভ্যতার সর্বপ্রথম হাটে, আফ্রিকার যেদিক তুলে ধরেছিল নিজের পণ্য—এ সেই ঈজিপ্ট। বিশাল মহাদেশের অন্যদিকের বক্ষ ঢাকা আছে তমসাচ্ছন্ন অরণ্যের রহস্যে—আজো তার কিছুই জানা হয় নি। সেখানে মানুষ আজও করছে আদিম জীবনধারার অনুবর্তন। সভ্য মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি সেখানে আজো কেবলমাত্র ধনমুষ্টিরই সন্ধান করে ফেরে।

মঙ্গলবার দশটা নাগাদ সুয়েজে পৌঁছানো গেল। দূর থেকে শহরটা ছবির মত লাগছে। খেজুর গাছের ফাঁকে ফাঁকে সাদা বাড়ি—মসজিদের চূড়া। এইখানে জাহাজ থামে অনেকক্ষণ—সবুজ জলের উপরে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা পাল-তোলা নৌকা ছড়িয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে পাশ দিয়ে চলেছে ছোট ছোট মোটর-

বোট—তাতে যারা বসে আছে তাদের গায়ের রং আমাদেরই মত—মাথায় লাল উঁচু টুপী—কারো বা পরনে সাদা আলখাল্লা, মাথায় সাদা আঁটসাট টুপী। তারা ভুস করে জল কেটে একেবারে জাহাজের পাশে এসে দাঁড়ায়, আবার ছুটে চলে যায়। জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে পাইলটের আশায়। বেলা দুটো নাগাদ পাইলট এসে পৌঁছায়। লোহিত সাগরের সীমা পেরিয়ে সুয়েজ খালের মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করে। মানুষের বুদ্ধিকে অভিনন্দন জানাই—প্রকৃতির কতদিকের বাধাকে সে কতরকম ভাবে অতিক্রম করেছে। একদা দুই সমুদ্রের মাঝখানে ছিল আশী মাইল দীর্ঘ মরুভূমি। বালির নীচে সমুদ্র পড়েছিল চাপা। পুরাকালে রামচন্দ্র সমুদ্র-শাসন করে রচনা করেছিলেন সেতুবন্ধ, এ কালের মানুষ সমুদ্রকে উদ্ধার করলে বালির স্তূপ থেকে। দুপক্ষেই ফল এক—মানুষের সুবিধা।

খালটি কিন্তু নিতান্তই সাধারণ—এতবড় তরণীকে কি করে বহন করে নিয়ে যায়—এ আশ্চর্য। খালের একদিকে এখনো চলছে আফ্রিকার উপকূল—অন্যদিকে আরব। এক দিকে খেজুর গাছের ছায়ায় ঘেরা ছোট ছোট শহর—সেখানে ছেলেরা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়ছে। জলের ধার দিয়ে পরিষ্কার কালো পীচের রাস্তা চলে গেছে দূরে—হুস হুস করে যাচ্ছে মোটর গাড়ি, যাত্রী বোঝাই বাস চলেছে ধেয়ে—কিম্বা মিলিটারী লরী; দূর থেকে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে ট্রেন—কোথাও সৈন্যদল জাহাজের সঙ্গীদের প্রতি ইঙ্গিত করে হাত নেড়ে গান ধরেছে—কোথাও এক-দল মিশরীয় সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে—জাহাজের গোরাদের দেখে তারা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে ওঠে। অন্যদিকে আরবের শুষ্ক রিক্ত মরুভূমি—ধূ ধূ করা কঠিন ধূসরতা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ—আর কিছু নেই—। কোথাও উঁচু হয়ে উঠেছে বালির পাড়—দূর থেকে লালচে পাহাড়ের ছবি দেখা যাচ্ছে

—কোথাও মাঝে মাঝে এখনো রয়েছে সৈন্যদের ছাউনি। আর দুই তীর ভর্তি করে পড়ে রয়েছে রাশি রাশি এরোপ্লেন ও জাহাজের ভাঙা টুক্‌রো। যুদ্ধে ইংরেজদের কত জাহাজ যে এখানে নষ্ট হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

দূর থেকে দেখা যায় বালির স্তূপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ উট। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি ;—ধীরে ধীরে সরে যায় কালের যবনিকা ;—ঐ যে উঁচু বালিয়াড়ির পাশ দিয়ে সারি সারি আসছে উটের দল—তাদের কুঁজগুলি মখমলের কার্পেটে ঢাকা—জরির আলখাল্লা পরে মাথায় নানা রঙের পাগড়ী বেঁধে ও কারা বসে আছে তাদের পিঠে ; পেছন পেছন আসছে আরো উটের দল—তাদের পিঠে পণ্যসম্ভার। ওরা চলেছে পূর্বদেশে বাণিজ্যের সন্ধানে ;—ওরা এশিয়ার সর্বত্র চালাবে ব্যবসা—আর বাণিজ্যের সূত্র ধরে ওদের আচ্ছন্ন করবে প্রভুত্বের লোভ। ওদের নিষ্ঠুর লোভের চাকায় একদিন এশিয়াকে আত্মবলি দিতে হবে। ইরান থেকে ভারত এবং প্রায় চীন পর্যন্ত সর্বত্র উড়বে ওদের জয়ধ্বজা।

ওরা আরব-ব্যবসায়ী, কঠিন রিক্ত মরুভূমিতে ওদের বাস—তেমনি শুষ্ক নিষ্ঠুর—ওদের কানে এখনো পৌঁছয়নি ধর্মের বাণী। মানুষের তৈরি ভণ্ডামির নীতি ওরা বিশ্বাস করে না—ওরা জানে ওদের কোথাও বাধা নেই। হঠাৎ ওদের মধ্যে ওই কে জেগে ওঠে নূতন ধর্মের বাণী নিয়ে—ডেকে বলে ঈশ্বর এক, বলে সর্ব মানুষের সৌভ্রাত্রে রাখো বিশ্বাস। ওরা বিশ্বাস করে না নূতন উপদেশ—বার করে দেয় তাঁকে দেশ থেকে। কিন্তু ধর্মের বাণীকে মর্যাদা না দিলেও, শেষ পর্যন্ত তলোয়ারের বাণীকে তারা উপেক্ষা করতে পারে না,—নবীন ধর্মের উত্তেজনায় তারা এক হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার প্রথম স্তরের সোপানগুলির সবশেষ ধাপের চূড়োয় তারা উঠে যায়। বড় হয় দৈহিক

শক্তিতে, বড় হয় অর্থে,রাজত্বে এবং শিল্পে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, কেবল বিলাসবৈভবের সমৃদ্ধির মধ্যেই মানুষের চরম সার্থকতা নেই। মানুষের যে বুদ্ধি ত্যাগের পথে বিশ্ব ও আত্মার রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত, সকল মানুষকে শান্তিদানের উপায় উদ্ভাবনে মগ্ন, সেই বুদ্ধি তাদের মধ্যে গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তাই তারা চলতে চলতে পিছিয়ে পড়ে—সেই পুরোণো ধর্মকে কেন্দ্র করে তারই চারদিকে ঘুরতে থাকে। তাকে ফেলে রেখে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে যায় ইয়োরোপ। যাকে তারা একদিন বাঁধতে চেয়েছিল আজ তারই জালে নিজেরা ধরা পড়ে। তাকে ছাড়িয়ে একদিকে ইয়োরোপ যেমন উঠে যায়, ধনসমৃদ্ধি বিলাস-বৈভবের সৌধচূড়ায়, ছুটে যায় হিংসা, দ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ও প্রভুত্বের চরম সীমায়, অন্যদিকে তেমনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে অজস্রধারে বিলিয়ে দেয় আপন বুদ্ধি। একদিকে যেমন লোলুপ ইউরোপের নিষ্ঠুর বুদ্ধির তাড়নায় এশিয়াকে দিতে হয় আত্মবলি, অন্য দিকে তেমন বিজ্ঞানী ইউরোপের কল্যাণবুদ্ধি বিদ্রোহ করে ওঠে। ইউরোপ থেকেই সর্বপ্রথম আসে এশিয়ার মুক্তির দাবি।

তীব্র আলোয় আয়নার মত জ্বলছে খালের জলরেখা। আরবের মরুভূমি ও আফ্রিকার তটদেশকে ঘিরে ঘিরে আরব্য উপন্যাসের ছবিগুলো যেন ফুটে উঠতে চায়।—কোথায় গেল সেই দিন, যেদিন ক্লিয়োপেট্রার রাজধানীকে ঘিরে ধরেছিল সীজারের সৈন্যদল ? সেদিন যে ঘটনা সবচেয়ে সত্য ছিল, আজ কি করে তা এমন শূন্য হয়ে মিলিয়ে গেল। এই সমুদ্র সেদিনও তো ছিল এমনি তরঙ্গসঙ্কুল—সেদিনের সেই মরুভূমির নিষ্ঠুরতা আজও তেমনি করেই ঘিরে আছে মানুষের পৃথিবীকে। ছোটবেলায় একদিন বসে বসে ইতিহাস ও ভূগোলের পাতা উল্টে যেতে হয়েছে।—আজ চলেছি সেই ভূগোলের পাতাগুলি আর একবার খুলে খুলে,—কিন্তু ইতিহাসের পাতাগুলি একেবারে বন্ধ। তাকে চোখের সামনে মেলে ধরব কেমন

করে? কল্পনায় যে ছবিগুলি ভেসে ওঠে তার সঙ্গে সেদিনের বাস্তব ছবির সত্য কোন মিল আছে কি?

বেলা পড়ে আসে—মরুভূমির দিগন্ত রঙীন করে সূর্য অস্ত যায়। আজ রাত বারোটার পরে এক ঘণ্টা সময় আরও পিছিয়ে দিতে হবে। এদিকে যতই এগোচ্ছি, ততই ঘড়ির সময় বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে চলেছি। পরদিন সকাল হতে দেরী হয়—ঘুম ভেঙে উঠে দেখি বেলা হয়েছে, নৌকা থেমেছে পোর্ট সৈয়দে। নৌকার পরে নৌকা করে ব্যাপারীরা এসেছে জিনিষপত্র বিক্রী করতে। জাহাজে ওঠার নিয়ম নেই—নৌকা থেকে দড়ি দিচ্ছে ছুঁড়ে, তাই দিয়ে ঝুড়ি করে করে এরা টেনে নিচ্ছে ডেকের ওপর থেকে। এত জিনিষে ভর্তি সকলের মালপত্র, তবু লোভের অন্ত নেই—এ ওটা কিনছে সস্তায়, অমনি সে ছুটল সেটার সন্ধানে—আবার ওরি মধ্যে পরস্পরকে সতর্ক করে দিচ্ছে—দেখে শুনে কিনো, আগেই যেন টাকা দিয়ে বোসো না, 'এরা দারুণ চোর'—আর একজন বললে—'পূর্ব-দেশের সর্বত্রই honesty জিনিষটার বড় অভাব।' মনে হ'ল, চেঁচিয়ে বলি, 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে'।

পথের মধ্যে 'এ' সায়েব ছুটতে ছুটতে এলেন—ওঃ ভীষণ মজা, —কি ব্যাপার—'চ' বুড়ীর নাকি একটা ব্যাগ দারুণ পছন্দ হয়েছে। —'এ' সায়েব বলেছেন—'ভাবনা কি, এখানে বড় বেশী দাম, আমি আমার কেবিনের পোর্ট হোল থেকে দড়ি টেনে কিনে নিচ্ছি। তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।' বুড়ীকে উপরে ডেকে ব্যাগের আশায় দাঁড় করিয়ে রেখে ভদ্রলোক নীচের ডেকে এসে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা বললাম—'যাচ্ছি আমরা ওপরে, সব বলে দিচ্ছি, তোমার কারসাজী—সে বললে, 'ওঃ সে তোমরা পারবে না। এমন সব কথা বলব, যে আমার উপরে দৃঢ় বিশ্বাস হবে—তা ছাড়া,' চোখ টিপে 'এ' সায়েব বললেন,—'ও যে আমাকে দেখে একেবারে মজে

এসেছে'। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি—'চ' বুড়ী নীচে থেকে ছুটে আসছে—ছ'হাতে ছুটো ব্যাগ। 'এ' সায়েব লাফিয়ে উঠলেন,—'একি, তুমি কেন ব্যাগ কিনতে গিয়েছিলে—এই তো আমি তোমার জন্যে একটা কিনলাম'।—'চ' বুড়ি বললে—'আমার বয়স তোমার দ্বিগুণ— যদি সত্যি ব্যাগ কিনে থাক, তবে তোমার বান্ধবীর জন্যে কিনেছ, আমার জন্যে কেন কিনতে যাবে?' 'এ' সায়েব আমতা আমতা করে বললে—'বাঃ তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না'। বুড়ী হেসে চলে গেল—'তুমি বোকা, তাই মনে কর, আমিও বোকা।' জিনিষ কেনাবেচা চলে বেলা চারটে অবধি। পাঁচটা নাগাদ জাহাজ ছাড়ে। প্রখর দিনের আলো—তবু শুক্ল পক্ষের বাঁকা চাঁদ মাথার ওপরে ভেসে ওঠে। নৌকা চলে এগিয়ে। লোহিত সাগরের সীমানা ছাড়িয়ে ভূমধ্যসাগরের বিশাল বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ করি। সেই এক জল, এক ঢেউ, সেই এক গম্ভীর গর্জন—তবু দেখে দেখে চোখ কখনও ক্লান্ত হোল না।

বৃহস্পতিবার। স্নান সেরে ডেকে এসে দাঁড়ালাম—কি আশ্চর্য! —সমুদ্র কোথায় গেছে হারিয়ে, তার বদলে একটা নরম পাতলা ধূসর রঙের চাদর বিছানো,—ধূসর আকাশের সঙ্গে এক হয়ে মিলে গেছে। ভূমধ্যসাগর যখন শান্ত তখন নাকি এমনি শান্ত সব সময়, শুধু যখন মেঘে মেঘে চারদিক কালো হয়ে ওঠে তখন একেও চেনা যায় না, উদ্দাম নৃত্যে এও তখন মেতে ওঠে। কিন্তু এখন—একেবারে—

—'অকূল শান্তি সেথায় বিপুল বিরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।
ধীর গম্ভীর গভীর মৌনমহিমা,
স্বচ্ছ অতল স্নিগ্ধ নয়ন নীলিমা।'

নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একটা শান্ত পরিবেশ। এদিকে সকাল হচ্ছে অন্ধকার

থাকতে, ওদিকে দিনের সীমারেখা বেড়ে যাচ্ছে সন্ধ্যে ছাড়িয়ে। আটটার সময়ও যথেষ্ট আলো। জাহাজে কোথায় আজ সিনেমা হচ্ছে,—কাল নাচ চলেছিল। যাত্রীদের আনন্দ পরিবেশন করবার বহু উপায় রয়েছে। চোখের সামনে এমন সুন্দর দৃশ্য ছেড়ে সবাই নীচে গিয়ে সিনেমা দেখছে। ঘড়িতে সময় যতই এগিয়ে যাক—আজকে দেখতেই হবে ভূমধ্যসাগরের বুকের ওপরে কেমন করে নেমে আসে রাত্রি—১১টা বেজে না গেলে রাতকে বোঝবার যো নেই। প্রায় ১০টা অবধি দিনের আলো থাকে। পরিষ্কার আকাশ—মেঘশূন্য নির্মল-নীলকে উজ্জ্বল করে হেসে ওঠে চাঁদ। ক'দিনের সমুদ্রের হাওয়ায় ওর শীর্ণতা গেছে ঘুচে।—অদ্ভুত আলোয় অতল রহস্যে ডুবে যায় সমুদ্র,—দিনে যাকে পরিষ্কার দেখা গেছে, চাঁদের রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় এক মুহূর্তে বদলে যায় তার মূর্তি। গলিত রূপোর মত দূর থেকে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ভূমধ্যসাগর—আর মাথার ওপরে অসংখ্য হীরের কুচির মত তারা—এত তারা খুব কম দেখা যায়—এমন কি ভারতের আকাশেও। ডেক খালি হয়ে আসছে। চুপ করে বসে থাকি—শুক্লপক্ষের রাত্রি সমুদ্রের উপর দিয়ে ছল ছল করে বয়ে যায়। দূর থেকে একটা জাহাজের আলো দেখা যায়, ওরা আলো দিয়ে ইঙ্গিত করে—আমাদের জাহাজ থেকে ফিরে যায় উত্তর—সবটা মিলিয়ে যে আবহাওয়া তৈরী হয়েছে, তার একটি মাত্র নাম মনে পড়ছে—রোমান্টিক।

আজ ভোর থেকে হাওয়া ছুটছে জোরে—নীল জল গর্জন করে ছুটে চলেছে। সমস্ত দিন চলে এমনি হাওয়ার মাতামাতি—সন্ধ্যের দিকে হাওয়া ছোটে আরো জোরে, শীতে হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যায়—ভাগ্যক্রমে খাবার ঘণ্টা বাজে, নইলে বাইরে টেঁকা দায় হ'ত। অথচ ঘরে বসবার যো নেই—সব চেয়ার অন্যের দখলে।

শনিবার দিন অন্ধকার থাকতে পরিচারিকা এসে দরজায়

টোকা মারে—"সাতটা বেজেছে মহিলারা"—অবাক কাণ্ড, এই রাত্রে উঠবে কে। তবু উঠতেই হয়, নইলে উপোসভাঙার খাওয়া জুটবে না কপালে। কিন্তু উঃ! ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে শরীর—ইউরোপীয় আবহাওয়া দেহের রন্ধ্রে জানিয়ে দিচ্ছে তার উপস্থিতি। তুলছে নৌকা—খাঁচার ভিতর থেকে বেরোনো দায়। ডেকে লোক কমে এসেছে, কিন্তু বসবার ঘরগুলো একেবারে ভর্তি। খাওয়ার সময় খালি হয় একবার করে। তারপরে কে কত তাড়াতাড়ি এসে চেয়ার দখল করবে তাই নিয়ে চলে রেষারেষি। আরার বদান্যতাও চলে ওরই মধ্যে। 'তোমার বাচ্চার সর্দি হয়েছে—আচ্ছা, আমার কাছে ওষুধ আছে বাছা।' এক বুড়ী মেমকে খুকু পেয়ে বসেছে—সমস্তক্ষণ বসে বসে তাকে খুকুর পুতুল ও পুতুলের জিনিষপত্তর তৈরি করে দিতে হচ্ছে। বুড়ী বলছে খুকুর জন্যে তার নাকি খুব মন কেমন করবে। জাহাজের এই সরাইখানায়, অল্পকালের জন্যে যাদের এত কাছকাছি আসতে হয়, তাদের মধ্যে সহজেই কেমন একটা বন্ধুত্বের সূত্র গড়ে ওঠে। ভূমিস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই যে সূত্রটি ছিঁড়ে যাবে, একথা মনে করতে কষ্ট হয়। বয়স্কদের জীবন বহু অভিজ্ঞতায় জীর্ণ, তারা জাহাজের বন্ধুত্বকে—জাহাজের বন্ধুত্ব বলেই জানে,—কিন্তু ছোটরা মত্ত হয়ে ওঠে। খুকু তার ছোট্ট সাদা বন্ধুর সঙ্গে গলা জড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। ছোট্ট দুটি সাদা কালো হাত আজীবন বন্ধুত্বের প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়বদ্ধ। ওদের দু'জনের হাতে ছোট্ট দুটি খাতা—তাতে রাজ্যের লোকের ঠিকানা জড় করেছে। তাদের সকলকে নাকি আমায় চিঠি লিখতে হবে। তরুণতরুণীর মধ্যেই অবশ্য এই ক্ষণমিলনের ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী সাঙ্ঘাতিক। তারায় ভরা আকাশের জ্যোৎস্নালুণ্ঠিত আঁচলের তলায় কালো জলের কলকল গর্জনের মাঝে, ঐ যে কিশোরী দাঁড়িয়ে আছে, ঝাঁকড়া সোনালী চুলে রিবন বেঁধে, রক্তনখর কোমল করপল্লব পাশের তরুণের হাতের ওপরে রেখে, সে কি জানে, তার দেহমনের এ স্বপ্নাবেশ, ঐ তারকাখচিত

মায়াপুরীর মতই মিথ্যা। দিনের আলোয় জলে উঠবে নীল জল, ঝকঝক করবে ফেনা, রাত্রির রহস্য যাবে ঘুচে? জাহাজ থামবে—হারিয়ে যাবে যে যার আপন কাজে, আজকের এই মুহূর্তটি কি তখনও থাকবে বেঁচে?

রবিবার দিন ৮টার সময়ও রোদ বেশ ফুটে রয়েচে—চারটের বেশী তাকে কে বলবে। খুকু তো কোনমতেই শুতে যাবে না। বিকেল-বেলায় সে শোবে না, এই তার মত এবং দিনের বেলায় রাত কেন হবে, এই তার জিজ্ঞাস্য। অনেক কষ্টে তাকে শুইয়ে রেখে আসা গেল। এখন রাত দশটা তবু বই পড়া যায় এমন আলো। কলকাতায় এখন বোধ হয় রাত দুটো—আশা করা যাচ্ছে নিশ্চিন্ত আরামে সবাই নিদ্রামগ্ন—যে যার নিজের ঘরে শান্তিতে একটু ঘুমুতে পারছে। এখানে দিন চলছে, কেমন একটা অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে—পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে কে তার খবর রাখে। তিন হাজার যাত্রীর সম্পূর্ণ আলাদা একটা জগৎ—তীরের বন্ধনচ্যুত হয়ে, সব ভাবনাগুলোও যেন খসে এসেছে মন থেকে। তবু যখন দুটোর সময় রেডিওতে বলে,—আজকের খবর বলছি, তখন মনটা কেমন করে ওঠে—তাড়াতাড়ি ছুটে এসে শুনতে পাই, নেহরু কি বক্তৃতা দিয়েছেন, কোন্ প্রাসাদে জিন্না নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এসব কথা শুনে কি হবে, আপন কুটিরের নিভৃত ছায়ায় ভারতবর্ষ কেমন আছে সেই খবরটি জানতে চাই। ভারতবর্ষ কি কোন দিন আবার তার সেই তপোবনের ছায়ায় ঘেরা জ্ঞানের প্রভায় দীপ্ত ও আত্মার জ্যোতিতে উজ্জ্বল শান্ত জীবনের মধ্যে ফিরতে পারবে—না আজকের পৃথিবীর দারুণ ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেই তাকে ঘুরে ঘুরে মরতে হবে? কিন্তু মানুষ যে পথ দিয়ে চলে আসে, সেই পথে আর কি ফেরে? নবীন ভারত যে পথে চলবে, সে পথ প্রাচীন ভারতের পথের অনুরূপ হয়ত হবে না সত্য; কিন্তু প্রীচন ভারতের উত্তরাধিকার

থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়,—আজকের দিনের পঙ্গু ভারতের দুর্বিষহ বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে, নবীন ভারত প্রাচীনের রসে পুষ্ট হয়ে, নতুন্ পথে যেন ছুটে যেতে পারে।

এদিকে জাহাজ এক এক দিনে ৫০০ মাইল পেরিয়ে যায়—চোদ্দ দিনের মধ্যে আমাদের ইংলণ্ডে পৌঁছে দেবেই, এই তার প্রতিজ্ঞা। সকালবেলা, এখানে ওখানে ডাঙার আভাস দেখা যায়—নীল জলের উপরে দলে দলে সীগাল উড়ে চলে—মাঝে মাঝে জলের ওপরে সারি দিয়ে বসে ঢেউয়ের সঙ্গে মালার মত দুলে দুলে ভেসে যায়। ডাঙা দেখে খুকুর মন পাখীর মত উড়ছে—ওর কিচিরমিচিরের জ্বালায় অস্থির হয়ে একেবারে তিনতালার ডেকে চলে আসি। এক দল বুড়ী ওকে ঘিরে ধরে ওর প্রশ্নের জবাব দিতে থাকে।—জিব্রালটারের রঙীন উপকূল চূড়ার মত জলের ওপরে ভেসে ওঠে। কতদিনের কত ইতিহাস, কত লড়াইয়ের, কত রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী এই পাথরে আছে লেখা—দেখি, দেখি আরো একটু দেখে নিই ; কিন্তু জাহাজ চলেছে ছুটে—কোথাও তার গতিবেগ কমে না। স্পেনকে পাশে রেখে, আমরা এগিয়ে চলি—দূর থেকে নীল পাহাড়ের ছায়া বরফের সাদা আভাস মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক ইতিহাসের ইঙ্গিত মেলে ধরে।

আটলান্টিক পার হয়ে ভোর রাত্রে কোন্ সময় 'বে অফ বিস্কে'তে প্রবেশ করেছি জানি না—কিন্তু সমস্ত রাত অসহ্য দুলুনিতে ঘুম হয় নি একটুও। সকালবেলা উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম, কি হ'ল—ব্যাপার কি ? একটি মেয়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে চলে গেল বাথ-রুমে। পোর্ট-হোল দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আকাশের চিহ্ন নেই, জল উঠছে ফুলে, পরক্ষণেই কোথায় মিলিয়ে গিয়ে আকাশ উঠছ ভেসে। এ কি ব্যাপার, বহু কষ্টে জোর করে—উঠে গেলাম মুখ ধুতে, দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সমস্ত উঠে এল।

বুঝলাম একেই বলে সমুদ্রপীড়া। অনেক চেষ্টায় নিজেকে পরিষ্কার করে ফিরে এলাম। মাথা ঘুরছে, উঠে দাঁড়াতে গেলেই পড়ে যেতে হয়। খুকুর বাবা এসে কেবিনের দরজায় টোকা দিলেন। স্নান সারা হয়ে গেছে—পরিষ্কার ফিটফাট, দেখে হিংসে হল—"খেতে এস"।—পাগল নাকি, খেতে যাবে কে? খুকুকে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম, বুড়ী দু'জনের একজন গোঙাতে গোঙাতে খেতে গেল, আর একজন বিছানায় পড়ে রইল—প্রায় সবাই রইল বিছানায় মুখ গুঁজে। পেটের ভেতরের সবকিছু যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়—তার উপরে বদ্ধ গুমট ঘর—কিন্তু তবু উপরে ওঠবার শক্তি নেই। ডেক একেবারে খালি, শুধু ছোট ছেলে-মেয়েরা নেচে বেড়াচ্ছে। সমস্ত দিন উপোস দিয়ে পড়ে রইলাম। শিরায় শিরায় স্পষ্ট অনুভব করি ঢেউয়ের উদ্দাম গতি—শুয়ে থাকলেও তার হাত থেকে নিস্তার নেই; কিছু ভাববার, কিছু মনে করবার শক্তি নেই।

ভোরের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না—সকালে উঠে দেখি বেলা হয়েছে। প্রসন্ন সূর্যালোকের ঝলমলানি নিয়ে হাসছে সাগর।

দূরে দেখা যায় তটভূমির নীল আভা—হালকা শরীর ও মন নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। আজ সমস্ত দিন ধরে চলে আলো-ছায়ার লুকোচুরি। দলে দলে লোক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে—ভুলে গেছে দুপুর বেলার বিশ্রামের কথা। বোধ হয় দেশের কাছাকাছি এসে উতলা হয়েছে মন—যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, এক গাল হেসে বলছে—কেমন সুন্দর দিন, নয় কি? "কে" দম্পতির সঙ্গে একটি ১৮ বছরের তরুণী কন্যা আছে। সে নীল সাগরের রহস্যে-ঘেরা চোখের দৃষ্টি সুদূরে বিস্তার করে বললে, "—একটা দিন এমন সুন্দর আর একটা দিন এমন বিশ্রী হয় কেন?" এই তরুণীর মত কমবয়সী সুন্দরী মেয়ে জাহাজে খুব কম আছে—

সবাই এর সঙ্গে একটু কথার প্রসাদ লাভ করবার জন্যে উৎকণ্ঠ হয়ে থাকে। আমাদের "এ" সায়েব বলেন,—ও তো আমার হাঁটুর বয়সী, তা ছাড়া যেমন বোকা তেমনি ন্যাকা—আমার তো দেখলেই হাসি পায়। কিন্তু "এ"র ব্যবহারে তাঁর কথার সঙ্গতি পাওয়া যায় না।

খুকু বুড়ী-বন্ধুর সঙ্গে ছুটে আসছে—"দেখ দেখ ইংলণ্ড দেখা যাচ্ছে।" দূরে ওই কি ইংলণ্ড—ওই যে বহু দূর থেকে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট জমির ছায়া। তাকিয়ে দেখি জল এসেছে ঘোলা হয়ে—সমুদ্রের সীমানা প্রায় পেরিয়ে এসেছি। পাখীরা আসছে উড়ে—তাদের ডানায় তীরের সঙ্কেত। পরিষ্কার নীল আকাশে শরৎকালের স্ফূর্তি ছড়ানো। সাধারণত ইংলণ্ড সূর্যের প্রসাদবঞ্চিত—কিন্তু আজ নির্মল সূর্যালোকে, সূর্যোদয়ের দেশের পথিককে সে অভ্যর্থনা জানায়—ধীরে ধীরে জাহাজের গতি মন্থর হয়ে এসে থামে 'মার্সি' নদীর মুখে। বন্দরে ঢোকার উপায় নেই।

সারারাত অপেক্ষার পরে, পর দিন ভোরবেলা, নৌকা বাঁধা হ'ল বন্দরে।—পাতলা একটা কুয়াশার আবরণ, চিমনীর ধোঁয়ার সঙ্গে মিলে লিভারপুলের কালো কালো বিরাট বাড়ীগুলোর উপরে জমাট বেঁধে চেপে আছে যেন। সেই কলকারখানা, সেই চিমনীর ধোঁয়া—সেই হাওড়ার গঙ্গার মত ঘোলা মার্সি নদীর জল, শুধু বাড়ীগুলো কালো কালো—আর সবার ওপরে ধোঁয়া ও কুয়াশার মিলিত আবরণী। কলকাতারই যেন একটা মলিনতর বিষণ্ণ ছবি—এই কি ইংলণ্ড? ছোটবেলা থেকে যে দেশ আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—প্রায় দু'শ বছর ধরে যে দেশের সঙ্গে আমাদের এত ঘনিষ্ঠ অথচ এত কঠিন সম্পর্ক, একি সেই দেশ?—এমন মলিন অন্ধকার ছায়া-ঢাকা? চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সামনে পেছনে দেড় হাজার যাত্রীর কিউ।—সব ছাড়পত্রের আশায় আছে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ পাশের লাইনের কিউ

থেকে মুখ বাড়িয়ে সরে এসে বন্ধু বললেন—কেমন লাগছে? তাঁকে বলি, "বেশ খারাপ—এমন অদ্ভুত ভোঁতা জায়গা কখনো দেখিনি—এই নাকি ইংলণ্ড।" হাসিমুখে বন্ধু বলেন—"খোলসটা দেখেই অত দমে যেও না, ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা কর, তবে না রসের সন্ধান পাবে।" চারদিকে হৈ হৈ ব্যস্ততা—কিন্তু তেমন গোলমাল নেই—হুড়মুড় করে কাজ চলেছে, কিন্তু আওয়াজ নেই। বিষম একটা তাড়া সবাইকে যেন ঠেলে নিয়ে চলেছে—এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এরা আর আমরা সম্পূর্ণ দুই আলাদা জগতের লোক—আমাদের পরস্পরের ধমনীতে বইছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রক্তস্রোত। কেমন যেন লাগছে মনের মধ্যে—কে জানে কেমন এই দেশ—কেমন এর লোকজন। সূর্যোদয়ের দেশ থেকে আসে যারা সায়াহ্নের রক্তিমা তাদের কেমন লাগে কে জানে?

॥ বিলিতি গ্রাম ও বিলিতি সহর ॥

ধক্ ধক্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ট্রেন চলেছে এগিয়ে।— দু'ধারে ছড়িয়ে পড়ছে ঘন সবুজের ঢালু জমি। কী সবুজ চারিদিকে,—পৃথিবী যেন ঢাকা পড়েছে নরম সবুজ কার্পেটে। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া স্নিগ্ধ রঙের প্রলেপ মাখানো দিগন্ত। থরে থরে ছড়িয়ে পড়েছে ভাগ করা করা জমি—কোনটি ঘন, কোনটি ফিকে,—পান্নার মত রহস্যময়। নবদুর্বাদল শ্যাম বুঝি একেই বলে। নবীন শ্যামলের বুকের পরে চরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের গরুর দল—সেবায় যত্নে হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।—মোটা মোটা উপুড় করা কলসীর মত ঝুলে পড়েছে দুধের বাঁট।—সেই বাঁট দিয়ে ঘনক্ষীরের উৎস এদেশের ছেলেমেয়েদের ওদেরই মত হৃষ্টপুষ্ট করে তোলে।—

মনে পড়ছে আমাদের বাংলাদেশের মাঠে এখন ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মরে গেছে ঘাস। ফাটাচটা মাটির টাক বেরিয়ে পড়েছে এখানে ওখানে, যাও বা আছে, রোদে জ্বলে তামাটে হয়েছে তার রং। হাড়বেরকরা রোগা রোগা গরুগুলো ধুঁকতে ধুঁকতে চাট্‌ছে ধূলো সমেত ঘাসের গোড়া।—কোথাও খুঁজছে গাছের ছায়ার আশ্রয়।—আর মাঝে মাঝে বিশাল সজল অবোধ বোবা চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে ভাষাহীন আবেগে।—এমন হাঁটু-সমান উঁচু কচি নরম সবুজ প্রাণের খুসী কেউ তাদের জন্যে ছড়িয়ে রেখে দেয়নি। আমাদের পোড়াদেশের দুর্দিনে শ্যামও বহুকাল হোল তাঁর গোপাল সমেত বাস বদলেছেন।—আজকের দিনে যেমন

রাখাল তেমনি গো—পাল—কঙ্কালসার চেহারা নিয়ে কোনমতে প্রাণটুকু রেখেছে বাঁচিয়ে। মানুষেরই বাঁচার পথ যেখানে সঙ্কীর্ণ বন্ধুর, গরুর কথা সেখানে ভাববে কে ?

কামরায় কেবল আমরা তিনজনে।—জুতোর বন্ধন মুক্ত করে ছড়িয়ে দিলাম পা।—আধশোয়াভাবে বসে বসে সমুদ্র পারের পৃথিবীর এই দ্বীপখণ্ডটুকুর বিস্তীর্ণ শস্পসম্ভারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম চোখ।

গরুর জন্যে নির্দিষ্ট দুর্বাক্ষেতের আসেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের খাদ্যশস্যের ক্ষেত। এরা মাংসাশী জাত। তবু পশুর সঙ্গে এদের প্রাণের মিতালী। মানুষে কুকুরে সত্যিই অন্তরের সখিত্ব।—বিশেষত গরুর যত্নের তো অন্ত নেই।—প্রতি গোয়ালাকে গরুর জন্যে জমি নির্দিষ্ট রাখতে হবে।—যার নিজের জমি নেই পরের জমি ভাড়া করে তাকে গরুর জন্যে ক্ষেত করতে হবে। গরু রাখব অথচ তার চরবার যায়গাটুকু রাখব না—তাকে খড়ের জাবনা খেতে দিয়ে একটা অন্ধকার খুপরীর মধ্যে বন্ধ করে রাখব।—এ চলবে না।

অবশ্য গরুর এই যত্ন আদর মানুষেরই জন্যে। কারণ গরুর উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করে মানবের স্বাস্থ্যসম্পদ। আর শুধু গরু কেন, গৃহপালিত সব পশুদের যত্নই মানুষের প্রয়োজন মিটাতে নিঃসন্দেহ।—জীবে দয়ার জন্যে ওদের জীবে দয়া নয়—মানুষের জন্যেই জীবে দয়া।—প্রকৃতি, পশু, ও মানুষের মধ্যে নিতান্ত প্রত্যক্ষ যে বেঁচে থাকার যোগ তারই টানে এদেশে, মানুষ পশুকে আদর করে বটে,—তবু করে তো।

আমাদের যে সবটাই দয়া, সবটাই ত্যাগ—তাই বোধ হয় কোনটাই আর হয়ে ওঠেনা।

এদেশে ধানের ক্ষেত নেই।—বেশীর ভাগই দেখছি সবজির। কচিৎ কখনো দেখতে পেলাম তন্বী গমের শীষ হাওয়ায় দুলছে মাথা নেড়ে। বেশীর ভাগই কফি ও মটর জাতীয় সবজির ক্ষেত,—কিম্বা

রাস্পবেরী স্ট্রবেরী জাতীয় ফলের ক্ষেত। কোথাও দেখা যায় ঘন সবুজের মাঝখানে অনেকখানি ধূসর রঙের ফাঁক—সেখানে টুপী মাথায় জুতো পায়ে চাষীরা করছে চাষ।—অবশ্য ফসলের সময়ে আমাদের দেশেও ক্ষেত থাকে ভরা।—কিন্তু এদেশের প্রত্যেকটী কোণা যেন মানুষের যত্নে গড়ে ওঠা।—যেমন করে প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রেখে মানুষ নিজের বাড়ী তৈরী করে, তেমনি করে এরা রাতদিনই নিজের দেশকে তৈরী করে চলেছে। যে জিনিষকে প্রত্যেকটী লোক প্রত্যহ এমনভাবে গড়ে তোলে,—তার প্রতি ভালোবাসাকেও কেউ রুদ্ধ করতে পারে না।

ক্রমে গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসে থামল একটা ছোট স্টেশনে। টিনের শেড দেওয়া কাঠের প্ল্যাটফর্ম,—লোকের ভীড় নেই বললেই হয়।—লম্বা করিডরটায় দাঁড়িয়ে থুকু দেখছে বাইরে।—একজন লোক ছোট একটা ব্যাগ নিয়ে ঢুকল গাড়ীতে।—মোটাসোটা চেহারা।—গলাখোলা আধময়লা সার্টের উপরে সেইরকমই একটা কোট—চামড়া দিয়ে কোটের হাত ও কলার বাঁধানো। লোকটী এসে আমাদের কামরাতেই উঠে পড়ল।—মোটা মোটা লাল হাতের আঙুলে খবরের কাগজটা তুলে ধরল মুখের কাছে।—কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম খবরের কাগজের ফাঁক দিয়ে আড়চোখের চাহনি কৌতূহল ভরে আমাদের দেখছে।—জানতে দিলাম না, লক্ষ্য করেছি। দৃষ্টি মেলে দিলাম জানলার বাইরে।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার চলে গেছে সোজা। কোথাও ট্রাক্‌টারে চলেছে চাষ।—কোথাও বা এখনো চলছে সেই পুরানো কালের প্রথা—ঘোড়া দিয়ে হাল চষা। ঘোড়াগুলো মোটাসোটা গাঁট্টাগোট্টা। কপাল ঢেকে চুল পড়েছে ঝুলে।—হাঁটুর নীচ থেকে মোটা হয়ে এসে গোড়ালীর একটু উপর থেকে লুকিয়ে পড়েছে ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে।—এ ওদের গাড়ীটানা ও হালচষা ঘোড়া।

অনেকক্ষণ হটাৎ পরে খুকুর তার 'কেন'-কে মনে পড়ে গেল, বল্লে,—হালচষা ঘোড়া ওরকম কেন ?

তরঙ্গায়িত সবুজের মধ্যে হীরের কুচির মত ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট ডেইজি। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু-একটা ফার্ম-হাউস। বাগানঘেরা ঢালুছাতের নীচু বাড়ির পাশে, কাঠের শেড দেওয়া বার্ণ। কোথাও বা একাকী দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়া। কোথাও বা টায়ার লাগানো ঘোড়ায় টানা গাড়ী। তাদের মনিব বোধহয় গেছে সহরে, ফসল বেচার ব্যবস্থা করতে।—তাই কর্মহীন দাঁড়িয়ে আছে একলা। কোথাও বাচ্চাঝাঁক নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে মা মুরগী—প্যাঁক্ প্যাঁক্ করছে হাঁস। সরু সরু খালের মত জলরেখা চলে গেছে কোন ক্ষেত বেষ্টন করে। সবুজ বন্যার মাঝে মাঝে কোথাও ভেসে ওঠে ছবির মত ছোট ছোট গ্রাম।—রাঙা টালির ছাদ—জানলা দিয়ে দেখা যায় সাদা লেসের পরদা।—প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গে ছোট বড় খানিকটা বাগান,—মেদী পাতার বেড়া দিয়ে আলাদা করা।—বাগানে খেলছে সব টুকটুকে ছেলেমেয়ে টম, ডিক, মেরী। মেয়েদের সোনালী চুলে রিবন বাঁধা। ছেলেদের ছোট পাজামা কাদা মাখা।—প্রায় সকলেই সাইকেল অথবা স্কুটার নিয়ে খেলছে। আমাদের দেশের—মণ্টে, খোকা, বুঁচি খেঁদির দল গাঁয়ে গাঁয়ে মাটীর ঢেলা নিয়ে খেলে বেড়ায় বটে, কিন্তু তাতে যে তাদের আনন্দের কিছু ঘাটতি ঘটে তা নয়।—আমার তো মনে হয় শিশুদের খেলনা যত কম দামের হয় ততই ভালো। তাহলে অন্তত শিশুকালটা ঐশ্বর্যের পেষণের চাপ থেকে বাঁচে।—কিন্তু খেলনার কথা নয়।—আমাদের দেশের কটা ছেলেমেয়ের পেটে খাবার জোটে স্বাস্থ্য টিঁকিয়ে রাখার মত ?

রেললাইনের পাশ দিয়ে সোজা চলে গেছে পীচে মোড়া রাস্তা। বাস আর মোটর ছুটে চলেছে, অবিশ্রান্ত।—মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে ছোট কাঁচের ঘরে পাব্লিক টেলিফোন।—পরিপাটী সাজানো

যেন পুতুলের দেশ।—সুন্দর সব খুঁটিনাটি জিনিষ দিয়ে আমরা যেমন ছোটবেলায় খেলাঘর সাজাতাম, এ যেন অনেকটা সেই রকম। ছোট ছোট ঢালু ছাদের বাড়ীগুলোর কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপরে ফুলদানীতে ফুল। ছোপানো এপ্রন কোমরে বেঁধে মেম পুতুল গিন্নীরা নানা কাজে বেড়াচ্ছে। বড় রিবনের বো বাঁধা রঙীন ফ্রক পরা বাচ্চামেয়েগুলো একেবারে মোমের পুতুল।—এই পুতুলের দেশের মানুষগুলো কাছে এলেই যে কি করে ছ'ফুট লম্বা হয়ে যায় এবং কি করে যে ওদের বাড়ির পুঁচকে দরজা দিয়ে ঢোকে এও আশ্চর্য।—এই কথা ভাবছি, আর খুকুর বাবা খুকুর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হতেও নির্বিকার ভাবে দেয়ালে টাঙানো ইংলণ্ডের ম্যাপ পর্যবেক্ষণ করছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা ঘোঁৎ করে আওয়াজে চমকে তাকিয়ে দেখি,—সেই ভদ্রলোকটী অপরাধের সলজ্জ-হাস্য মুখে মেখে কিছু বলতে চাইছেন।

"ব্যাপার কী ?"—

—"মাপ করবেন,—ভারতের কোন্ অংশ থেকে আসছেন জানতে পারি কি" ?—বুঝতে পারলুম।—এটা আলাপ করবার ছুতো। বল্লাম,—"কলকাতা থেকে।"—

শুনে লোকটী একটু হাসল।—"আমিও ভারতে গিয়েছিলাম। তবে, তোমার জন্মের আগে।"—"সত্যি!" একটু উৎসাহিত হবার ভান করি।—সে তার অদ্ভুত দক্ষিণী উচ্চারণে অনেক কথা বলে যায়,—১৯১৭ সালে লড়াইয়ে ফৌজের সঙ্গে সে নাকি গিয়েছিল পাঞ্জাবে।—কিন্তু ভারতের কথা এখনো পরিষ্কার মনে আছে। পাঞ্জাব থেকে সে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ। দিল্লী, আগ্রা, বেনারসও সে দেখেছে। আহা কি সুন্দর সহর বেনারস—আর কি চমৎকার পেতলের জিনিষ—লাভলি— ? নয়কী ?—আর জ্যোৎস্নালোকে আগ্রার তাজমহল ?—সে যেন স্বপ্ন—নয়কী ?—য়িইনি ?—Isn't it ?

আমরা হাসলাম।—হঠাৎ মনের মধ্যে সাংবাদিকতার প্রেরণা

এল।—হাজার হোক সাংবাদিকের কার্ড যখন এনেছি—তখন কাজটার প্রতি একটু অন্তত দরদ দেখানো উচিত।—তাহলে খোঁজ নেয়াই যাক্ না ওদের দেশের নতুন সরকার সম্বন্ধে এই নিতান্ত সাধারণ ভূতপূর্ব সৈনিকের মতামত কী?—তাই প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা নতুন গভর্ণমেন্ট সম্বন্ধে তোমার মত কী?"—শুনে সে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় শ্রমিক সরকারের জয় ঘোষণা করতে লাগল।—কেমন করে এরা দেশটার মূলগত দুর্বলতা দূর করতে চাইছে;—সুস্থ স্বাভাবিক মধ্যপন্থার দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে চাইছে মানুষের চোখে।—আমরা সমর্থন করায় সে জোর পেয়ে বল্লে,—"তোমরা তো এদের পছন্দ করবে নিশ্চয়ই;—এরা নইলে কিছুতেই এত সহজে ভারত স্বাধীনতা পেত না।—ও চার্চিলের দল কিছুতেই তাদের কৃপণ হাতের মুঠি খুলতে পারত না।—'দিচ্ছি', 'দেব' করে গড়িমসি করতে করতে আরো অন্তত দশ বছর লাগিয়ে দিত।"—সেদিন সেই নিতান্ত সাধারণ প্রায়বৃদ্ধ অর্ধশিক্ষিত লোকটীর সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল।—নূতনকে যাচাই করে নেবার আগ্রহ এবং তেজ—তার মনে ছিল ওই বয়সেও।—অথচ এর ঠিক বিপরীত ভাব দেখছি ঐ বয়সের মেয়েদের মধ্যে,—বিশেষত যাদের একটু সচ্ছল অবস্থা।—তারা একরকম জীবনে অভ্যস্ত। শ্রমিক সরকারের পরিবর্তনশীল গঠনপ্রণালী তারা কিছুতে বিশ্বাস করতে চায় না—অবজ্ঞায় ভুরু কুঁচ্‌কেই থাকে—ঠাট্টার হাসিতে হাসিতে এদের সমস্ত শুভপ্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিতে চায়।

এদিকে লম্বা করিডরটা দিয়ে অনেকে যাচ্ছে আসছে।—পাশের কামরা থেকে একটী ছোট মেয়ে মুখ বার করে বারবার খুকুর দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে আবার চলে যাচ্ছে ভিতরে।—খুকুর দশাও ওইরকমই। ভাব করার লোভ দু'পক্ষেরই সমান অথচ সঙ্কোচও কম নয়।

জংশন ষ্টেশনটা ছাড়িয়ে একটু দূর যেতেই সবুজের পট-

ভূমিকায় দূর থেকে ভেসে উঠল ছোট একটা সহরের ছবি।—কত ছোট বড় বাড়ী—গির্জের চূড়ো—কত অর্ধচন্দ্রাকৃতি সৌধ শ্রেণী। উনি বল্লেন,—"ঐ দেখ ব্রিস্টল। খালি লিভারপুল দেখে ইংলণ্ডের সহরের ধারণা ক'রো না।" এ সহরটার প্রতি ওঁর প্রাণের টান আছে। বছর দশেক আগে এখানে উনি কাজ করতেন।—থাকতেন Y. M. C. A হোস্টেলে।—বন্ধু জুটেছিল দেদার। তাদের মধ্যে অনেকেই ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এখানে ওখানে সেখানে। যারা আছে তাদের মধ্যে কয়েকজন ব্যাগ্র কৌতূহল নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।—লিভারপুলে নেমেই চিঠি পেয়েছি,—সব স্টেশনে আসবে। একটু প্রসাধনের চেষ্টা করে নেয়া উচিত।—হাতব্যাগ খুলে দেখি, পাউডারের থলিটাই আনতে ভুলেছি।—তাই শুধু রুমালে মুখ মুছেই প্রসন্নতার ভান করতে হোল। উনি বল্লেন,—"পাউডারের দরকার কী।—যারা আসছে সবাই বন্ধু।—বান্ধবী নেই এদলে, কাজেই প্রতিযোগিতার ভয় মন থেকে দূর করে সাহসিনীর মত এসে জানলার ধারে দাঁড়াও আমার পাশে।"

ব্রিস্টল সহরের একটা মজা এই যে নদীটা সহরের ঠিক মাঝখানে যেন ঢুকে পড়েছে কেমন করে।—সহরের কেন্দ্রে—যাকে বলে এরা centre,—যেখানে চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে জনস্রোত—বড় বড় বাসে লাফিয়ে উঠছে যাত্রীরা, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিউ করে, সেইখানে হঠাৎ পাশেই মুখ ফিরিয়ে দেখা গেল—তিনরঙা জাহাজের মাস্তুলে নিশান উড়ছে পত পত করে।—রঙিন কাগজের মালায় সাজানো নৌকা আছে বাঁধা। নদীর সঙ্গে এত মাখামাখি সহরের ঠিক মাঝখানে, দেখে, হঠাৎ মনে হয় যেন মস্ত একটা কৌতুক।

এ সহরটা ইংলণ্ডের একটা পুরোনো সহর; অবশ্য ইংলণ্ডের পক্ষে যতটা পুরোনো হওয়া সম্ভব।—একটা গাইড বই যোগাড়

করেছি ;—তাতে বলছে, রোমানদের আমলে, সহর হিসেবে এর নাম ছিল না। তবে হয়ত তখনো, এইখানে এই 'এভন' নদীর তীরে তাঁবু পড়ত সারি সারি। 'বাথ' সহরে স্নানে যাবার পথে, এইখানে হয়ত হোত বিশ্রামের আয়োজন।—তাঁবুর আশে পাশে ঘুরে বেড়াত আদি ব্রিটনের দল—তাদের সমুদ্রের মত নীল চোখ আর তামার মত লাল জটাপড়া চুল। তাদের গায়ে ভালুকের চামড়া। মাথায় লোমের টুপী। হাতে বর্শা। তাদের মাটির ঘরের ক্ষুদে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসত ছেলেমেয়েরা—উঁকি দিত আড়াল থেকে।

রোমান সেনাপতির তাঁবুর সামনে কুচকাওয়াজ করত রোমান সৈনিকেরা। তাদের কঠিন বক্ষ লৌহজালিকে আবদ্ধ।—মাথায় শিরস্ত্রাণ। গাঁয়ের কর্তা মোটা পশমের শাল গায়ে, রোমান চটি পায়ে প'রে দাড়ি গোঁফ সুবিন্যস্ত করে সেনাপতির দরবারে কুর্ণিশ জানাত বারবার,—ভেট দিত শূকর-মাংস আর ঘরে তৈরী বীয়ার মদ।

ক্রমে সে যুগের পালা শেষ হোল। রোমানরা ফিরে গেল হঠাৎ একদিন যেমন করে এসেছিল তারা।—সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতের লোক এসে এই ছোট দ্বীপটীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের ঢেউএর মত।—রোমান শাসিত চারশ বছর সুখে কেটেছিল দেশবাসীর।—সভ্যতার ছোঁয়ায় আরামে অভ্যস্ত হয়েছিল তারা।—স্যাক্সন্ আক্রমণের ঝড়ে তারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।—যন্ত্রণায় গুমরে উঠে তারা আর্তনাদ করলে, বললে,—"ফিরে এস প্রভু—রক্ষা কর আমাদের।—শত্রু আমাদের সমুদ্রে ঠেলে দিচ্ছে,—সমুদ্র ফের ফিরিয়ে দিচ্ছে শত্রুর হাতে।"—কিন্তু রোম তখন আপন ঘর সামলাতে ব্যস্ত।—তার মনিদীপ্ত হর্মতলে তখন উত্তর জার্মানি থেকে হানা দিচ্ছে বর্বর হুণ দস্যুর দল।—দূর সমুদ্রপারের ছোট দ্বীপ ব্রিটানিয়ার জন্যে তারা কিছুই করতে পারল না।

দেশ গেল স্যাক্সনদের হাতে—যারা জানত শুধু লড়াই আর লড়াই। দেখতে দেখতে সভ্যতার ছদ্মবেশ খুলে গেল, ব্রিটনরা আবার ফিরে গেল বন্যজীবনে।—রোমান প্রাচীরে সৈন্যরা আর মার্চ করে না। ধীরে ধীরে অযত্নে, তারা ভেঙে পড়তে লাগল।—স্নানাগারগুলি আস্তে আস্তে চাপা পড়ল মাটির তলায়। শীতের দেশে স্নান করবে কে? রোমানরা স্নান করত পূবদেশের বিলাস অভ্যাসের ধারা বজায় রাখতে।—কী সে সব স্নানাগার! যেমন বিরাট তেমনি বিচিত্র, তেমনি সুখকর। কিন্তু স্যাকসনদের সময়ে তারা বিস্মৃত হয়ে গেল। তাদের স্মৃতি মুছে গেল মানুষের মন থেকে। বলতে কী স্যাকসনদের সময়ে এদেশের ইতিহাস যেন মুখে ঘোমটা টেনে দিল। সেই ইতিহাসের আবার প্রথম শুভদৃষ্টিপাত হোল একাদশ শতক খৃষ্টাব্দে। সারা ইংল্যাণ্ড জুড়ে নর্ম্যান দিগবিজয়ের ইতিহাস নতুন দেশের নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে লাগল। আবার আমাকে গাইড বুকের শরণ নিতে হোল—সেই সময়ে অর্থাৎ ১০৫০ খৃষ্টাব্দে, প্রথম সহর হিসেবে ব্রিস্টলের নাম পাওয়া যায়।

তারপরে কেমন করে ধীরে ধীরে কত মানুষের রঙীন ভবিষ্যৎ এই সহরটাকে তার বর্তমান রূপে পরিণত করে তুলেছে তার কাহিনী আলোচনায় আমি রস পাব না।—আমি শুধু তাকিয়ে দেখছি এই আধুনিক সহরটাকে।—পরিচ্ছন্ন পরিপাটি সুন্দর। ইংলণ্ডের কর্মব্যস্ত সহরগুলিতে সাধারণত একটু ঘিঞ্জী ভাব থাকে, আর উত্তর দিকের কারখানা-সহরগুলির তো কথাই নেই।—ধোঁয়ায় আর কয়লার গুঁড়োয়—উঁচু নীচু বেঢপ শ্বাসরোধকরা বাড়ীতে আর কারখানায় রীতিমতো কুৎসিত তারা।

কিন্তু ব্রিস্টল সহরকে এক কথায় বলা চলে মনোরম।—গাঁয়ের সঙ্গে নগরের, সৌন্দর্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের, রুচির সঙ্গে যন্ত্রের মিল হয়েছে এখানে।—বিজ্ঞানের খুব ভালোরকম একটা কারিগরী

হোল এখানকার সাস্‌পেনসন্‌ ব্রিজ।—utilityর ভারে beauty এখানে দম বন্ধ হয়ে মরে যায় নি। ছু'য়ে মিলিয়ে একটা নতুন ছন্দ আবিষ্কার করেছে।—অনেকটা সংস্কৃত চম্পু কাব্যের মতো, যার এক লাইন গদ্য আর এক লাইন পদ্য।—আর ছু' লাইনে মিলিয়ে একটী অখণ্ড কাব্য—অন্ন ও ছন্দের—প্রয়োজন ও সুষমার।—

দুই পাহাড়ের মাঝখানে গভীর খাদের ভিতর দিয়ে 'এভন' যাচ্ছে বয়ে।—তার উপরে আধ মাইল লম্বা টক্‌টকে একটী লাল পথ শূন্যে ঝুলে রয়েছে। কোনরকম জবড়জঙ্গ কারিগরী নেই। সোজা একটী ঈষৎ ঝোলানো পথ।—এপাশে নরম কোমল ঘাসের বিছানায় সাদা ডেজির বিচিত্র নক্সা।—মাঝে মাঝে বেগুনী ও গোলাপী 'মে' ফুলের গাছ স্তবকে স্তবকে ভরা।—তার পাশ দিয়ে পাথরে বাঁধা একটা পায়ে চলা পথ ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে ব্রিস্টলের সব চেয়ে উঁচু চূড়ায়। নীচে নদী। আর দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঝোলানো ব্রিজটা যেন ছোট্ট একটা রক্তবন্ধনী। চারপাশে ছেলেমেয়েরা খেলে বেড়াচ্ছে কলরব করে।—পিক্‌নিকে এসেছে দলে দলে জোড়ায় জোড়ায় নরনারী কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। মাঝখানে আরো একটু উঁচুতে ছোট্ট একটা ঘর।—সেখানে আছে একটা ধাঁধাঁ লাগানো ক্যামেরা। অন্ধকার ঘরে একটা বোর্ডের উপরে ফোকাস করে আলো পড়েছে সিনেমার মত।—সে আলো এমনি কায়দায় ফেলা যে, পাহাড়টা ও তার নীচের রাস্তা তো বটেই—তাছাড়াও বহুদূর পর্যন্ত সহরটার প্রতিচ্ছবি পড়ছে তার উপরে। ঐ তো রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটছে।—ব্যস্তভাবে লোকজন যাচ্ছে আসছে।—পাহাড়ের গায়ের বেঞ্চিতে ঐ তো কারা এসে বসল।—ওখানে একটী ছেলে দাঁড়িয়ে দূরবীণ কষছে দূরের দিকে।—আর ঐ তো ওধারে ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ ক্যামেরার চোখের সামনে ভেসে উঠল,—যুগলের গোপন প্রণয়লীলা—চুম্বন আকুল।—ছি ছি, কি অন্যায়! এরকম ক্যামেরাগুলো—কী ভীষণ বিশ্বাসঘাতক।—

দর্শকরা হাসির সঙ্গে মন্তব্য করলে।—কিন্তু ব্যাপারটা চাখ্‌তেও কারু মন্দ লাগল বলে মনে হোল না।

মনেই হচ্ছে না যে, দেশটা বিলেত।—এই মুহূর্তে এই যায়গাকে পৃথিবীর যে কোন যায়গা বলে মনে করা যেতে পারত।—জিওগ্রাফীর গণ্ডী ইতিহাসের ধারাকে বিভিন্ন সীমায় বিভিন্ন করে গড়ে তুললেও,—যে মানুষ খায় দায়, আপিসে কারখানায় যায়, কাজকর্ম করে বেঁচে থাকে, সে মানুষ সব দেশে সবকালে এক। আমাদের দেশেও দুপুরবেলা রাস্তার ধারের ছোট একটী বাড়ী এই রকমই। সেখানেও নির্জন মধ্যাহ্নে বুড়ী টিয়া চেঁচিয়ে উঠে শেখা বুলি বলে,—রাস্তায় দেখা যায় ক্বচিৎ দু' একটী লোক।—শুধু ফেরীওয়ালার ডাকে জনশূন্য মধ্যাহ্ন আরো ঘন রহস্যময় হয়ে ওঠে।

শহরটা আমার ভালো লেগে গেল।—এক দিকে প্রায় আধখানা শহর জুড়ে মাঠ। তাকে এরা বলে ডাউনস্‌। এই ডাউন্‌সের কাছাকাছি একটা বাড়ীর গবাক্ষে বসে লিখছি। সামনে ছোট্ট একটু ফুলের পাড় দেওয়া ঘাসে ঢাকা জমি, পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা,—তাতে সব্জী ফলানো হয়েছে। বাড়ীতে আছে কর্তা, গিন্নী, একটি ভারতীয় বোর্ডার এবং বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য একটি ঝি। এদের সকলেরই আবার একটি করে পোষ্য আছে।—কর্তার একটা প্রকাণ্ড সাদা বুলটেরিয়ার, গিন্নীর একটা বুড়ী টিয়া 'পোলি', ভারতীয়ের একটি ঘনরোমা কুক্কুরী; দাসীর একটি ছোট ছেলে, নাম মাইকেল। ভারতীয়টির নাম দেওয়া যাক টমি।—এই ধরণেরই একটা নাম তাঁর আছে। ইংরেজ গৃহকর্ত্রীর দেয়া আদুরে নাম। টমি সাহেব শিশুকাল থেকে এদেশে আছেন। পঁচিশ বছর ধরে ইংলণ্ডের জলবায়ুর প্রভাব এঁকে মনে প্রাণে ইংরেজ করে তুলেছে। ইনি যে শুধু অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে ইংরেজ, তা নয়।—এঁর ভাবনা কল্পনা অনুভূতিও ইংরেজী।—অর্থাৎ ইংরেজরা যাকে

বলে, a typical Englishman, ইনি তাই। ইংরেজের মতই ইনি ইংরেজের সুখে সুখী, দুঃখে দুখী এবং ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত গোঁড়া রক্ষণশীল।

এখন বেলা পড়ে এসেছে। উনি গেছেন ছবি ডেভেলাপ্ করতে দিতে।—গিন্নী দিবানিদ্রায় মগ্ন, কর্তা গেছেন কাজে, যদিও বয়েস সত্তর। খুকুকে নিয়ে এলিস্ গেছে বেড়াতে। সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ নিঝুম। শুধু পোলি কোথাও এতটুকু আওয়াজ পেলেই কর্কশ স্বরে 'হ্যালো' 'হ্যালো' বলে চেঁচাচ্ছে। জানলা দিয়ে দেখা যায়, সামনের সারির এক মাপের এক ধাঁচের বাড়ীগুলো। কালো চওড়া রাস্তা বাঁদিক দিয়ে উঠে ডান দিকে নেমে আসা রাস্তাকে অতিক্রম করে পিছন দিকে চলে গেছে। তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে পরিপাটি চারদিক, ক্বচিৎ চলেছে দুটি-একটি মেয়ে। দুপুরবেলা যে যার কাজে ব্যস্ত।

কল কল করতে করতে এলিসের সঙ্গে খুকু ঘরে এসে ঢোকে। এলিস্ বাড়ীর দাসী। সপ্তাহে আড়াই পাউণ্ড তার মাইনে। তার ও তার ছেলের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই। তিন তলার উপরে চমৎকার একটি ঘরে এলিস থাকে। গদিওয়ালা খাট, ধবধবে চাদর পাতা বিছানা, ড্রেসিং টেবিল, দেরাজ আলমারী, কার্পেট, ফুলসমেত ফুলদানী দিয়ে গৃহিণী ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন দাসী এসে সে ঘরে অধিষ্ঠিত হবার আগেই। এলিসের বয়স তিরিশ। হাসিখুশী চেহারা—মাথার চুলগুলি ফাঁপিয়ে ওপরে তোলা, ঠোঁট দুটি সব সময়ে টুক টুক করছে। এরা দাসদাসীকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না। শ্রীমতী পার্কারও দুপুর বেলা দাসীর সঙ্গে খেতে বসেন। স্নানের ঘরে এলিসের জন্য নিজের হাতে টবে জল ধরে রাখেন।

খুট করে আওয়াজ হ'ল—শ্রীমতী পার্কার ফ্রিল দেওয়া এপ্রন বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছেন—"এলিস, এবারে আমাদের ডিনারের জন্যে তৈরি হতে হবে।" এলিস ঘড়ি দেখে বললে, "ওমা, তাই ত, সাড়ে

পাঁচটা বাজে যে!” “এলিস বুঝি সারা দুপুর বক্ বক্ করে তোমাকে বিরক্ত করেছে”,—শ্রীমতী অনুতপ্ত সুরে বলেন। “ওমা সেকি”, এলিস সজোরে প্রতিবাদ করে, “আমি তো খুকুকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নয় কি—বল না শ্রীমতী গুপ্ত?” আমি বলিলাম, “নিশ্চয়ই, এই তো এলিস ফিরল।”

যাই হোক, শ্রীমতী পার্কার তাড়া লাগালেন—খাবার দেরি হয়ে যাবে। শ্রীযুত টমি ততক্ষণে এসে গেছেন;—তিনি ঘড়ি দেখে বললেন—“সত্যিই তো, ছ’টা বেজে গেল।”

এদেশের জলহাওয়ার প্রভাবে আমাদের পাকস্থলীর গ্রহণক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে। আরো দু’জন ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সকলেই ওঁর পূর্বতন বন্ধু। খাবার টেবিলে গল্প জমে উঠল। বাড়ীর গৃহিণী সুযোগ পেলেই শুনিয়ে দিচ্ছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত অভিজাত ব্যক্তির নাতনী এবং চার্চিলের অন্ধ ভক্ত। যাই-হোক শ্রমিক সরকারের গুণকীর্তন দিয়ে আমাদের ভোজের টেবিলের আলাপের উদ্বোধন হয়। আমিও আলোচনায় যোগ দিই। বলি, শ্রমিক-সরকার অত্যন্ত অবিবেচক—তা না হলে এতগুলো অকৃত-দারকে জেলের বাইরে রাখে। শ্রীমতী গৃহকর্ত্রী আমাকে সমর্থন করেন—নিশ্চয়, বিশেষত যখন ওদেশে মেয়ের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে তখন বিয়ে না করাটা ছেলেদের পক্ষে একটা মারাত্মক অপরাধ। এতগুলি কুমার বন্ধুর সামনে হংসো মধ্যে বকো যথা সস্ত্রীক সকন্যা শ্রী গুপ্ত হয়ত একটু সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, আমার সমর্থনে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। “কিন্তু খুকু কেন ঠিকমত খাচ্ছে না”, একজন উৎকণ্ঠিত হলেন। নিন্দে করা ঠিক নয়, খাবার আয়োজন যথেষ্ট। অবশ্য নুন খেলে তবেই গুণ গাইতে হয়। কিন্তু এদের রান্নায় নুন নেই। টেবিলে আছে নুনের পাত্র, ইচ্ছামত নাও। অনেকে হয় ত আলুনি খেয়েই উঠে যায়। তা নুন যখন খাই নি, তখন দোষ কীর্তন করতে আপত্তি কি? যুদ্ধোত্তর বিলেতের

আহারের একটু বর্ণনা দেবার লোভ সামলানো মুস্কিল। সাড়ে পাঁচটায় এই আহারকে এরা সাধারণত বলে 'সাপার'—ডিনার বলতে বোধ হয় লজ্জা পায়। প্রত্যেকে দেড় টুকরো করে পেতে পারে এই পরিমাণ রুটি রাখা আছে পাত্রে। কিন্তু কেউ এক টুকরোর বেশী নিচ্ছে না।

সুদৃশ্য কাঠের ট্রেতে এলিস খাবার বহন করে নিয়ে এল। অতিথিদের জন্যে বিশেষ করে বার করা হয়েছে সযত্নে রক্ষিত বহুকাল আগেকার কেনা সুন্দর আল্পনা-আঁকা চীনা বাসন। সেই দর্শনীয় ঈষতুষ্ণ পাত্রগুলিতে আছে প্রকাণ্ড এক এক খণ্ড ধূমপক্ক হ্যাডক মাছ। ছোট্ট এক টুকরো করে লেবু, কিছু আলু ও বরবটী সিদ্ধ। প্রত্যেকটা জিনিষ থেকে ধোঁয়া উঠছে এত গরম। ধূমগন্ধী সামুদ্রিক মৎস্যের একটু ছোট অংশ কাঁটায় ঠেকিয়ে মুখে দিলাম। ওঃ, এত লোকের সামনে বসে আছি, ভাগ্যিস অভদ্র কাণ্ড কিছু হয় নি। মুখ তুলে দেখি সবাই আহারে মন দিয়েছে এবং এত বড় মাছ সংগ্রহ করা যে আজকাল কত কঠিন সেই বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম—কি দরকার ছিল, এত বড় মাছ সংগ্রহ করবার। যদি ছোট্ট হ'ত কোনমতে পার করে দেওয়া যেত। কিন্তু ভিতরের সব কিছুই যে বেরিয়ে আসতে চায়! এখন তো আর ফেলে দেওয়া চলবে না। খাদ্য-দ্রব্যের সামান্য অংশটুকুও এরা নষ্ট করে না। তাকিয়ে দেখি গুপ্ত মহাশয়ের চোখে দুষ্ট হাসি—তিনি আমার অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন। মুহূর্তে আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি এল—"তুমি এই মাছ খেতে কি ভালই বাস," আমি সোৎসাহে বলে উঠলাম, "আমারটা থেকে কিছু নাও"—বলতে বলতে মাছটির তিন চতুর্থাংশ কেটে ফেললাম। তখন সবাই মিলে আমার এ পক্ষপাতিত্বে কলরব করে উঠল। তখন স্বামীর প্রতি করুণাবশে আমি বললাম—"আচ্ছা বেশ তোমরা সবাই এর থেকে

একটু একটু পেতে পার। জান তো ভারতীয় মেয়েরা স্বার্থত্যাগের জন্যে বিখ্যাত।”

আহারের পরে বসবার ঘরে সবাই এসে জড়ো হয়। খুকুকে গা ধুইয়ে গরম বিছানার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আসি। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণের তাগিদে স্তিমিত আলোয় স্বল্পালোকিত ঘর। রেডিওর মৃদু সুরের ব্যাকগ্রাউণ্ডে অনুচ্চকণ্ঠে চলে আলাপ-আলোচনা। ভারতের কথাই সকলের জিজ্ঞাস্য এবং বক্তব্যও বটে। সবাই ভারতের বিষয়ে কিছু না কিছু বলতে চায়, জানিয়ে দিতে চায় যে তারা সে বিষয়ে অনেক জানে, কিন্তু না জানাই প্রকট হয়ে ওঠে প্রতি কথায়। আমি ঘরে ঢুকতেই সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। একজন উঠে এসে জ্বালিয়ে দিল বড় আলোটা। ‘টমি’ তাড়াতাড়ি উষ্ণীকরণ যন্ত্রটাকে বোতাম টিপে জ্বালিয়ে দিয়ে পায়ের কাছে এনে রাখলেন। মেয়েদের প্রতি সৌজন্যের আতিশয্য এক এক সময়ে বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তবু সত্যি কথা বলতে কি, বাড়াবাড়িটা লাগে মন্দ নয়, বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশ থেকে আসে যারা, নূতনত্বের স্বাদ তাদের ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু আজকের এই সমানাধিকারের যুগে সে কথা স্বীকার করতে হয়ত সঙ্কোচ করবে মেয়েরা; হয়ত বলবে এই সব ছদ্ম সৌজন্যের বাড়াবাড়ি দিয়েই পুরুষ চিরকাল ভুলিয়ে রেখেছে মেয়েকে।—আজকের দিনে ওসব ফাঁকা শিভ্যল্‌রির কোন মূল্য নেই। আজ তো আর নারী দুর্বল নয় যে, সবল পুরুষের সৌজন্যের দাক্ষিণ্য তাকে গ্রহণ করতে হবে। আজ তো সবলা জয় করে নিয়েছে নিজের ভাগ্য,—করে নিয়েছে সর্বত্র আপন স্থান—পুরুষের পাশে।—বাস্‌-কণ্ডাকটারি থেকে পুলিসী পর্যন্ত তার হাতের মুঠোয়।—ওদিকে ট্র্যাক্‌টার চালিয়ে ক্ষেতচষা হচ্ছে সমানে সমান পাশাপাশি।—কাজেই অন্তত, কর্মক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষের সাম্যবাদ স্বীকার করতেই হবে।—কিন্তু নিজেদের কাছে তাদের পরস্পরের মূল্য কী?—ব্যক্তিগত ভাবে

নয়, সাধারণ ভাবে, তাদের ব্যবহার কোন পর্দায় উঠবে আর কোন পর্দায় নামবে—তার কোন সীমা নির্দেশ করা চলবে কী? কর্মক্ষেত্রে উভয়ে সমান বটে। কিন্তু সে ক্ষেত্রের বাইরে যে আর একটা জীবন আছে যেখানে প্রত্যেক স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের কাছে কর্ম ও অর্থের অতিরিক্ত এমন কিছু প্রত্যাশা করে যার দ্বারা সমাজ সুস্থ ও সুন্দর হয়ে ওঠে, সেই জিনিষটার মান নির্দিষ্ট হবে কেমন করে?

আশ্চর্য্য এই যে পূর্ব ও পশ্চিমের সমাজপদ্ধতি এই বিষয়ে দুই বিপরীত ভাবকে গ্রহণ করেছিল।—পূবের দিকে,—নম্র হবার ও সেবা করার সমস্ত দায়িত্ব মেয়েদের, এবং রূঢ় হবার, হুমকি দেবার ও সেবাগ্রহণের দুরূহ কর্তব্যভার পুরুষের। ফলে আমাদের দেশে মেয়েদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা আজো কেউ তেমন করে ভাবতে অভ্যস্ত নয়।—সকলের খাওয়া শেষে তাদের জন্যে যাহোক কিছু জুটিয়ে নেয়া। সকলের সুখসুবিধার শেষে তাদের জন্যে যেমন তেমন কোন ব্যবস্থা।

পশ্চিমে আবার সম্পূর্ণ উল্টো কায়দা। খাবারের থালা যাবে গিন্নীর কাছেই সবপ্রথমে। মেয়েদের জন্যে হরেকরকম পোষাক,—তুলনায় ছেলেদের অনেক কম।—অবশ্য আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজ এই দুইএর সামঞ্জস্য করতে চেয়েছে আর একটা নতুনতম উপায়ে। এই সমানীয় নীতিতে স্ত্রীপুরুষের পোষাকের তারতম্যটা গেছে ঘুচে।—কে পুরুষ কে নারী বোঝা শক্ত।—দু'জনেরই ঘাড়ছাঁটা চুল,—দু'জনেরই পরণে সার্ট এবং সর্টস্।—অবশ্য একটু নজর করে দেখলে তফাৎটা বোঝা যায়—মেয়েদের সর্টস্‌গুলো একটু বেশী রকম সর্ট। তবে ওরি মধ্যে একটু বৈচিত্রের আয়োজন না হয়েছে যে তা নয়—কিন্তু তবু মনে হয় সব দিকেই একটু যেন ভাঁটা পড়েছে।—শিভ্যল্‌রি দেখানোর বাড়াবাড়িতেও আকাল পড়েছে।—ট্রেনে বাসে কেউ কারুর জন্যে যায়গা ছেড়ে দিতে

অ্যাভন নদীর সেতু : ব্রিস্টল

চেডার গর্জ : ইংল্যাণ্ড

ব্রিস্টলের নগরকেন্দ্র

রাজী নয়—অবশ্য মেয়েদের জন্তে যায়গা ছেড়ে দেবার প্রশ্নই আজকাল উঠতে পারে না—কারণ সমস্ত যায়গাই তারা দখল করে বসে আছে।—এই দারুণ যুদ্ধে পুরুষ কিছু মরেছে কিছু পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে—বাকীরা এখনো সেনাদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—আর যারা আছে তারা কোন অপিসে আদালতে, খনিতে, কারখানায় দিনরাত খাটছে কে জানে।—এধারের সব সাধারণ আপিস, যথা ব্যাঙ্ক—র‍্যাশনিং, ইত্যাদি, এবং যত যানবাহন দোকান বাজার,—সর্বত্র মেয়েদের ভীড়।—বিশেষত তুপুর বেলায় এই ব্রিস্টল সহরটাই যেন একটা প্রমীলারাজ্যের মত হয়ে পড়ে।

কাল তুপুর বেলা বেরিয়েছিলাম বাসে করে। সারা পথে কত মেয়ে উঠল নামল।—খুব খুঁটিয়ে তন্ন তন্ন করে লক্ষ্য করলাম।—সমস্ত বাসটায় শুধু একটিমাত্র পুরুষ সিংহ,—এবং তিনি হচ্ছেন আমারি স্বামী।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে আবার মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ শিষ্টতা ব্যবহারের কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু আবাল্যঅভ্যস্ত সংস্কার বশে মেয়েদের প্রতি মনোযোগ দেবার ভান ওরা এখনো বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। পূবদিকে উল্টো ব্যাপার,—ছেলেরাই পায় বেশী মনোযোগ। মেয়েরা তাদের যত্ন করে করে দেশসুদ্ধ খোকাবাবু বানিয়ে তুলছে। এ তুয়ের কোনটা ভালো ঠিক করতে না পেরে আধুনিক কাল তুটোই বর্জনের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে —কিন্তু আমি বলি, যদি তুটোই গ্রহণ করা যায় তো কেমন হয়?—মেয়ে পুরুষ কেউ কাউকে কার্টসি করবে না,—এইটে না করে উভয়েই উভয়কে বিনয় জানাবে—অর্থাৎ মেয়েরা আদর যত্ন পাবে পশ্চিমের মত আর করবে পূবের মত?—

এদের দেশে সমাজ-জীবনের ভারী একটা সংহত রূপ আছে। সমস্ত দেশটা যেন একটা বৃহৎ পরিবারের মত গড়ে উঠেছে, যার

ভাঁড়ারঘর একটাই এবং যেখানে সাধারণের মোটা ভাত কাপড়ের একই ব্যবস্থা। অবশ্য যার যেমন সাধ্য খাওয়া-পরায় বৈচিত্র আনতে পার—কিন্তু মূল ব্যবস্থাটি এমন চমৎকার যে, মোটা ভাত-কাপড় থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, কেউ বেশী পাবে না। যদি কারুর বিশেষ প্রয়োজন হয় সে তাই পাবে সংসারের সাধারণ খরচের খাতা থেকেই। যেমন প্রত্যেক শিশু ও বালকবালিকা হু' বোতল করে খাঁটি ছুধ পাবে। পাঁচ বছরের নীচে পর্যন্ত ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল শিশুই রেশনকার্ডের ব্যবস্থামত খাঁটি কমলালেবুর ঘন নির্যাস সপ্তাহে এক বোতল করে পাবে। যদি কেউ অসুস্থ হয়, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে সেও পাবে, আর পাবে গর্ভিণী ও প্রসূতিরা। রেশন-ব্যবস্থায় এই নির্যাসের দাম ছয় পেনি মাত্র—অথচ সেই জিনিষ বড়লোকেরা সখ করে যদি খেতে চায় ত সমপরিমাণ নির্যাসের দাম পড়বে ছয় শিলিং। আগে সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজন মিটিয়ে তবে দোকানে জিনিষ যায়। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের কার্ডে ছুধের আলাদা ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা-মত রোজ সকালে বাড়ীর দরজায় খাঁটি ছুধের মুখ বন্ধ করা বোতল থাকে—সূর্যোদয়ের আগেই ডেয়ারী ফার্ম থেকে লোক এসে ছুধ দিয়ে যায়। পাঁচ বছর বয়স হলেই প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। তখন আর তার ছুধ তার মায়ের কাছে আসে না, যায় তার স্কুলে। প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক বালকবালিকার নামে হু' বোতল ছুধ দেওয়া হয়। বাড়ীতে দিলে যদি-বা বাচ্চাদের উপযুক্ত পরিমাণ ছুগ্ধ পান থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু স্কুলে তেমনটি হবার জো নেই, কারণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে। বাচ্চাদের বেলায় যেমন প্রচুর ছুগ্ধ বিতরণের ব্যবস্থা, বয়স্কদের বেলায় তেমনি কার্পণ্য, কাজেই পুডিং ইত্যাদিতে বেশী খরচ করা চলে না।

বসবার ঘরের আড্ডার, কিন্তু, কেবল, সেই একটাই বিষয়।

"ভারতবর্ষের কথা বল। কি তোমাদের ব্যাপার? এত মারামারিই বা কেন?" "কি আর বলব সেকথা?—ভারতের কথা কি এত চট্ করে বলা যায়। কি দরকার সে সব অপ্রিয় কথা তোলবার? বিশেষ করে এখানে দেখছি সবাই টোরীদলীয়। ভারতের দুঃখের কথা বলতে গেলে এত সাধের জমাট আড্ডাটি ভেঙে যাবে। বলতে বলতে আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ব, এবং তোমরা দুঃখিত হবে।" শ্রীযুত ডেভিস্ বললেন, "তোমার কি মনে হয় স্বাধীনতা পাওয়া ভারতের পক্ষে এখনি ভাল হবে?" "সে আবার কি", গুপ্ত মশায় অবাক হয়ে বলেন, "ভাল হোক, মন্দ হোক, স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার, তা যারা শুধু গায়ের জোরে কেড়ে নিয়েছে, অপরাধ তো তাদেরই।"

আশ্চর্য এই যে, এত দিনেও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের মনে একটা সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হ'ল না। আমাদের দেশ সম্বন্ধে ভাসা ভাসা ঝাপসা একটা ছবি আঁকা আছে এদের মনের পটে, সেই সঙ্গে আছে একটা প্রবল অহমিকা। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে ভারতকে আধুনিক সভ্যতার তীর্থক্ষেত্রে পথ দেখিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল এদেরই,—তাই কথাবার্তায় এদের প্রায় সর্বদাই থাকে একটা মুরুব্বিয়ানার সুর।

'টমি' সাহেব জাতিতে ভারতীয়, কিন্তু মনে প্রাণে ইংলণ্ডের অনুরাগী ও ইংরেজের অনুকারী। ভারত তাঁর জন্মভূমি বটে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড তাঁর মনোভূমি। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি তাঁর কেটেছে এইখানে। ভারতের কথা তাঁর মনে বিশেষ কোন বিরহস্মৃতি জাগায় বলে মনে হয় না। ভারত যেন তাঁর নেহাৎই সেকেলে 'মা' আর ইংলণ্ড তাঁর প্রিয়া। দুখিনী জননীকে ছেড়ে নবীনা প্রেয়সীকে নিয়ে তিনি সুখেই আছেন।—অথচ কোন সত্যিকারের প্রেয়সী এখনো জোটাতে পারেন নি। তিনি ঘাড় নেড়ে সর্বজ্ঞের ভঙ্গীতে বললেন, "এখন কি হয়েছে জানি না, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে ভারতের

অন্তত সে যোগ্যতা ছিল না।” স্তম্ভিত হয়ে গেলাম,—“তুমি কি ভারতীয়?” উনি বুঝতে পারলেন আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। তাই ব্যাপারটাকে হাসিঠাট্টায় তরল করে আনবার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত ‘টমি’কে লক্ষ্য করে বললেন, “সে ত বটেই, তখন যে তুমি ভারতে ছিলে। তোমার মত লোক থাকতে ভারত স্বাধীন হবে কি করে?” ধোঁয়া জমে উঠবার আগেই হাসির হাওয়ায় উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে ‘পীটার’ এসে বসেছেন। তিনি শ্রমিকসঙ্ঘের সভ্য—এ সভায় অনাহূত—এসেছেন দশ বছর পরে পুরনো বন্ধুকে দেখতে।

তিনি এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবারে গম্ভীরভাবে বললেন, “এ বিষয়ে আমি শ্রীমতী গুপ্তর সঙ্গে একমত। ভারতবর্ষ নিজেই তার যোগ্যতার বিচার করবে। যদি সে অযোগ্যও হয়, তা হলেও অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কোন অধিকার নেই তাকে দাবিয়ে রাখবার।” ‘পীটারের’ কথা শুনে ‘গুপ্ত’ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন, শ্রীমতী ‘গুপ্ত’ ঠাণ্ডা হন, ‘টমি’ হয়ত একটু বিরক্ত হন, ‘এরিখ’ মুখ টিপে হাসেন, ‘ডেভিস’ কিছু বলতে যান,—কিন্তু এমন সময় এলিস এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে—শ্রীমতী পার্কার জিজ্ঞেস করছেন, “তোমরা কি এক কাপ করে চা খাবে?” “গুপ্তরা আমাদের জন্যে চমৎকার চা এনেছে—দার্জিলিঙের চা।” ডেভিস বললেন, “সত্যি আমরা অকৃতজ্ঞ—এমন লোভনীয় জিনিষ ভারত আমাদের উপহার দেয়, তবু আমরা তার নিন্দে করি।”

পীটার বাড়ী যাবে তার বাবার কাছে। আমাদেরও সঙ্গে যেতে হবে। তার বাবা বহুবার টেলিফোন করে সব ঠিকঠাক করেছেন।

শনিবার যথাসময়ে পীটারের বাবা এলেন গাড়ী নিয়ে, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। টাকের ওপরে দু’এক গাছা সাদা পাতলা চুল। এত

বয়স হলে কি হয় সাজসজ্জার ত্রুটি নেই, নিভাঁজ নেভী-ব্লু স্যুট—বাটনহোলে একটা প্রকাণ্ড টকটকে লাল গোলাপ, লাল মুখের সঙ্গে ম্যাচ করেছে ভাল। নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন পঁচিশ মাইল দূরের 'চেডার' গ্রাম থেকে। চেডারের 'চীজ' বিখ্যাত। চেডার পেরিয়ে ছোট একটি গ্রামে তাঁর বাস। সেখানে আমাদের অন্তত একটা সপ্তাহ কাটিয়ে আসতেই হবে তাঁর নতুন গৃহস্থালিতে,—দেখতে হবে ইংলণ্ডের পল্লীর রূপ। 'পীটারের' মা বাবার গল্প 'ওঁ'র কাছে আগে এত শুনেছি যে তাঁকে দেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। তাঁরা দুজনেই নাকি 'শ্রীগুপ্ত'-কে একেবারে নিজের ছেলের মত দেখতেন।—প্রতি শনিবার চেডারে নিমন্ত্রণ থাকত, পীটারের সঙ্গে একসঙ্গে। স্বামী স্ত্রী নাকি পরস্পরের প্রেমে একেবারে যুক্তাত্মা হয়ে থাকতেন। অথচ সেই ভদ্রলোক বিপত্নীক হবার পর, বছর না ঘুরতেই পুনরায় নবপত্নী সংগ্রহ করেছেন। ব্যাপারটা শুনতে খুবই আশ্চর্য,—কিন্তু এধরণের বিয়ে এদেশে নাকি আজকাল খুব চলছে। বুড়ো বয়সে ছেলেমেয়েরা কাছে থাকে না,—নিঃসঙ্গ জীবনের ভার বইতে না পেরে তারা সঙ্গী বেছে নিয়ে নতুন ঘরকন্না সুরু করে। বলে—এ না কি Companionship marriage সাহচর্য বিবাহ। যাই হোক এই নবপরিণীতা অবশ্য বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা নন। কারণ তাঁরও বয়েস ভাঁটার দিকে। বরের বয়স পঁচাত্তর এবং কনে হচ্ছেন বাহাত্তুরে বুড়ী। ব্যাপারটা আমাদের ধারণার অতীত—কিন্তু এই নবদম্পতি বিবাহিত জীবনকে বেশ সহজভাবেই নিয়েছেন। বাহাত্তর বছরের নব বধুকে দেখবার জন্যে মনে ঔৎসুক্য জমা হয়ে ছিল। বৃদ্ধ তাঁর নতুন কনের অনেক গল্প করলেন—সে নাকি দেখতে আমারই মত ছোটখাটো। ছোটবেলায় নাকি তাঁদের একবার বিয়ের কথা হয়ে ভেঙে যায়। তার পরে কে ভাবতে পেরেছিল ভবিষ্যতের এ বিচিত্র পরিণতির কথা।

ব্রিষ্টল থেকে চেডার কুড়ি মাইল পথ। দু'ধারে ঘনসবুজের

ঢালু উঁচুনীচু প্রান্তর—মাঝে মাঝে সারিদিয়ে পত্র-বাহার মেলেছে গাছ। পীচেমোড়া কালো রাস্তা এঁকেবেঁকে গেছে চলে। পথে পড়ে একটা চূণের কারখানা। পাহাড়ের রং সাদা খড়ির মত—পাশ দিয়ে খাদ নেমে মিলেছে নীচু জমিতে। বৃদ্ধ বললেন, "চেডার গর্জের কথা তোমার মনে পড়ে 'জয়'? চল ঘুরে যাই সেদিক দিয়ে।"—উনি বললেন, "এত তেল পাবে কোথায় এই র‍্যাশনের দিনে?"—"ভাবনা কি"? বৃদ্ধ বললেন, "এখনও যখন হাতে আছে কিছু সম্বল, কেন রইব কৃপণ হয়ে?"

দূর থেকে পাহাড়ের উঁচু মাথা নজরে পড়ে—সাদাটে সাদাটে চৌকো চৌকো পাহাড়ের চূড়ো, রাস্তার দু'ধারে যেন ছবির মত সাজানো। যেমন এদের এক মাপের বাড়ী, পাহাড়গুলোও কি তাই? রাস্তার দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, যেন ছাতখোলা একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলেছি। ভারি চমৎকার লাগছে! মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা দুটো গাড়ী—পাথরের উপর কম্বল বিছিয়ে চলছে পিক্‌নিক্। পাহাড় যেন প্রাচীরের মত আড়াল করে রেখেছে ওপারের পৃথিবীকে। এইখানে এই মেণ্ডিপ পাহাড়ে বহু হাজার বছর আগেকার গহ্বর আছে। তারি একটা বিখ্যাত গুহায় আমরা সেদিন ঢুকেছিলাম।

গুহাটা লম্বা চওড়া মিলিয়ে প্রায় আধমাইল হবে।

ভেতরটা অন্ধকার ছায়া ছায়া। লুকানো বিদ্যুতের আলো ঘনিয়ে তুলেছে আরো বেশী রহস্য। যেন কোন পাতালপুরীর মায়াকাননে পৌঁছে গেছি। এক কোণে খানিকটা জল জমে আছে, তাতে ছোট একটা নৌকা বাঁধা।—আর চারিদিকে কী আশ্চর্য কারুশিল্প প্রকৃতির,—সমস্ত গুহাটা ভরে একটা উঠছে একটা নামছে।—স্ট্যালেকটাইট আর স্ট্যালেকমাইট।—ওরা আর কিছু নয় আবহাওয়ার জলকণা জমে ধাতব হয়ে উঠছে।—কোনটা সরু কোনটা মোটা,—কোথাও চৌকো,

কোথাও বাঁকা চোরা, কত বিচিত্রগঠনের স্তম্ভ, গুহার তলা ও ছাদ থেকে নিম্ন ও উর্ধ্বমুখে পরস্পরকে স্পর্শ করতে ব্যগ্র হয়ে যাত্রা করেছে।—কত হাজার বছর ধরে এদের যাত্রা সুরু হয়েছে,—তবু, এখনো, কেউ আছে অর্ধপথে কেউ বা সবে দুতিন ইঞ্চি বড় হয়েছে।—কেউ বা গেছে পরস্পরের সঙ্গে মিশে। গাইড বল্লে,—'মনে কোরনা এগুলো পাথরের স্তম্ভ,—এগুলো ধাতব।'—আঘাত করল হাতের পেন্সিল দিয়ে,—টুং করে আওয়াজ হোল।

ধরিত্রী শোষণ করে আবহাওয়ার জলবিন্দু সমস্ত পাহাড় চুঁইয়ে গুহার ভিতরে এসে বিন্দু বিন্দু জমা হয় পাথরের মুখে।—যত রকম কেমিক্যাল পদার্থ এবং অপদার্থ আছে সব মিলিয়ে তার ভিতরে, একটা কাণ্ড বাধিয়ে দেয়।—সেই জল টুপ করে ঝরে পড়ে যায় না ; —ফুলে উঠে ঝুলে পড়ে ধাতুমূর্তিতে,—ধীরে ধীরে লম্বা হয়ে ছুঁতে চায় মাটিকে। মাটি থেকেও তেমনি একটী বিন্দু লম্বা হয়ে উঠে পড়ে—উদ্দেশ্য গুহার ছাদটাকে স্পর্শ করা। কিন্তু এই যাওয়া আসার গতির মাত্রা অতি ধীর। গাইড বল্লে, চার হাজার বছর ধরে এরা মাত্র এক ইঞ্চি বাড়ে। দু'চার হাজার বছর ধরে experiment করা চলে না—এসব গাণিতিক প্রমাণ।—নয় কি?—'সে তো বটেই' —গাইড বল্লে,—সমস্ত পৃথিবীটাই তো গণিতের একটা শূন্য অঙ্ক'। —যে বিন্দুটি নামে সে স্ট্যালেকটাইট, আর যে ওঠে সে স্ট্যালেক-মাইট।—লক্ষ বছরের সাধনায় এরা মিলতে পারে পরস্পরে।—কত সব অদ্ভুত এদের গড়ন।—কী অজস্র কারিকুরি আর কি বিচিত্র রং।—কোথাও ঘন কুঞ্চিত ভেলভেটের পর্দার মত ঝুলে পড়েছে। —কোথাও উঠেছে গাছের মত।—এসব গুহায় নাকি আদি মানবের অস্থি পাওয়া গেছে।

—মধ্যযুগে এই গুহায় ছিল দস্যুদের আড্ডা। লুণ্ঠিত ধনরত্ন গোপনে লুকিয়ে রাখত স্ট্যালেকটাইটের আড়ালে।—ধন সমেত তাদের শেষ চিহ্ন মূক ধরিত্রী ভরে রেখেছে এইখানে।—

'চেডার' যায়গাটাকে একটা বড় গ্রাম বলা যেতে পারে।—চেডার বিখ্যাত তার গর্জ, তার কেভ, আর তার, 'চিজের' জন্যে।—তার গর্জ এবং কেভের কথা আগেই বলেছি—'চিজের' কথা আর কি বলব?—সে তো বলার ব্যাপার নয়,—চাখার।—বলা এবং খাওয়া দুটোই যদিও রসনা-সাধ্য ব্যাপার তবু একটার রস পরিবেষণে, অন্যটার গ্রহণে।—যা গ্রহণের জিনিষ তা পরিবেশন করার চেষ্টা নিরর্থক। কাজেই আমিও সে চেষ্টা থেকে বিরত হলাম।

চেডার যায়গাটা চমৎকার। ছোট ছোট কাঁচের দোকানে সাইকেল থেকে চকোলেট পর্যন্ত সব কিছু পাওয়া যায়। মোটরের কারখানা থেকে রঙের দোকান সবই আছে।—আশে পাশের ছোট ছোট গ্রাম থেকে লোকে এখানেই আসে হাট-বাজারের বেসাতি করে ফিরতে।

মাইল তিনেক দূরের এমনি একটা ছোট্ট গণ্ড গ্রামের একটা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামল।—বৃদ্ধ বললেন, চিনতে পারো 'জয়'—?—'জয়' সোৎসাহে বল্লেন—'নিশ্চয়।—ঐ তো সেই ম্যাগনোলিয়া গাছ।—ওর নীচে বসে কত চা খেয়েছি'।—'হ্যাঁ', দীর্ঘশ্বাস নেমে এল বৃদ্ধের মর্মস্থল থেকে,—'সে সব দিন চলে গেছে।—তখন পীটারের মা বেঁচে ছিলেন'।

এই ছোট্ট গ্রামটার নাম ড্রেকট্।—তখন মে মাসের সুরু।—ঢালু ঢালু নীচু পাহাড়ের গড়ানে গায়ে যেন ফুলের বিছানা পাতা আছে।—রামধনুর রঙে আঁকা তাতে কত বিচিত্র আলপনা।—মাঝে মাঝে কত রকমের বুনো গাছ।—তাদের সরু সরু পাতা হাওয়ায় শন্ শন্ করছে।—ছোট্ট একটা ফুল বাগানের বেড়া ঘেরা চার্চকে পার হয়ে, পাথরে বাঁধানো সরু একটা পথ বেয়ে আমরা এসে পৌঁছলাম। এক ধারে বার্লির সবুজ ক্ষেত। অন্যধারে ছোট্ট একটা সাদা গেটের পরে ছোটখাট একটুকরো বাগান। তার এক কোণে একটা ম্যাগনোলিয়া গাছ,—ফুলে ফুলে ভরা।—তা থেকে মৃদু

সুগন্ধ যেন কিসের একটা আভার মত ছড়িয়ে পড়ছে চারিদেকে।—এদেশের গ্রামগুলির ধরণেই বোধহয় আমাদের দেশের স্বাস্থ্যনিবাস-গুলি তৈরী হয়েছিল।—আমাদের দার্জিলিং কার্সিয়াঙ হাজারিবাগ রাঁচির সমৃদ্ধ পাড়াগুলির রুচির এডিসন এরা।

আমরা ড্রেকটে এসে পৌঁছলাম রাত প্রায় ৮টায়।—তখনো আকাশে ফ্যাকাশে আলোরা মরেনি।—বাহাত্তর বছরের নবোঢ়া তার বলিরেখাঙ্কিত মুখে হাসি ফুটিয়ে তুহাতে আমাদের জড়িয়ে ধরল।—পীটারও এসেছিল আমাদের সঙ্গে।—সে বুড়ীর গালে একটী ছোট্ট চুম্বন দিয়ে বল্লে—'হ্যালো—এলা'। বুড়ীর সৎ ছেলেরা তাকে নাম ধরেই ডাকে।—আমরাও তাই সুরু করলাম।—বাড়ীতে এই তুই বুড়ো বুড়ী।—বাড়ীটি দোতালা! ছোটখাট সুন্দর। তবু সাত আটটা ছোট বড় ঘর। প্রত্যেকটী ঘর নিখুঁত সাজানো। ঝি-চাকর একটীও নেই। কিন্তু আতিথেয়তার সযত্ন অভ্যর্থনা চারিদিকে ছড়ানো।—খুকুর জন্যে যেন ঠিক ওর মাপ দিয়ে তৈরী করা ছোট্ট একটা ঘর। তার ছোট্ট সাদা নরম বিছানায় ছোট্ট খুকু এক মিনিটে ঘুমিয়ে পড়ল। শিয়রের বন্ধ কাঁচের জালনার পর্দা সরিয়ে দিলাম। পিছনের সব্‌জির বাগান আর স্ট্রবেরি ক্ষেতে চাঁদের আলোরা থমকে থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে,—কোটি যোজন দূর থেকে এই ঘোর বিদেশে বাতি জ্বালিয়ে পাহারা দিতে এসেছে আমার মেয়ের শিয়রের কাছে।—

সেদিন আমরা অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব ঠিক করলাম।—বুড়ীর ইচ্ছে গল্প করে। কিন্তু রাত দশটার বেশী তার শরীরে বয় না। বুড়ো বল্লে,—'বাচ্চারা শুতে যাও।—তোমাদের প্যাক্‌ করে উপরে তুলে দিয়ে এসে আমি বসব একটু নীচে'।—'কেন?' আমরা অবাক হলাম,—'তুমি বুড়ো মানুষ, এতটা পথ গাড়ী চালিয়ে এসেছ—ক্লান্ত তো তোমারি হওয়ার কথা ছিল—ফস্‌ করে আমরা কি করে হলাম?'—কিন্তু বুড়ো শুনলে না কথা।

"ও এখন শুতে পারবে না", বুড়ী বল্লে, "কিছু ভেবো না। ও কোনদিন সকাল সকাল শুতে আসে না। গভীর রাত পর্যন্ত এখানে বসে থাকে। কখন একসময় সাবধানে পা টিপে আমার ঘুম না ভাঙিয়ে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ে আমি টেরও পাইনে"।—দেখলাম পীটার চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুভরাত্রি জানিয়ে সে শুতে গেল।—পরদিন তার মায়ের কবর দেখাতে নিয়ে গিয়ে পীটার বলেছিল,—'মা মারা যাবার পর থেকে রাত পর্যন্ত ঐ ঘরে বসে দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে বই পড়তে পড়তে মা'র কথা ভাবা কিম্বা পিয়ানো বাজানো বাবার নেশায় দাঁড়িয়েছে'।—পীটার তার মৃত মাকে এখনো, শুধ্ ভালোবাসে না—ভক্তি করে।—মায়ের স্মৃতি তার কাছে অতি পবিত্র। মায়ের কথা বলতে গেলে, তার গলা নীচু হয়ে আসে।—আর সত্যিই তিনি নাকি অসাধারণ মহিলা ছিলেন। তবু, পীটার তার বাবাকেও ভালোবাসে।

নরম কার্পেট,—নরম বিছানা ক্লান্ত শরীর আর পর্দা সরানো জানলার বাইরে বসন্তকালের চাঁদনী রাত।—তবু অপরিচিত যায়গায় ঘুম আসতে চাইছিলো না।—পাড়াগাঁয়ের রাত—নিবিড় ঘন গহন নির্জনতা গভীর নৈঃশব্দের ভারে যেন মূক হয়ে পড়েছিলো।—আর সেই নিবিড় স্তব্ধতার ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁপোকার একটানা সুর, দূর বাংলার নিভৃত গ্রামগুলিকে কেবলি টেনে টেনে কাছে নিয়ে আসছিলো।—কত রাত পর্যন্ত কে জানে, নীচের ঘর থেকে মৃদু মৃদু পিয়ানোর সুর, তারামোছা চাঁদের কুয়াশাকে আকুল করে আধঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মতো বাজছিলো।

পরদিন ঘুম ভাঙল বেলা আটটায়।—তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে, নীচে নেমে দেখি,—বুড়ো উঠেছে কোন ভোরে।—নিজে কোকো আর রুটী টোস্ট খেয়ে, বুড়ীর ব্রেকফাস্ট দিয়ে এসেছে তার বিছানায়।—আমাদের জন্যে টেবিল সাজিয়ে কোকিলের ডাক

নকল করে খুকুকে ডাকাডাকি করছে।—লজ্জা হোল।—আমার অনেক আগেই নেমে এসে ভদ্রলোকের কাজে হাত লাগানো উচিত ছিল।—কী অসম্ভব এনার্জি এই বয়সে।—

খুকুর খাওয়া হলে,—বুড়ী তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল,—বলে গেল, সে ফিরে এসে লাঞ্চ তৈরী করবে,—ইতিমধ্যে কেউ যেন তার কাজে হাত না লাগায়।—খুকু যখন ফিরে এল তখন চুলের ডগা থেকে নখাগ্র পর্যন্ত ওর উৎসাহে ভরপুর। ছ' বছরের শিশু আর বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধার সারা গায়ে মাথায় ডেইজি, বাটারকাপ আর টিউলিপ্‌সের পুষ্পাভরণ। দুজনের দুজোড়া হাত ভর্তি ব্লু বেল অথবা নীল ঘণ্টা ফুলের রাশি।—

ড্রেকটের এই ছোট্ট গ্রামে দিন দশেক্ সময় আমাদের ফুর ফুর করে উড়ে গেল।—ব্রেকফাস্টের পরে আমরা রোজই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতাম।—কোনদিন সঙ্গে করে নিয়ে যেতাম ফল আর স্যাণ্ডুইচ্, ভারতীয় ভাষায় যার নাম আজকাল হয়েছে 'বালুমায়াবিণী'।—কোনদিন বা খুব চড়া দামের রেঁস্তোরায় ঢুকে আমরা 'ফ্যাসানেবল' হবার ভান করতাম।—

Weston Supermareএ সমুদ্রের ধারে মস্ত এক দোকানের উপরতলায় এমনি এক রেঁস্তোরার কথা মনে পড়ছে। সেখান থেকে বড় বড় কাঁচের জানলা দিয়ে সমুদ্রতীরের রং বেরঙের কার্নিভ্যাল দেখা যায়। আর থেকে থেকেই ম্যানিকিন্ মেয়েরা এসে সাজ বদ্‌লে ঘুরে ঘুরে বাঁকাচোরা নানা ভঙ্গী করে সাজের বিজ্ঞাপন দিয়ে যায়।—বুড়ো বল্লে 'এই সুযোগ,—খুকুকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে ম্যানিকিন করে দাও,—সারা রেস্তোঁরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে।' আমরা হেসে উঠলাম,—আর তাই শুনে সত্যিই সবাই সব ফেলে আড়চোখে এই দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগল।—এসব যায়গার লোকদের লণ্ডন, ম্যাঞ্চেষ্টার বা ঐ ধরণের বড় সহরগুলির মত ভারতীয় দেখা বেশী

অভ্যেস নেই।—তাই মুখে কৌতূহল না দেখালেও তার প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে সকলেরই মুখে চোখে।

সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে আসি।—প্রায় রোজই কেউ না কেউ দেখতে আসে আমাদের কিম্বা আমরা যাই কারো না কারো বাড়ীতে। টেলীফোনে ঠিক হয় রোজ সকালে—কোন দিন কে আসবে।—খুকুর তো রোজ সকালে বাঁধা tour—কার বাড়ীতে। 'ইন্‌কিউবেটারে' মুরগীর ডিমে তা দেয়া হচ্ছে,—কার বাড়ীতে এখনো 'চীজ' তৈরী হচ্ছে এইসব দেখবার জন্যে।—সবাই একবার সেই ভারতীয় শিশুটিকে দেখতে চায়, যে নির্ভুল ইংরেজী বলে, আর, থেকে থেকেই নিজের মাতৃভাষায় কিচিরমিচির করে ওঠে নিজের মা বাবার সঙ্গে।—"অদ্ভুত! এত ছোটবেলায় তোমরা দুটো ভাষা শেখো?"—"হ্যাঁ শীগিরই তৃতীয় আর একটা শিখতে হবে।—সর্বভারতীয় কোন একটা ভাষা"—

"ও হাঁ তাও তো বটে,—যা বিরাট দেশ তোমাদের। আমাদের শিশুরা কিন্তু একটা ভাষা শিখতেই হিম্‌সিম্ খেয়ে যায়।—ইংরেজীটাই জানে না ভালো করে।"—খুকুকে দেখে ওদের ভারী মজা লেগে গেছে।—সবাই ওকে নিমন্ত্রণ জানালে জুলাই মাসে এসে তাদের ক্ষেতে স্ট্রবেরী তুলতে। বুড়ী বল্লে,—ওকে রেখে যাও,—দোহাই তোমাদের, লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে না খাইয়ে শুকিয়ে ফেলো না'। সত্যি তখন লণ্ডনের হোটেলে ভালো খাবার পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল। মুরগী তো দূরের কথা,—মাট্‌নও পাওয়া যেত না। শুধু সমুদ্রের মাছ। ডিমের চেহারা দেখা যেত না।—অমলেট বলে যা দিত তা এগপাউডারের অর্থাৎ গুঁড়ো ডিমের তৈরী।—

গ্রামের চেহারাটা আলাদা হলেও গ্রামের ধরণটা সবদেশেই খানিকটা এক।—যেমন সহজ আন্তরিকতা, আবার তেমনি গেঁয়ো গসিপ—যাকে বলে এ ও'র হাঁড়ির খবর নিয়ে ফেরা।

বাঁকা চোরা বাঁধা পথে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাসের ফুল। তার মাঝখান দিয়ে ঝকঝকে গদি আঁটা বাস্ চলেছে ধেয়ে। তারি একটাতে উঠে সেদিন সকাল বেলা—পীটার চলে গেল ব্রিষ্টলে। তার ছুটীর মেয়াদ ফুরিয়েছে।—আমাদেরও লণ্ডনে যাবার সময় হয়ে এল,—বিকেলে চা খেতে খেতে গল্প করছি,—বুড়ী এসে বল্লে—পাদ্রীসাহেব এসেছেন। তোমরা হিন্দু শুনে আলাপ করতে চান। শুনে আমার পতিদেবতা খুব মিনতিভরে আমার দিকে চাইলেন,—অর্থাৎ ভাবখানা এই, যে, এখুনি যেন এই পাড়াগাঁয়ে খৃষ্টান পাদ্রীর সঙ্গে ব্রহ্মবাদ নিয়ে তর্ক ফেঁদে বোসো না। বৃথা ভয়,—আমারও সে সদিচ্ছা মোটেই ছিল না,—খৃষ্টানদের convert করা বড় শক্ত—কিন্তু বুড়ী আমাদের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। বললে, "আমার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে দেখতে যে, ছবির সঙ্গে তর্ক করে পাদ্রী সাহেবের দশাটা কি হয়"। অবাক কাণ্ড! আমি বরাবর জানি,—বুড়ী চার্চিলের ভক্ত। নিয়ম করে প্রতি রোববার চার্চে যায়। ধার্মিক লোক। সেই বুড়ীর পাদ্রী নিয়ে এই রসিকতায় আমি অবাক হয়ে গেলাম,—তখুনি কোমর বেঁধে তর্ক না করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসার ঘরের দিকে গেলাম।

বেশ কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা করার পরে, ভদ্রলোক হঠাৎ অবাক হয়ে গেলেন ক্রাইস্টকে আমরা ভক্তি করি শুনে।—"বল কি,—তোমরা হিন্দু হয়ে ক্রাইস্টকে বিশ্বাস কর?" "হাঁ, করি বই কী—মহৎ মানুষ বলে, তাঁকে জানি, যাঁর মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ ছিল।"—"ওইখানেই তো আসল তফাৎ,"—ভদ্রলোক হাসলেন,—"তোমরা বল ঈশ্বরের প্রকাশ,—আমরা তাঁকে মানি স্বয়ং ঈশ্বর বলে।"—

খুব ভালো মানুষের মত প্রশ্ন করি,—"মাতৃগর্ভে ঈশ্বরের জন্ম হয়েছিল?"—

সে গর্বভরে বল্লে—"হাঁ পবিত্র কুমারী গর্ভে।—

—"তারপরে একদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঈশ্বরকে মরতে হয়েছিল ?"

—"অ্যাঁ মরতে হয়েছিল ?" পাদ্রীসাহেব একটু থতমত খেয়ে যান।—তারপরেই দ্বিগুণ উৎসাহে বলে ওঠেন।—"কিন্তু রেসারেকসন্ ?—সেকথা ভুলো না।—সেইটেই বেশী important।" খৃষ্টান ধর্মশাস্ত্রে 'রেসারেকসনে'র প্রাধান্য সবচেয়ে বেশী। "তা বটে, মানলুম সেও সত্যি ; তবু রেসারেকসন্ তো তিন দিন পরে হয়েছিল।—অন্তত তিন দিন তো ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছিল।—তিন দিনের জন্যে বিশ্ব ঈশ্বরহীন হয়েছিল তাহলে ?"—পাদ্রীসাহেব, পেন্সিলটা দাঁতে কামড়ে একটু ভাবতে লাগলেন।—বল্লেন,—"তোমার প্রশ্নটা লিখে দাও তো। কোথায় কি একটা গোলমাল আছে—এরও নিশ্চয় জবাব আছে।—তবে আমার এখুনি মাথায় আসছে না।—আমি আমাদের কর্তাকে জিগ্যেস করব।—ঠিকানা দিয়ে যাও—তোমায় জানাব।"

আজো কিন্তু তার জবাব পাইনি।—আজ লিখতে বসে সেই পাদ্রীর সরল ভাবভঙ্গী মনে পড়ছে।—দাঁতে পেন্সিল কামড়ে সে এই প্রশ্নটাকে কিছুতেই মনের মধ্যে মেলাতে পারছিল না,—সত্যিই কি কোনকালে ঈশ্বরের মৃত্যু হয়েছিলো ?—তিন দিনের জন্যেও কি বিশ্বের নিরীশ্বর অস্তিত্ব সম্ভব ?—সত্যিই কি মানুষ-মায়ের গর্ভ থেকে ঈশ্বরের জন্ম হতে পারে ? বেচারা পাদ্রী মশাইর, ভারতীয় শাস্ত্র, ভারতীয় দর্শন, এবং ভারতীয় কবিতা,—কোনটাই পড়া নেই,—থাকলে হয়ত বলতেন,—মানুষের গর্ভে নয়,—মানুষের বক্ষে ঈশ্বরের কোটি বিচিত্র নবজন্ম মুহূর্তে মুহূর্তে সংঘটিত হচ্ছে। মানুষের জ্ঞান কল্পনায় ঈশ্বরের বাস,—আর মানুষের তমাচ্ছন্ন অজ্ঞানান্ধ হৃদয়ে ঈশ্বরের চির মৃত্যু।—রেসারেকসনের পথ সেখানে রুদ্ধ।

লণ্ডনে এসে আমরা গাড়ী ডেলিভারী নিলাম। তারপরে চল্ল সারা ইংল্যাণ্ড টো টো করে ঘোরা। উত্তরে লেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে

দক্ষিণ সমুদ্রতীর পর্যন্ত।—ওদিকে স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্‌ও বাদ পড়ল না।—তারপরে একদিন বেরিয়ে পড়লাম ফেরী নৌকোয় করে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপের main landএ।—তবু ইংলণ্ডে ঢুকেই এই প্রথম দশ দিনের স্নিগ্ধ ছবি আজো আমাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।—ইয়োরোপে মানুষ যায় প্রধানত তার আলাদীনের প্রদীপটিকেই দেখতে,—যার জিন্‌কে বশ করে তার এই বিপুল ঐশ্বর্যের সমারোহ,—তার সভ্যতার চমক্।—কিন্তু সেই নিভৃত গ্রামের দশ দিনের আতিথেয়তায় প্রদীপটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ডে ছিল,—আর foregroundএ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো ভালোবাসা,—প্রকৃতিতে আর মানুষে মানুষে।

মোটরে প্যারিস

দুপাশে রুক্ষ বন্ধ্যা জমির মাঝখান দিয়ে পথ চলেছে। ভোরবেলা রওনা হয়েছি সুইস রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে। প্যারিস সেখান থেকে তিনশ' মাইলের পাড়ি। অনেক পথ পেরিয়ে এলাম। দিনান্তের ছায়া পড়েছে, পশ্চিমাকাশের প্রান্তে।

গরমে আর ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। পথের দুপাশে উৎসাহিত হবার মত বিশেষ কিছু নেই। সবুজের রং জ্বলে যাওয়া। দু একটি নিষঙ্গ গাছ দাঁড়িয়ে আছে, বিরলবসতি ভাঙাচোরা গ্রামের ফাঁকে ফাঁকে। যেদিক দিয়েই ফ্রান্সে প্রবেশ করা যাক না, তার গ্রামগুলির ছন্নছাড়া মূর্তি চোখে পড়বেই। যাবার পথেও ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, তখনো দেখেছি সেই একই দৃশ্য। কোন কোন বাড়ী একেবারেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কোথাও বা মুমূর্ষুর ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকার মত, ফ্রান্সের মাটি কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা দেয়াল। কোন হতভাগ্য বাস করে হয়ত তারি মধ্যে।

একটার পর একটা আধভাঙা বাড়ির ঢেউ চলেছে পথের দুধার বেয়ে। দেখে দেখে মন কেমন করে ওঠে। কোথায় যেন বাংলা দেশের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। বার বার আঘাতের ধাক্কায় সেই রকমই গুঁড়িয়ে যাওয়া চেহারা এর। বাংলার মতই এরও গ্রামগুলির মাথায় পড়েছে প্রথম লাঠির বাড়ি।

ইংলণ্ডে ঠিক এরকম নয়। সেখানে গ্রামগুলি বেশ আছে, সাজানো গোছান, স্বপ্রতিষ্ঠ। বরং সহরেরই এক একটা অংশ যেন একেবারে নিশ্চিহ্নে গেছে মুছে।

সহরগুলি ঐশ্বর্যশালী—তাদের অনেক মান, অনেক প্রতিপত্তি। তাদের একটা দিক নষ্ট হলেও, আরো অনেক দিক থাকে। কিন্তু গ্রামের সম্বল বেশী নয়, তাদের সেই স্বল্প সঞ্চয়ের উপর হাত পড়লে, আর তাদের সর্বনাশের বাকী কি থাকে? প্রত্যেক জাতেরই ভিত্তিমূল তার গ্রামে, তাই ভয় হয় যে, ফ্রান্সের মেরুদণ্ডও কি এই রকম ভেঙে গেছে?

অবিরাম রথ চালনায় চালকের হাত উঠেছে ঘেমে, বল্লেন—"একটু থামি।" হাঁটাপথের পাশে রাখলাম আমাদের গাড়ী। খুকু চেঁচিয়ে উঠল—'দেখ দেখ ভাঙাবাড়ীতে ফুলগাছ।' তাকিয়ে দেখি পতনোন্মুখ ছুটো দেয়ালকে জড়িয়ে ধরেছে একটী পুষ্পিত লতা। অসংখ্য হলদে ফুলের কুঁড়িতে ভরে গেছে তার হরিৎবর্ণ তনুদেহ। ভাঙা দেয়ালকে বেষ্টন করেছে নবীন প্রাণ, যেন জরাকে ঘিরে ধরেছে মঞ্জরিত যৌবন। তার উর্ধ্বমুখিন ফুলের কুঁড়িতে জীবনের জয়পতাকা। অতীতের সঙ্গে নবীনের, মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের চিরমিতালী চলেছে জগৎ জুড়ে।

বেশ লাগছে জায়গাটা।—বোধ হয় যেন, ঐ ভাঙাবাড়ীতে কেউ বাস করে। দেয়ালের পাশে খানিকটা জায়গা কর্দমাক্ত পিচ্ছিল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষিত রইল না আমাদের কৌতূহল। ভাঙা দেয়ালের পিছন থেকে বেরিয়ে এল একটী মেয়ে,—পরণে মলিন ঘাগরা, আর উর্ধ্বাঙ্গে আছে একটা নীল ব্লাউস, ময়লায় কালো হয়ে এসেছে যার রং—তার আবার পিঠের কাছে ছেঁড়া। ছেঁড়া জামার ফাঁকে তার ফর্সা গায়ের টুকরো জ্বলছিল,—কবি হলে বলতাম,—যেন মেঘের ফাঁকে বিদ্যুৎ। রুক্ষ সোনালী চুলের বেণী ঝুলছে মাথায়। খালি পায়ে সে একটা কাঁচের ঝারি নিয়ে পথ-পাশের কল থেকে জল নিতে চলেছে। যেন একখানি সচল বিষাদ প্রতিমা।

"—হাঁগো এ কাদের দেশে,
বিদেশী নামিনু এসে,
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি—"

কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি নিবে এল। বয়সে তরুণ হলেও তার মুখে জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ছাপ। সে দৃপ্ত অবহেলাভরে, আমাদের দিকে কঠিন দৃষ্টির ঝলক হেনে চলে গেল।—যেন বলে গেল, দারিদ্রের দুর্ভেদ্য অহঙ্কার আমার বর্ম—তোমাদের হাসি কৌতুকের পথ সেখানে রুদ্ধ।

যতদিন প্যারিসে আসিনি, মনটা উৎসুক হয়েছিল। See Paris and die! তা মরবার আগে দেখা তো হোল। ভিক্টর হিউগোর প্যারিস, রুসোর প্যারিস, লুই রাজাদের বিলাস ক্ষেত্র প্যারিস, অষ্টাদশ শতাব্দীর বিদ্রোহী প্যারিস, কবিও শিল্পী প্যারিসের বহু যুগ ব্যাপী প্রখ্যাতি তাকে রহস্যময় করে তুলেছে।—কেমন করে, কেমন ভাবে, কোথা থেকে তাকে দেখব ভেবে পাচ্ছিনে।

বহুধাবিভক্ত সীন নদী প্যারিসকে ঘিরেছে জালের মত, পারাপারের জন্যে আছে নানাধাঁচের সাদা সাদা ছোট ছোট সেতু। প্যারিস সুন্দরীর কৃষ্ণ কেশপাশ কবরীর আকারে ঘুরে ঘুরে কুণ্ডলীকৃত হয়ে বিদ্ধ হয়েছে যেন রূপোর কাঁটায়।

সারা সহর জুড়ে কেমন যেন এলোমেলো অগোছালো সৌন্দর্য। পূর্বদেশীয় ঔদাসীন্যের ছোঁয়া লেগেছে যেন,—হেলায় ফেলায় ছড়িয়ে রেখেছে সম্রাটের ঐশ্বর্য। আর তারি পাশাপাশি পড়ে আছে তেমনি কি অদ্ভুত বৈপরীত্য, কি অকুণ্ঠ দীনতা! রাস্তাগুলি প্রকাণ্ড চওড়া। প্লাসদ্যলা কঙ্কর্ডের ভিতরে ক'টা চৌরঙ্গী ঢুকে যেতে পারে কে জানে! তার মাঝখানে ঘাসে ঢাকা স্কোয়ার, আর তার উপরে ঈজিপ্ট থেকে আহৃত থাম ঘোষণা করছে বিজেতার গর্ব ও পরা-

জিতের আত্মসমর্পণ।—কিন্তু এই রাজপথের উপরেই ঘুরে বেড়ায়, জীর্ণশীর্ণ ছিন্নবেশ হতাশ্বাসের দল। তারা উঁকিঝুঁকি মারে পথিকের পকেটে। আর কেউ বা বিদেশী দেখলেই উস্‌খুস করে ওঠে।

বিশাল বিপুল রাজপথগুলি থাকে থাকে বিভক্ত হয়েছে নরম সবুজ বুলিভার্ডে। তার উপরে রঙীন ছাতার নীচে আসর বসেছে 'কফি'র কিম্বা সুরার। এই ছাতাগুলি তো আমার পরিচিত।—এদের দেখেছি ফরাসী বইয়ের পাতায়। সবুজ বুলিভার্ডের ওপরে তরুণ তরুণীর ইসারা। কিন্তু কি আশ্চর্য—বইয়ের পাতায় যাকে অত উজ্জ্বল দেখেছিলাম, বাস্তবের পাতায় আজ সে এমন ম্লান কেন?

বাস্তবেও তো এখানে হাসি হল্লার কমতি নেই। ঐ যে তিন বন্ধুতে মিলে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছে,—কেউ বা কনুইয়ে ভর দিয়ে, কেউ বা পা ছড়িয়ে বসে, হাতে নিয়ে সিগারেট; ঐ যে দু'জোড়া তরুণ তরুণী জাপানী পাখায় হাওয়ার ফ্যাশান খেতে খেতে প্রণয়ের প্রথম ভাগের পাঠ নিচ্ছে, আর ঐ যে কজন শ্রমিক মিলে জটলা করে পান করছে সস্তা মদ, ওদের সঙ্গে চেনাশোনা হয়ে গেছে বহুকাল। তাই কি পরিচিতির মোহশূন্য চোখে তেমন করে লাগছে না এদের মায়া। কিম্বা যে সময়ে তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ফরাসী লেখকের ইংরেজী অনুবাদের পাতায়, সেই রোম্যান্টিক বয়সটা তার সোনার কাঠির পরশবুলানো দৃষ্টিটাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেছে বলেই কি এমন সাধারণ লাগছে সব,—কোন কিছুতেই তেমন বিস্ময় বোধ হচ্ছে না। কিম্বা হয়ত, এইটেই ঠিক, যে, কবি তাঁর চিত্তের রস মাধুর্যে তুলি ডুবিয়ে যে বর্ণে এদের ছবি এঁকেছিলেন, আমার সে শিল্পদৃষ্টি নেই বলেই হয়ত চোখে তেমন করে লাগছে না এর নেশা।

তাই সাদা চোখেই দেখে চলেছি সেই প্যারিসকে, যে একদিন

ইয়োরোপীয় সভ্যতার নেত্রী ছিল, অন্ধকার যুগের পারে যেখান থেকে নবজাগরণের অরুণরশ্মি পড়েছিল ইয়োরোপের সর্বত্র।

প্রকাণ্ড কোচের ভিতরে বসে আছি।—আর চলেছি এখান থেকে সেখানে আর সেখান থেকে ওখানে। দেখে নিচ্ছি যা কিছু আছে দর্শনীয়। ঐ যে প্রকাণ্ড ক্যাথিড্রেল উন্নতমস্তকে দাঁড়িয়ে, ওর নাম—'চার্চ অব দি সেক্রেড হার্ট'—অর্থাৎ পবিত্র হৃদয়ের মন্দির। ভিতরটা স্তব্ধ সুন্দর—মেয়েরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে চোখ বুজে নীরব প্রার্থনায় রত। শোনা গেল, এ মন্দিরের একান্ত কামনা নাকি নিষ্ফল হয় না। শুনে আমিও বসে গেলাম এককোণে, ক্যাথলিকদের মত মাথায় আঁচলের কোণটা টেনে দিয়ে। কিন্তু আজো তো পেলাম না প্রার্থনা পূরণের কোন প্রতিশ্রুতি। কিম্বা হয়ত অবিশ্বাসীর প্রার্থনার মূল্য কোন মন্দিরেই নেই। কি সুন্দর আলো আঁধারে ভরা এই মন্দিরটা। সুগন্ধী কর্পূরের মত কিসের একটা মৃদু গন্ধে বাতাস ভারী। মেরীর মাতৃমূর্তির পায়ের কাছে জ্বলছে মোমবাতির সারি। গোলমাল নেই, চেঁচামেচি নেই। পাণ্ডা-ঠাকুরদের টানাটানি হাঁকাহাঁকি নেই।

কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন হর্ণ বাজাচ্ছে আমাদের কোচ, নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে নেই। অন্তত পঁচিশজন যাত্রী নিয়ে সে বেরিয়েছে, তার মধ্যে বেশীর ভাগই অবশ্য আমেরিকান।

অতএব আমেরিকান কায়দায় একনিঃশ্বাসে প্যারিস দর্শন শেষ করতে হবে। ভারতের মৃদুমন্দ ছাঁদের চলন এখানে নৈব নৈব চ। কাজেই ছুটে চলেছি বাসে, এসে পড়েছি, নোতরদামের পাদমূলে। মন্দিরটা হঠাৎ দেখে তেমন কিছু অভাবনীয় লাগে না; কিন্তু কিছুক্ষণ এর নীচে ঘোরাফেরা করলে ধীরে ধীরে এর মহিমা ফুটে ওঠে।—কিন্তু একে কি আর দেখা বলে? গাইড গড় গড় করে বলে চলেছে, সবাই প্রাণপণে গিলছে তার কথা। মনের তিনভাগ জুড়ে চলেছে

গাইডের বকবকানির রেলগাড়ি আর একভাগ অতিকষ্টে ওরি মধ্যে কোনমতে পাশ কাটিয়ে সন্ধান করে চলেছে যা কিছু আছে নেবার।—কোন্ সময়ে এ মন্দির তৈরী হয়েছিল, কি হবে তার তারিখ মুখস্থ করে। আমি তো ইতিহাসের পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিনা।—আর ঐ যে সপ্তরাঙা কাঁচের বিচিত্র বর্নিকাভঙ্গে যীশুখৃষ্টের জীবনী আঁকা, ঐ কাঁচের ব্যবহার কোন শতাব্দীতে আরম্ভ হয় আর কবেই বা লুপ্ত হয়ে যায়, আর কতপরেই বা আবার হয় নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার, এসব খবরেরও আমার দরকার নেই, আমি শুধু জানতে চাই, সেই ঘণ্টাটা কোথায়—হাঞ্চব্যাক্ যেটা বাজাত।

সীন নদীর একটা উঁচু দ্বীপের উপরে আছে এই মন্দির, তাই প্যারিসের প্রায় সর্বত্র থেকেই একে দেখা যায়।

কিন্তু তবু তাকে পিছনে ফেলে আমরা এগিয়ে চলি। 'ল্যুভ' চিত্রশালায় এসে পৌঁছয় গাড়ী। আমি কিন্তু অটল ভাবে বসে থাকি গাড়ীতে—কেউ নড়াতে পারে না আমাকে। এ আমি কিছুতেই দেখব না ওদের সঙ্গে এরকম ভাবে। কাল সমস্ত দিনটা দেব একে অর্ঘ্য। এখন ওরা যতক্ষণে ল্যুভ দেখা শেষ করবে, আমি ততক্ষণ মাথাধরার ওজুহাতে খালি গাড়িটায় বসে, আরাম করে পা ছড়িয়ে বেশ খানিকটা গড়িয়ে নিতে পারবো।

তারপরে আবার নাহয় উৎসাহ ভরে এগিয়ে যাওয়া যাবে একেল টাওয়ারের চূড়ায়। ফরাসীদের মত সৌন্দর্যপ্রিয় জাত কি করে যে এই কুৎসিত-দর্শন জিনিষটাকে গর্বভরে সাজিয়ে রেখেছে কে জানে! উইণ্ডমিলের দেশের পরে যান্ত্রিক সভ্যতার বিজয়ঘোষক এই স্তম্ভের পায়ের কাছে প্যারিসকে মনে হয় যেন দানবের ঘরে বন্দিনী রাজকন্যা। সমস্ত জায়গাটা একেবারে কালো। জিনিষটা শুধু যে কুরূপ তা নয়, ভীষণ নোংরাও বটে। বহু উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম liftএ করে। তবু সিগ্রেটের টুকরো, কমলালেবুর খোসা, কয়লার গুঁড়োয় যায়গাটা যাকে বলে অত্যন্ত কুশ্রী।

আমাদের দেশে নোংরামি যতই হোক তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার উপায় আছে। কিন্তু এখানে পরস্পরের নোংরামি সবাই মিলে ভাগাভাগি করে, মাখামাখি করে নিতে হয়।

তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে আসছে, কিন্তু জল নেই কোথাও। তার বদলে সুরা যত চাও পাবে। আর সে গেলাসগুলি ধোয়া তো হয়ই না সবসময়। অনেক কষ্টে একটা লেমনেড সংগ্রহ করা গেল,—কিন্তু সুরার গন্ধে মুখের কাছে তোলাও গেল না।

আমেরিকান ভঙ্গীতে প্যারিস দেখা শেষ হল। যা কিছু দর্শনীয় দেখেছি একনিঃশ্বাসে। ল্যুভচিত্রশালায় ইচ্ছামত কাটিয়েছি কয়েক ঘণ্টা।

ভুবনবিদিতা 'ভিনাস ডি মিলোকে' দেখলাম, লম্বা করিডরটার শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। গর্বভরে ঈষৎ বঙ্কিম সেই ভগ্নবাহু বিজয়িনীর সুঠাম দেহলতা, পাশ্চাত্য ভাস্কর্যে নারীরূপের আদর্শ।

কত বিভিন্ন মূর্তির কত বিচিত্র রচনা কৌশল। তার মধ্যে ভারতবর্ষের দুটী একটী অতি দীন নিবেদন ছিল। তাদের ভাষায় ভারতের মনের কথাটী লেখা নেই। কেবল তার ঢংটুকু মাত্র আছে। চিত্রশালার অসংখ্য কক্ষে বিচিত্র রূপের হাটে বিচিত্র ভাবের খেলা। হতে পারে বাস্তবের অনুকৃতিই তার প্রাণ, তবু তার ব্যাপ্তি অথবা মনের উপরে তার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এই ছোট নিবন্ধে অবশ্য চিত্রালোচনার স্থান নেই।

এখন শুধু বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—সরু সরু অলি গলির ভিতর দিয়ে বাস চলেছে। বড় বড় রাস্তাগুলির সঙ্গে এসব গলির কি প্রভেদ! খুব বড় আর খুব ছোট চলেছে পাশাপাশি, আমাদেরই দেশের মত। দোকানগুলি ঝুঁকে পড়েছে স্বল্পপরিসর পেভমেণ্টের ঘাড়ের উপরে। অজস্র ছোট ছোট দোকানে বিচিত্র বেসাতি—কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। মাছের,

মিষ্টির, তৈরী জামার, সিল্কের, সুগন্ধির কিম্বা মৃত পশু ঝুলান মাংসের দোকান পাশাপাশি দিব্যি মিলে মিশে আছে। ইংলণ্ডের মত একধাঁচের রাস্তার দু'পাশে এক মাপের এক ঢঙের সাজানো বাড়ীর মালা গাঁথা নেই এখানে। ভারতের মতই অট্টালিকার পাশেই ভাঙা কুঁড়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত। তেমনি জীবন্ত সত্য অবশ্য ওদের পরস্পরের প্রতি সখেদ দীর্ঘশ্বাস, একজনের উত্থিত ঘৃণা থেকে, অন্যজনের উত্থিত বিদ্বেষ থেকে।

বাসের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে ভাগ্যহতের দল চলেছে ভাগ্যান্বেষণে। ময়লা প্যান্টের উপরে কারো বা একটা জীর্ণ কামিজ, কারো বা ছেঁড়া গেঞ্জি, গলায় ঝুলছে সরু ক্রস। অর্ধছিন্ন বড় বড় ঢিলে জামা পরা, কোটরাবিষ্ট ফ্যাকাশে চোখে বুড়ীরা কেউ বা জল নিয়ে যাচ্ছে কাঠের বালতী করে, কেউ বা বুনছে মোটা পশম। অল্পবয়সী মেয়েদের সাজে ওরি মধ্যে আছে একটু বিশেষত্ব। খালিপায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল পরে ওরি মধ্যে নিয়েছে অধরখানি রাঙিয়ে।—এরাই কি তারা?—যারা সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যাষ্টিলের আসে পাশে ঘুরে বেড়াত? প্যারিসের আণ্ডারগ্রাউণ্ড ড্রেনের অন্ধ নরকে নিশাচরের জীবন যাপন করতে করতে যারা বিদ্রোহকে আহ্বান করেছিল? অত্যাচারপীড়িত কোটরাগত চোখে আগুন জ্বেলে যারা প্রত্যেকটি ধনীর নাম লিখে রাখত প্রতিহিংসার খাতায়? আজো ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে, প্যারিসের অলিতে গলিতে তাদেরি যেন দেখতে পাই।

শুধু আজ তাদের চোখের আগুন গেছে নিভে। যে দেশে, যে শহরে, মানুষের মুক্তির বাণী প্রথম ভাষা পেয়েছিল, সেই দেশের মানুষ আজ সর্বরকমে বন্দী,—লোভের আশায় বন্দী, ক্ষুধার তাড়নায় বন্দী, চরিত্রের দীনতায় বন্দী। সেদিন যারা বিদ্রোহ করেছিল, মানুষের মুক্তির চেয়ে অত্যাচারের প্রতিশোধের দিকেই তাদের কি লক্ষ্য ছিল বেশী? তাই কি মানবের স্বাধীনতা, ধনীর তৈরী ব্যাষ্টিল

থেকে মুক্তি পেয়েও প্রলিটেরিয়েটদের হৃদয়ে জঞ্জাল নাগপাশের বন্ধন। মানবমুক্তি এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় স্থানান্তরিত হোল মাত্র। অনন্ত গগনের উন্মুক্ত উদারতায় পক্ষ বিস্তার করতে পেল না। তাই ধনী দরিদ্রের খাঁচা বদল অথবা গভর্ণমেণ্ট বদল ছাড়া সত্যকারের সাম্যের আভাস এখানে তেমন পাওয়া যায় না। পরশুরামের কুঠার পৃথিবীকে তিনবার নিঃক্ষত্রিয় করলেও আবার যেমন তারা মাথা তুলে দাঁড়াত, তেমনি ফ্রান্সের বার বার বিদ্রোহ আজো পৃথিবী থেকে ধনীবংশ লোপ করতে পারে নি। আজো প্যারিসের রাজপথে বড় বড় প্রকাণ্ড গাড়ী ছুটে বেড়ায়। দুই তিন হাজার টাকা দামের কোট ঝোলে সজ্জিত দোকানের শো'কেসে। আর তার পাশ দিয়েই ছিন্ন মলিন দীনবেশ গরীবের দল বেড়ায় ঘুরে। অভাবের তাড়নায় স্বভাব তাদের নষ্ট।

প্যারিসের সবচেয়ে বড় রাস্তায় চৌমাথার উপরে, সহস্রের চোখের সামনে, লুকিয়ে চলে জুয়োর ব্যবসা। ব্যাঙ্কের সামনে থেমেছি, রসিদগুলোকে টাকায় পরিণত করতে। নামতেই একজন এসে চুপিচুপি বল্লে,—বিদেশী টাকা আছে? বিক্রী করবে? এরা পাউণ্ড নোট অফিশিয়াল দামের চেয়ে বেশী দাম দিয়ে কেনে। এত কড়াকড়ি, পাউণ্ড দেশ থেকে বেরোতে দেয় না। ট্র্যাভ্লারস্ চেক্ নিয়ে যেতে হয়। তবু লুকিয়ে পাউণ্ড নিয়ে এসে লোকে কিছু লাভ করে যায়। আমেরিকায় তো কোন বাধাই নেই। দেশ থেকে যত ইচ্ছে টাকা আনতে পারে। আমেরিকার টাকার দামও অনেক বেশী,—অফিশিয়াল দামের অন্তত চারগুণ।

কাজেই ওরা খুব আসে,—খুব টাকা আনে, সেই টাকা বিক্রী করে, এবং খুব খরচ করে চলে যায়।

আমেরিকার খাতির সর্বত্র। আমেরিকানদের জন্য আলাদা গাইড বই প্রভৃতি সুইজারল্যাণ্ডেও দেখেছি। আমেরিকার নাম
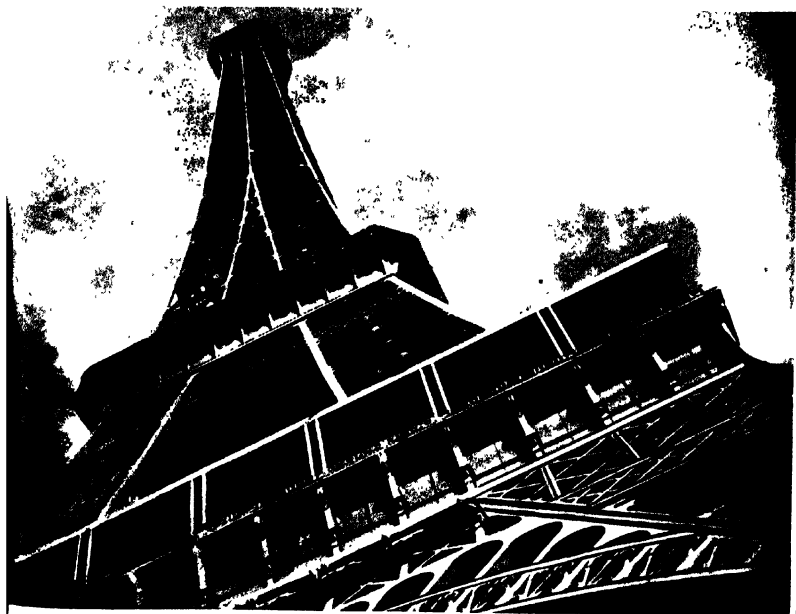
তুষার গলে পড়ছে .
সুইজারল্যাণ্ড

শুনলেই সব যেন লাফিয়ে ওঠে—ধনী আত্মীয়ের মত ইয়োরোপের সর্বত্র তাকে নিয়ে যেন কাড়াকাড়ির প্রতিযোগিতা চলে।

প্যারিস দর্শন শেষ হোল। যে নগরী একদিন ইয়োরোপীয় সভ্যতার নেত্রী ছিল, কত জ্ঞানী গুণী কত শিল্পী কত কবি দিনে দিনে যাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছিলেন, সেই প্যারিসকে দেখেছি। কিন্তু দেখেছি মাত্র, তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারি নি। আর তাকে যে দেখেছি সেও আমারি চোখ দিয়ে। আমার চোখে যতটুকু আলো পড়ে, তার বেশী সে দেখতে পায় না।

—আমি দেখেছি কালো পটের পরে, ক্বচিৎ আলোর দীপ্তি। কিন্তু আমার দৃষ্টি সেই কালো যবনিকা ভেদ করে যেতে পারে নি। সকল দুঃখ, আর্থিক ও মানসিক সকল দৈন্যকে অতিক্রম করে, যে শাশ্বত ফ্রান্স পূর্ণমানবতার পানে আজো তাকিয়ে আছে, তাকে হয়ত আমি দেখতেই পাইনি।

হেল্‌ভেশিয়া

১৪ই আগস্ট। আজ মধ্যরাত্রে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, আর আমরা কতদূরে! মনকে তো দেশকালের বন্ধনে বাঁধা যায় না, তাই আজ সমস্তক্ষণ মনটা ঘুরে মরছে উৎসবমুখরিত কলকাতার পথে পথে। ভাল লাগছে না এই 'কাস্টমস্'এর ব্যাপার—আজকের দিনে যদি দেশে থাকতে পেতাম!

এদিকে পর পর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, একটী একটী করে পার হচ্ছে ফ্রান্সের সীমানা। এত প্রশ্নোত্তরের কী যে দরকার জানি না। মানুষের পৃথিবীতে মানুষ কেন স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে না? মানুষের একটা বুদ্ধি দূরদেশকে যতই নিকটতর করে তুলছে, একদিক থেকে যতই তাকে কাছে টানছে, তার অন্য বুদ্ধিটা ততই তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, আর বিস্তৃত করে চলেছে পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান।

এদিকের পরীক্ষা শেষ করে সুইস মাটিতে প্রবেশ করি। যায়গাটার নাম 'বল'। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, আর চারপাশ থেকে কৌতূহলী দৃষ্টির ছুরি বিঁধছে আমাদের সর্বাঙ্গে। চোখ তুললেই, হয় তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়, নয়তো লজ্জিতভাবে মৃদুহাস্যে মাথা নাড়ে, খুকুকে দেখে হাত নাড়ে—খুকু বলে ওঠে—হ্যালো! তারা 'য়্যালা'—বলে হেসে ওঠে। দু' একজন গাড়ীর কাছে এগিয়ে এসে আলাপ জমাবার চেষ্টা করে। 'নো ফ্রাঁসাঁ' শুনে দমে যায়। আ-আঙলিয়া আ-উঙ্গ।

আমরা যে সময়ে চলেছি, সেইটে এদেশের ছুটীর মরসুম। দলে দলে লোক ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে চলেছে সুইজারল্যাণ্ডে,—ক্লান্ত শরীরটাকে একটু দম দিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে। আমরা কবে কোথায় যাব, কবে কোথায় আশ্রয় নেব, কিছুই তেমন করে ঠিক করা নেই,—শুধু এইটুকু স্থির আছে যে ইয়োরোপের হিমতীর্থটীকে দেখে নিতে হবে ভাল করে। কিন্তু এখানে এসে বোঝা গেল ইয়োরোপ ঠিক তীর্থযাত্রার উপযুক্ত নয়। এখানে প্রত্যেকটী জিনিষ নির্দিষ্ট হওয়া চাই। এখানকার মুহূর্তেরা কালসমুদ্রের স্ফুরণলীলা মাত্র নয়—এদেশের প্রতি মুহূর্ত পূর্ববর্তী মুহূর্তদের বিবেচনায় গড়া। আগে থেকে ব্যবস্থা করিনি তাই কোথাও যায়গা পাওয়া গেল না।

যতগুলো হোটেল ছিল সহরে, অভিজাততম থেকে দীনতম, সব দেখলাম ঘুরে ঘুরে। রাস্তা জুড়ে বড় বড় কোচ দাঁড়িয়ে আছে, চারদিকে লোক গিস্‌গিস্‌ করছে—আর আমরা হোটেলে ঢুকছি আর বেরিয়ে আসছি। 'সরি সার, সরি মাদাম্—জায়গা নেই'। এদিকে রাত হয়ে এল, ওদিকে রাতের আশ্রয় মিলল না। সমস্ত দেশটার ওপর ভক্তি চটে গেল যেন। কী এমন অপূর্ব যায়গা—সেই একই তো গাছপালা, বাড়ীঘর। শুধু গরমে আর ক্লান্তিতে কষ্ট হচ্ছে খুব। হোটেলে ভর্তি সহর অথচ কোথাও থাকবার উপায় নেই—এ কি বিড়ম্বনা। সবাই ফ্রান্সের সীমা পার হয়ে এসে এখানে রাত কাটাতে চায় এবং আমাদের মত এমন হঠাৎ কেউ আসে না। এদের প্ল্যান সব আগে থাকতে ঠিক করা, হোটেল সব আগে থাকতে 'বুক' করা। রাত নটা পর্যন্ত যখন শোবার ব্যবস্থা হোল না, তখন ঠিক করা গেল—এবারে কিছু খাবার আয়োজন করা যাক। না হলে সেটাও যাবে ফস্কে। অন্তরে যে ক্ষুধারূপা দেবী জাগ্রতা হয়েছেন, তাঁকে কিছু অর্ঘ দিয়ে শান্ত করেই আমরা চলব জুরিখের পথে।

"অন্ধকার রাতে অজানা পথ দিয়ে ছুটে যাব আমরা সুখশয্যা তুচ্ছ করে," উৎসাহ দিলাম সারথীকে। "রাখো তোমার কবিত্ব, সোজা ভাষায় বল না—ঘুম যখন কপালে নেই তখন ছোট।" "আহা এই তো বুঝলে না—কবি বলেছেন,—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,' আমরা বলব উল্টোটা—সুকোমল শয্যাতল, সে মোদের নয়।" এর মধ্যে সবচেয়ে সুখী খুকু। কারণ সে অনেকক্ষণ থেকে পিছনের সীটটী একলা দখল করে মাথার নীচে একটী কুশন দিয়ে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছে। এখন ওকে তুলে খাওয়ানো, ওরে বাবা, ভাবতেও ভয় করছে।

ইতিমধ্যে শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। ছোট্ট একটী রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া গেল। কালো পোষাকের উপরে সাদা লেসের এপ্রন পরা কর্ত্রী এসে হাত মুখ নেড়ে অনেক কিছু বকে গেলেও,—কি যে ওদের আছে, আর কি যে আমরা খাব, তা বোঝাও গেল না, বোঝানও গেল না। এদেশে এসেই কি কবি লিখেছিলেন —"অনেক কথা যাও যে বলে, কোন কথা না কয়ে, তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি।" এপাশে কোণের টেবিলে বসেছিলেন একটী সুন্দরী। বৈশিষ্ট ছিল তাঁর চুলে। সাধারণ মেয়েদের মত রংবেরঙের চুলের কুণ্ডলী ঝুলছে না। এর কালো মসৃণ চুল—মাথার মাঝখানে সিঁথি করে টেনে নিয়ে ঘাড়ের একটু উঁচুতে একটী চিকণ কালো বাংলা খোঁপা। অনেকক্ষণ ধরে আমাদের লক্ষ্য করছিলেন, এবারে আর থাকতে না পেরে তাঁর গোলগাল স্বামীটিকে নিয়ে উঠে এলেন আমাদের টেবিলে, বল্লেন, তিনি আমাদের সাহায্য করতে উৎসুক ;—কারণ তিনি লিত্‌লবিত্‌ ইংরিজি জানেন।

আমাদের খাদ্যসমস্যা থেকে উদ্ধার করে, একগাল হেসে ভদ্রমহিলা বলেন, ইয়ের স্তেত্‌ ইস্‌ ফ্রী তুদে। আই এম্‌ গ্ল্যাড্‌—ইত্‌ ইস্‌ ভেরী বেতর্‌ ইন্দীদ্‌। এতক্ষণ পরে

মুখে স্বাধীনতার কথা শুনে মন কেমন করে উঠল। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ মধ্যরাত্রির সীমানায় পৌঁছেছে। যে পতাকার জন্যে কাল পর্যন্ত লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, আজ সেই পতাকা দেশের প্রত্যেকটি ইংরেজি প্রতিষ্ঠানের মাথায় উড়ছে—একশ' বছরের স্বপ্ন আজ সার্থক হোল। কিন্তু যারা অসীম দুঃখ বরণ করে দীর্ঘদিনের তপস্যায় তিল তিল করে জীবন উৎসর্গ করে একে সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁরা আজ কোথায়? তাঁদের চরম বেদনার মূল্যে কেনা এই স্বাধীনতা ভোগ করবে কারা? যারা কোনদিন দেশের জন্যে সিকিপয়সাও ত্যাগ করেনি, যারা চিরকাল ভোগসুখে লালিত হয়ে, আজ স্বাধীনতার সুখটিও পুরোমাত্রায় দখল করতে বসেছে—এই সব আমাদের মত লোকেরা? বিশ্ববিধানে শিবঠাকুরের যে কন্যে রাঁধেন বাড়েন তাঁর কপালে আর খাওয়া নেই। তাঁর দিন রান্না করতেই বয়ে যায়। আর যিনি সারাবেলা আলস্যে কাটালেন তিনিই খেয়ে দেয়ে মুখ মোছেন।

এদিকে ভদ্রমহিলা অনর্গল বকে যাচ্ছেন। তাঁর স্বামীটির বেশ চেহারা—এখানকার ঘী দুধ মাখন খাওয়া নাদুস-নুদুস। নিজে ফ্রেঞ্চ ছাড়া কিছুই জানেন না, তাই বিদুষী স্ত্রীর সাহচর্যে তাঁর মুখ মাঝে মাঝে বেশ চক্ চক্ করে উঠছে। ইয়োরোপের সর্বত্রই বিভিন্ন ভাষা জানা একটা গর্বের বিষয়। ইংরেজ যেমন ইংরেজী ছাড়া আর কিছু শেখা প্রয়োজন মনে করে না, অন্য ভাষার প্রতি কেয়ারও করে না—এদের সে কম্‌প্লেক্স নেই। খাওয়া শেষ হলে অনেক ধন্যবাদ দিলাম,—"এবার চলি?"

মেয়েটি বল্লে "কোথায় থাকছ?"

"সম্ভবত পথেই।"

"সে কি? কেন"? এক সঙ্গে অনেক প্রশ্ন। "ওঃ হো আগে থেকে বুক করো নি? আচ্ছা একটু বসো, আমি দেখছি।"

মিনিট কুড়ি ধরে অজস্র টেলিফোন করে এসে ভদ্র মহিলা বল্লেন—"তোমাদের হোটেল ঠিক করেছি—এই নাও ঠিকানা—সহরের বাইরে জুরিখের পথেই পড়বে। তোমাদের জন্যে নদীর ধারে ঘর ঠিক করতে বলেছি।"

পূর্ণিমার কাছাকাছি শুক্লপক্ষের কোন একটী তিথি বোধহয় হবে। পাশ দিয়ে বয়ে যায় রাইন নদী। চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে চারিদিক—দেশটা যে বিলিতি সেকথা মনেই হচ্ছে না। ঐ নদীটার নাম অনায়াসেই হতে পারত গেঁয়োখালি কিম্বা ইচ্ছামতী। রাস্তাটা ক্রমশ সরু হয়ে ছোট একটা শহরে ঢুকে পড়ে।—এই ত সেই—রাইন ফেলডন। তাতো হল, এখন হোটেলটা কোথায় খুঁজে পাব। রাস্তায় জনমনিষ্যি নেই—সব যে যার ঘরে লেপের নীচে, শুধু আমাদের ছোট গাড়ীটা আবছা আলোয় হেডলাইট ফেলতে ফেলতে সরুগলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

পথের একদিকের দোকানপাতির দরজা বন্ধ। অন্যদিকে প্রকাণ্ড এক দেয়াল চলেছে। এত বড় বাগান-ঘেরা বাড়ী কার?—"প্রত্যেকটা গেটের ওপর টর্চের আলো ফেলে দেখ", আদেশ করলেন সারথী। এতক্ষণে দেয়ালের একটা দিক শেষ হোল—প্রকাণ্ড গেট—ভেতরে আলো জ্বলছে। খুট্ করে টর্চ টিপলাম—বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা—আরে এইতো আমরা খুঁজছি।—কি কাণ্ড! এ যে বিশাল ব্যাপার। প্রকাণ্ড বাগান, একেবারে যাকে বলে রোম্যান্টিক। বড় বড় গাছের নীচে বসবার আসন—দূরে দেখা যায় সবুজ ঘাসে ঢাকা টেনিস লন, ওপাশে ফলের বাগানে, গাছের মাথাগুলি দুলছে। আলো পড়ে এপ্‌লফুলগুলি ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে, এদিকে রঙীন ফুলের কুঞ্জের নীচে লুকনো আছে বন্যা-আলো। সেই আলোর বন্যায় আর চাঁদের মায়ায় সমস্ত জায়গাটা অপার্থিব মনে হচ্ছে। একেই কি বলে নন্দনকানন! স্পষ্ট বুঝতে পারছি, কেন এসব দেশে এসে ছেলেদের মাথা ঘুরে যায়।

যদি ওই পুষ্পকুঞ্জের নীচে দাঁড়িয়ে কোন অপ্সরী তার সোনালী চুলের ফণা দুলিয়ে, এই রহস্যময় আলোয়, তার স্বপ্নভরা চোখ তুলে কোন বিদেশী তরুণের দিকে তাকায়, তবে সে তরুণের মাথা ঠিক রাখাই অন্যায়—তার যৌবনধর্মের অপমান। 'এপল-অর্চার্ডের' পাশ দিয়ে দেখা যায় রাইন নদী বয়ে যাচ্ছে,—আর সেইখানে লতাকুঞ্জের মাঝে ছোট্ট একটু সাদা সেতু—সর্বদা সশস্ত্র সৈন্য পাহারা দিচ্ছে তাকে। কারণ এ নদীর পরপারে জার্মানী। এখনও সকলের জন্যে জার্মানীর দ্বার উন্মুক্ত নয়।

অনেক কার্পেট মোড়া, মখমলের গদী আর কুশন দিয়ে, ফুল আর পুষ্পপাত্র দিয়ে সাজানো সব ঘর আর বারান্দা, করিডর আর কর্ণার পার হয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢুকলাম। হোটেলের কর্ত্রী এসে বললেন,—"আপনাদের সঙ্গে তো ছোট বাচ্চা আছে, তার জন্যে পাশের একটা ঘর ঠিক করেছি।"—"না না, এইখানেই ওর খাটটা এনে দাও—এখানেই শোবে।"

এতবড় প্রকাণ্ড ঘর, তিনটে বেশ ভাল মাপের ঘর যার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে, সেই ঘরেও ছোট্ট খুকুর শোবার যায়গা হবে না?—লোকটা বলে কী? ম্লেচ্ছ কিনা,—কত আর বুদ্ধি হবে? বিদেশে হোটেলে এসে ছোট বাচ্চাদের পাশের ঘরে রেখে, এদেশের মাতৃদেবীরা যদিও বেশ আরামে ঘুমোন, আমি তা পারব না।

বিশাল ঘরে শ্বেতপাথরের মেজে, তার উপরে এখানে ওখানে রঙীন কার্পেট, সোফা, ডিভান, চেয়ার, টেবিল, আলমারী আধুনিকতম সজ্জা টেবিল—কী নেই? কিন্তু সবচেয়ে চমৎকার বিছানা দুটি। নীচু স্প্রীঙের খাটে দেড়ফুট উঁচু নরম বিছানা। সারা দিনের ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত আমাদের বেশবাস। প্রকাণ্ড আয়নায় ছায়া পড়েছে। একবার সেই প্রতিবিম্বের দিকে আর একবার বিছানার দিকে তাকিয়ে সঙ্কোচে সরে এলাম। আগে স্নান সেরে নিতে হবে। স্নানটান সেরে যখন রাত সাড়ে বারটায়

শুতে এলাম, তখন ঈশ্বর বলে সেই যে একজনের কথা শুনতে পাই, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। যখন মনে মনে ভেবে রেখেছি সারারাত এই ঠাণ্ডায় ওঁকে গাড়ী চালাতে হবে আর শীতে বেচারীর আঙ্গুলগুলি অসাড় হয়ে আসবে, তখন কে জানত যে আমাদের জন্যে এমন দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

বড় বড় কাঁচের জানালার ক্রীম-রঙের ভারী পর্দাগুলি সরিয়ে দিয়ে বিছানার মধ্যে একেবারে আধহাত গভীরে ঢুকে গেলাম—আর চাঁদের আলোর ঝরণা নেমে এল আমাদের ঘরে, সাদা চাদরের উপর আর সাদা সাটিনের পালকের লেপের ওপর রাশিরাশি যূঁইফুলের মত ঝরে পড়ল, আর তার সঙ্গে মিশে গেল রাইনের মৃদু গুঞ্জন।

দিন সাতেক ঐ উপত্যকায় কাটিয়ে আবার আমরা পাহাড়ের উদ্দেশে পাড়ি দিই। রাস্তা যদিও এক এক জায়গায় খুব খাড়াই, তবু পিচে বাঁধানো বলে চালাতে বেশি কষ্ট হয় না। একটার পর একটা পাহাড়ী গ্রাম সব পার হয়ে চলেছি। কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা চলে অনেক জায়গায়—তবে এখানকার লোকেরা কাশ্মীরের মত তীক্ষ্ণ সুন্দর নয়। এরা বেশ মোটা সোটা গোলগাল। ছেলেদের চুলগুলি কদম ছাঁটা। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের তুলনায় এদের জীবন অনেক বেশী সরল ও অনাড়ম্বর। ইংরেজদের মত ঘোরতর গো-খাদক ত এরা নয়ই, এমন কি মাংসও খুব বেশী ভালবাসে না। দুধ, মাখন, ক্রীম, পনির এই সব খেতে খুব ভালবাসে।

গাঁয়ের সরু সরু বাঁধানো পথে কিম্বা গোচারণ মাঠে, ফুটফুটে চেহারা, টুকটুকে গাল, বাচ্চারা খালি পায়ে বেড়াচ্ছে ঘুরে। গ্রামের মাঝখানে ছোট একটি স্কোয়ার—তেকোণা একটু

ঘাসে ঢাকা জমিতে, হয় ক্রুশবিদ্ধ যীশু নয়ত শিশু কোলে মেরীর মূর্তি। কোথাও পাহাড়ের উপরে ছোট একটা চার্চ। প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীর সঙ্গেই একটু করে ফুলের বাগান,—নেহাৎ যাদের নেই তাদেরও জানালার নীচে ফুলের গাছ সাজানো।—দেয়ালে নানা ধাঁচের আল্পনা ও ছবির ফ্রেস্কো। তাদের মধ্যে অনেকগুলি একেবারে আমাদের দিশী নক্সার মতো। আর লোকগুলি সব সময় হাসিমুখে সাহায্য করতে উৎসুক। এদিকের লোকেরা যথেষ্ট পরিশ্রমী, অথচ ন্যাকামির আতিশয্য নেই।

আল্পসের নীচু সারির মধ্যে দিয়ে চলেছি। হাজার চার ফুটের বেশী উঁচু নয়। কিন্তু পাহাড়গুলো কেমন অদ্ভুত।—অনেক উঁচু হয়ে হঠাৎ কেমন যেন শেষ হয়ে যায়। হিমালয়ে যেমন শ্রেণীর পর শ্রেণী ঢেউএর মত পাহাড়ের সমুদ্র—মনে হয় যেন তার শেষ নেই। এখানে সেরকম নয়। কয়েকটা গ্রাম পার হয়ে একটা পাহাড়ে নদীর উপত্যকায় এসে পৌঁছানো গেল। কী এর নাম জানি না—কোথাও জনমানবের চিহ্ন নেই, বড় বড় পাইন গাছ, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত বিশাল প্রস্তরখণ্ড, আর তারপরেই সবুজের উঁচু নীচু তরঙ্গ। মাঝে মাঝে বাবলা জাতীয় গাছ। ধূসর রঙের মোটা মোটা গরুর দল ঘুরে বেড়ায়—এত মোটা যে, যেন নড়তে পারে না, একেবারে গজেন্দ্রগামিনী হয়ে চলে। আর তাদের গলায় বাঁধা মস্ত বড় বড় ঘণ্টা বাজে ঠং ঠং। অনেক দূর থেকে সে ঘণ্টার মিষ্টি আওয়াজ মাথার মধ্যে রিন্ রিন্ করে বাজতে থাকে, মনে পড়িয়ে দেয় সেই আমাদের বাংলা দেশের গ্রামগুলিকে। আর সেই ঘণ্টার তালে তাল মিলিয়ে, পায়ে পায়ে নুড়ির মল বাজিয়ে ছোট নদী চলেছে বয়ে। যেন ছোট্ট একটা মিষ্টি মেয়ে, নূপুর-পরা পায়ে আর কাঁকন পরা হাতে চলেছে ছুটে। পাশেই একটা উইপিং উইলো নদীর ওপরে প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছে। এখানে নদীর ধারে বসে আমরা

সঙ্গে আনা কিছু খাবার খেয়ে নিলাম, নদীর জলে হাত পা নিলাম ধুয়ে।

কুরফুরষ্ট্রান্ বলে একটা জায়গায় এসে মস্ত উঁচু পাহাড়টার আড়ালে সূর্য গেল ডুবে। ছোট একটা সাধাসিধে পান্থনিবাসে রাত কাটাবার ব্যবস্থা ঠিক ছিল। এবারে ভ্রমণ প্রোগ্রাম রীতিমতো মাইল মেপে করে নেওয়া গেছে।—রাত্রিবাসের ব্যবস্থা সব আগে থেকে ঠিক। বাড়ীটার পিছনে প্রকাণ্ড কালো পাহাড়টা অন্ধকার রাতে একটা দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে—একেবারে সোজা উঠে গেছে, ধূসর মলিন আকাশটাকে ঘন কালো কালির আঁচড়ে কেটেছে পিরামিডের মতো। পাশেই একটা ছোট স্টেশন কেমন যেন ঝিমিয়ে রয়েছে। হোটেলের উঠোনটার আর বাড়ীর থামের সঙ্গে আর গাছের সঙ্গে তার বেঁধে আলো জ্বালানো হয়েছে, সেখানে সব চেয়ার টেবিল পেতে বসে গেছে, মদের স্রোত চলেছে। আর মাঝে মাঝে বিকট উল্লাসধ্বনি চারিপাশের স্তব্ধতাকে গলা টিপে মারছে। সব মিলিয়ে জায়গাটা অত্যন্ত অবসাদ-দায়ক। সেই অনেক দূরের দেশের ফেলে-আসা একটা বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে। উঠেছি খুব ভোরে। যেতে হবে অনেকদূর। প্রথমে সাত হাজার ফুট উঠে, একটু নেমে আবার দু-হাজার ফিঠ উঠলে সেণ্ট মরিৎস্। সেখানে আজ রাতে পৌঁছাতেই হবে। ধীরে ধীরে সুরু হয়, যাকে সত্যি বলা যেতে পারে পাহাড়ে রাস্তা। একেবারে খাড়াই উঠে গেছে। বরফের নীচে বছরে আট মাস থাকে বলে পীচগুলো সব ধুয়ে গেছে—পাথরের গুঁড়োয় পিছল পথ ঘুরে ঘুরে কোথাও বা নেমে গেছে সোজা। চাকার নীচে পাথরগুলো সরে সরে যাচ্ছে। বরফের নীচে মরে যাওয়া ফ্যাকাশে ঘাস।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছোট একটু ফাঁক। এই ফাঁকটুকুর নাম 'ফ্লুয়েলা পাস'। সেখানে গাড়ীটাকে রেখে নেমে দাঁড়াই। একদিকে প্রকাণ্ড পাহাড়। তার মাথার ওপরে, আর বরফের

ছাপলাগা সাদাটে রঙের গায়ের খাঁজে খাঁজে তুষার স্তূপ জমে আছে। তা থেকে বহু শীর্ণ জলধারা নেমে এসেছে যেন পাহাড়ের নীল গায়ে খড়ি দিয়ে আঁকা বাঁকা সরু সরু লাইন কেটেছে কেউ—কোন মস্ত শিশুর মস্ত খেলা।—এপারে খোলা ঢালু গড়ানে পাথরের জমি। ঐ দেখা যায়, দূরে, অনেক নীচে ছোট্ট একটী গ্রাম, তার পাশ দিয়ে শীর্ণ জল রেখা। পপ্‌লার গাছের শ্রেণী, আর তার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে কোথাও ছোট্ট একটা খাদ অথবা ঝরণার ঝিরঝির ধারা। দার্জিলিংএর মতো একেবারেই নয়। দার্জিলিংএর দিকের প্রত্যেকটী পাহাড় উদ্দাম সবুজ অজস্র বন্যপ্রাণের প্রাচুর্যে উপচে পড়ছে। এখানে বিধাতার প্রসাদের উপর মানুষের হাতের ছোঁয়া লেগেছে—যেন সুন্দরী মেয়ের প্রসাধিত মুখ। প্রকৃতির রূপকে এরা সর্বক্ষণ মেজে ঘসে রাখে। কারণ সেই রূপই যে এদের প্রধান মূলধন। সেই রূপের আকর্ষণেই দলে দলে লোক পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে।

দেখতে দেখতে পাহাড়টা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল।—একেবারে মাথায় চড়ে বসেছি। পাহাড়ের চূড়োর ওপরে বেশ একটু চওড়া যায়গা। শীতকালে এ সমস্ত যায়গা বরফে ঢাকা থাকে—আর পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে উত্তেজনালোভীর দল আসে খেলতে। St. moritzকে কেন্দ্র করে এ সব জায়গা তুষার ক্রীড়ার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়। এখানে বসে গাড়ীটাকে একটু বিশ্রাম দিতে হবে, যন্ত্রের মধ্যে দিতে হবে ঠাণ্ডা জল। ওর ভেতর থেকে একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে, যন্ত্রটা হাঁপিয়ে উঠেছে যেন।

এদিকে তাকিয়ে দেখি আমাদের প্রয়োজনের জন্যই যেন পাশে একটা ছোট্ট সাদা বাড়ী। তার ঢালু সবুজ ছাদে এখনো বরফ লেগে রয়েছে। ভারতবর্ষ হলে এমন সুন্দর যায়গায়

এমন অপূর্ব পরিবেশে শৈল শিখরে তৈরী করত একটী মন্দির। দলে দলে লোক অগম্য পথ পার হয়ে সমস্ত শরীর দিয়ে পথশ্রমকে অনুভব করে এবং মন দিয়ে তাকে অস্বীকার করে, সেখানে উপস্থিত হত, আর তাদের চোখের সামনে যখন মন্দিরের দ্বার খুলে যেত, তখন তারা মনে করত তাদের জীবন ধন্য।

পূর্ব ও পশ্চিমের জীবনধারার আদর্শ একেবারে বিপরীত। যেখানে যত ভাল যায়গা আছে, পাহাড়ের চূড়ায়, আর নদীর কিনারায়, সর্বত্র ভারতবর্ষ তৈরী করে মন্দির, আর ইয়োরোপ তৈরী করে হোটেল, কিম্বা কাফেখানা। শরীরকে আরাম দেওয়াই ইয়োরোপের আশা, দেহের মধ্যে দিয়েই সে মনকে ছুঁতে চায়। ভারতের লক্ষ্য দেহকে তুচ্ছ করে, মনকে আনন্দ দেওয়া।

একটী ছোটখাট সাদা মানুষ বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। আমাদের যা কিছু প্রয়োজনের সমস্যা সমাধান করে, ভদ্রলোক, হ্যাম ও টম্যাটো পূর্ণ ধূমায়মান বৃহৎ অমলেট ও এপল্‌ক্রীম নিয়ে এলেন।—ভাগ্যে এখানে চার্চ না থেকে হোটেল আছে। আমাদের খেতে দিয়ে ভদ্রলোক এসে বসলেন।

"ভারী চমৎকার যায়গা", বল্লাম আমরা।

"নাম কী জান?" ভদ্রলোক বললেন—"ডেভস্—অর্থাৎ দেবস্—দেবতাদের বাসস্থানের মত রমণীয় যায়গা কিনা, তাই এই নাম।"

"বাঃরে!" ভীষণ ভাল লাগল, "আপনি সংস্কৃত জানেন?"—

"একটু একটু", লজ্জিত হলেন মস্যেঁ, বললেন, "তোমাদের দেশের কথা বল, গান্ধীর কথা বল।—তিনি কিন্তু একটু অদ্ভুত লোক, নয় কী?" একটু মুচ্‌কি হাসলেন ভদ্রলোক।

"কী হিসেবে বলছ একথা?"

"নইলে অহিংস যুদ্ধ কি করে বলেন। অহিংসা এবং যুদ্ধ দুটো দুই বিপরীতধর্মী কথা।"

"কেন,—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এই যুদ্ধ, অপরকে মারবার জন্যে নয়।"

"কিন্তু তোমাদের গীতায় তো অহিংসার কথা নেই।"

"ও তুমি গীতা পড়েছ?—ইংরিজি অনুবাদ?"

—"না, জার্মান অনুবাদ, তাছাড়া মূল সংস্কৃত থেকেও পড়েছি। সেই জন্যেই তো ভাবি, গান্ধীজী যদি অহিংসপন্থী, তবে বৌদ্ধ না হয়ে গীতায় বিশ্বাসী হলেন কেন—গীতা তো যুদ্ধের বিজ্ঞাপন।"

—"তাই নাকি? গীতা পড়ে এই বুঝেছ তুমি! গীতায় সকল প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে বলেছে—হিংসা তো অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, হিংসার বলি সবার আগে। কাজ করতে হবে তাই কাজ করো, সুখের আশায় কোর না। Art for art's sake ইত্যাদি সব কথা আজকাল শোনা যায় এদেশে, গীতায় অনেকদিন আগেই সেকথা বলেছে। কাজের জন্যই কাজ, ধর্মের জন্যই ধর্মপালন কর। ধর্ম সুখ সম্পদ্ আহরণের উপায় নয়। যুদ্ধ কর লোভের জন্য নয়, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালনের জন্য। শরণাগতকে রক্ষার জন্য, পাপের ধ্বংসের জন্য, পুণ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করে প্রাণ দাও এবং নাও—হিংসার বশে অথবা লোভের তাড়নায় কোন কাজ কোর না। হিংসা অহিংসার কথা দূরে থাক গীতায় তো মৃত্যুই সবচেয়ে তুচ্ছ হয়ে গেছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়াবেগ ও স্থুল প্রবৃত্তি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে না গেলে, মানুষ কখনই এমন স্তরে এসে পৌঁছতে পারে না যেখান থেকে জীবন ও মৃত্যুকে একেবারে এক করে দেখতে পাওয়া যায়, যেখান থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে এ দুটো দুই অবস্থামাত্র,—একই সৃষ্টি-লীলার দুই প্রকাশ, একই নৃত্যের দুই পদক্ষেপ, একই আত্মার দুই রূপ। যাই হোক গীতার ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত আমরা নই, আর তা এমন এক কথায় হবার নয়, তবে তুমি যদি সত্যি উৎসুক হও তাহলে, গান্ধীজি নিজে গীতার যে টীকা ও অনুবাদ করেছেন সেইটে

পড়, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে, গান্ধীজী তাঁর মন্ত্র গীতা থেকে পেতে পারেন কিনা।"

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ ভদ্রলোকের যথেষ্ট জানা আছে, আরো জানবার অসীম কৌতুহল।—"তোমাদের টাগোর, গান্ধী, বিবেকানন্দর কথা বল—ভারতবর্ষে আমি একবার যাব, সেই ভারতবর্ষ, যেখানে ভেদস্ লেখা হয়েছিল।"—এই সুদূর আল্পস্ শিখরে এক সাধারণ বিশ্রামাগারে যে এমন একজন শিক্ষিত লোকের দেখা পাব —যে এখনও অবসরকালে সংস্কৃত চর্চা করে—সেকথা কখনও ভাবিনি।

সেণ্ট মরিৎস্ জায়গাটী ছোট, কিন্তু টুরিস্টদের আড্ডা। এত জনপ্রিয় যায়গা বলেই যাত্রীনিবাসের চড়া দামে যাত্রীদের প্রাণান্ত। এখান থেকে বহু হাঁটাপথ আল্পসের বিভিন্ন শিখরচূড়ার দিকে উঠে গেছে। ভোরে উঠে দেখি দলে দলে লোক, মোটা পাইকের জুতো পরে, কাঁধে বিলিতী ঝুলি ঝুলিয়ে চলে গেল। আমাদেরো মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে হেঁটে যেতে। কিন্তু সময় নেই, সঙ্গে ছোট মেয়ে। একদল আমেরিকান এসে উঠেছে এখানে।—তারা কাল হেঁটে যাবে engadine-এ, আর বেচারা আমরা যাব ট্রেণে। সেখানে মোটর যাবার রাস্তা নেই। বিদ্যুৎ অনেক কারসাজী করে ট্রেণকে তোলে টেনে। এই দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে বেশী লাফাচ্ছে, আর নিজের ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা বলছে, তার পরণে হাঁটু অবধি টাইট একটা চীনে পাজামা আর ওপরে ছোট্ট একটু রঙীন ব্লাউজ উদ্ধত যৌবনকে শাসন করবার ভঙ্গী করছে মাত্র। আশ্চর্য—ওর শীত করছে না? মেয়েটী এত বেশী পাহাড়ের কথা বলছে, তবু তার ঢঙে ঢাঙে চলনে বলনে, হাসিতে কটাক্ষে নিছক ভ্রমণের আনন্দের চেয়ে নিজেকে দেখাবার সুখটাই প্রবল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে বেশী।

ভোরে উঠে তৈরী হয়ে নিলাম। খুকু তার ছোট্ট দস্তানাদুটী

বারবার ঠিক করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখছে—'গ্লেশিয়ার কী? কেন সেখানে বরফ গলে যায় না'—ইত্যাদি প্রশ্নে ব্যাকুল, নদীর জন্ম দেখতে পাবার আশায় অধীর। খুকুর মা বাবারও সেই দশা। ট্রেণে এসে বসা গেল। উপত্যকা পার হয়েই পাহাড়ে চড়ে বসল ট্রেণটা, আর একেবারে সোজা পাহাড়ের গা বেয়ে টিকটিকির মত এগোতে লাগল, গতি কিন্তু অতি ধীর, প্রায় হেঁটে ওঠার মতই। ছোট ছোট কয়েকটা স্টেশন পার হয়ে এক যায়গায় এসে ট্রেণ থামে। নীচে দেখা যায় একদল লোক উঠছে হেঁটে। খুকুর বাবার উৎসাহ আর বাধা মানল না। ট্রেণের চালক কনডাক্টরদের সঙ্গে আলোচনা করে জানা গেল, হেঁটে উঠতে লাগবে ২॥ঘণ্টা, আর ট্রেণ পৌঁছবে একঘণ্টা পরেই। অতি ধীরে চলে বলেই এত কম পথ যেতে এত সময় লাগবে। "তবে আমি চলি, দেড় ঘণ্টা তুমি ও খুকু অনায়াসে কাটিয়ে দেবে।" ওঁর অদম্য উৎসাহে বাধা দেওয়া গেল না—

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে পাহাড়ের খাঁজে দাঁড়িয়ে দলটাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন, হোই হোঃ—ওরা ফিরে দাঁড়ালো। উনি নেমে চলে গেলেন, পায়ে পায়ে অনুভব করতে আল্পসের হৈমসত্ত্বা।

এদিকে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফ লেগে রয়েছে, আর সেই বরফ গলা জল নীচে দিয়ে নদীর আকারে কখনো যাচ্ছে বয়ে, কখনো বা যাচ্ছে পাথরের রাশির মধ্যে হারিয়ে। পাহাড়ের মাথাগুলি শুকনো ধূসর আর নীচের ঢালু জমিতে সবুজের বন্যা। বরফগলা জলধারা যে সব পথ দিয়ে নেমে গেছে একদিন, তাদের সেই পথরেখা গভীর দাগ কেটে দিয়ে গেছে পাহাড়ের পাথরের বুকে। এই ধরণের অদ্ভুত সব সুন্দর যায়গা পার হয়ে ট্রেণের যাত্রা হয় শেষ—সামনে তাকিয়ে দেখি, এ কী ব্যাপার—'কী অপূর্ব শোভা তোমার—কি বিচিত্র সাজ।'

সামনের পাহাড়ে ধূধূ করছে বরফ, মসৃণ সাদা ঝক্‌ঝক্

করছে, আর আলো পড়ে অজস্র রং জলে উঠছে। তুষার রাশির মধ্যে থেকে রোদে গলে নেমে এসেছে কয়েকটা শীর্ণ জলরেখা। তিনচারটে জলধারা একত্র হয়ে একটা প্রকাণ্ড পাথর টপকে ঝরে পড়ে নীচে, একটা ছোট লেকের মত তৈরী হয়ে নদী হয়ে বয়ে যায় ও পাশ দিয়ে। ঝরণার জল পড়ে হ্রদের মত যা তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে কেমন একটা অদ্ভুত ঘনত্ব, যেন গলিত আইস-ক্রীম। খুকু পাগলের মত 'নদী' কবিতা বলছে—

"তার মাথার উপরে শুধু
সাদা বরফ করিছে ধূধূ,
কবে একদা রোদের বেলা—
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা
তাই ঝুরুঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধিরি ধিরি"।

এদিকে রূপোর মত ঝলমলে সাদার উপরে, সূর্যের আলো পড়ে অবিশ্রান্ত নানা রঙের ঝরণা যাচ্ছে খেলে, অন্য দিকে পাহাড়ের মাথায় মাথায় মেঘ করেছে কালো। পাহাড়ের নীল, আর আকাশের কালো, মিলে গেছে কেমন একটা পেলব রংএর কালি-মায়,—তার সঙ্গে মিশে গেছে ওপারের নদীর জল ঘন সবুজ। কোন দিকে দেখব—প্রতি নয়নক্ষেপে নূতন রূপ ফুটে উঠ্ছে। ওই পাহাড়ের শুভ্র ইঙ্গিত যা মানুষের মনকে সৌন্দর্যানুভূতির চরম সীমায় টেনে নিয়ে যায়, তা প্রত্যহ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তার পরেও অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে, কোন মুগ্ধ দৃষ্টির অপেক্ষা না রেখেই আপনা আপনিই প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য নূতন রূপে ফুটে ফুটে ঝরে যাচ্ছে। বিধাতার সৃষ্টিতে দানের তো কোন হিসাব নেই। এত অজস্র অপব্যয়, সৌন্দর্যের এই প্রচুর সমারোহ, তবু তার মধ্যে মানুষের মন কেন আসক্তির পাঁকে বাঁধা? লোভের

সীমা নেই। সবটাই এক সঙ্গে দেখতে হবে। সব কিছুই নিতে হবে, মনে করে রাখতে হবে, ক্লান্ত চোখ ভুলে যায়। যন্ত্রের চোখে যা পারি রাখছি তুলে। সে মাধুরী, সে পরিবেশ, সে মোহময় মায়া-লোকের স্বপ্ন, চোখে দেখে যার আশ মেটে না, মন যাকে বেশীক্ষণ বহন করতে পারে না, ক্যামেরার সাধ্য কি তার সন্ধান দেয়।

ছুটীর দিন ফুরিয়ে এল। এখন চলেছি ইণ্টারলকেনে। সেখান থেকে 'ইয়ুংফ্রাউ'এর বিশাল তুষারবক্ষে আরোহণ করব—আর তারপর?—ফিরে যেতে হবে—মহাদেশ থেকে লণ্ডনে, আর লণ্ডন থেকে কলকাতায়।

রাস্তা উঠেছে খোঁপার কাঁটার মত বেঁকে। পাশ দিয়ে হু হু করে ছুটে যায় গাড়ী, আর যেসব গাড়ীতে G. B. মার্কা তাদের ভিতর থেকে একটা উল্লাসধ্বনির সঙ্গে রুমাল উড়তে দেখা যায়। সমপথযাত্রীদের পরস্পরের প্রতি এই সোল্লাস-স্বীকৃতি বেশ লাগে। 'জুলিয়ান', 'ওবরল্ল' আর 'সাস্'—তিনটী পাস পার হতে হবে। আহা, কেন যে এগুলোকে পাস্ বলা হয়! চমৎকার চওড়া রাস্তার পাশে ফলকের পরে নাম আছে লেখা। হয়ত কোনকালে দুই দুরধিগম্য শিখরচূড়ার মাঝে ছোট্ট একটু সরুপথের চিহ্ন ছিল। আজও সেই পথ সেই দূরকালের নামের স্মৃতি বহন করে আসছে।

আল্পসের এই শ্রেণী সাত হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—তবু বরফ-ঝরা ঘাসের রঙে কেমন একটা মৃত পাণ্ডুরতা। গাছগুলিতে কিন্তু বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। এর উপরের স্তরের আল্পস বৃক্ষহীন চিরতুহিনাবৃত।

অদ্ভুত এই ছোট্ট দেশটী—যেন পুরোপুরি একটা ছোট ইয়োরোপ। ইয়োরোপের প্রধান তিনটী ভাষাই এখানে চলে—ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালীয়ান। ইয়োরোপে যতরকম আবহাওয়া সম্ভব, সব এখানে আছে। এদেশের 'লাগো' প্রভৃতি

জায়গায় মধ্যসাগরতীরসম্মত চিরবসন্তকাল। সেখানে ভুট্টা আর গমের খেত, পাম গাছের সারি আর চেষ্টনাটের ছায়া, আর আঙুরলতার কুঞ্জ। আবার ন' দশ হাজার ফুট উপরে, জলহীন, বৃক্ষহীন, অনন্ত তুষার মরু। আর এই তিন হাজার থেকে ৬।৭ হাজার ফুটের মধ্যে, যত পাইনগাছের মেলা, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে সবুজ ঘাসের সমারোহ। এইখানেই বেশীরভাগ গ্রাম ও সহর।—যত চাষীদের বাস। আস্তাবল ও গোয়ালের উপরতলায় তাদের মোটা মোটা কাঠের কুটীর লতাকুঞ্জ দিয়ে ঢাকা। কাঠের খুঁটি-গুলোতে ঝুলছে অর্কিড্ কিম্বা জিরেনিয়ামের গুচ্ছ। এখানকার মেয়েরা ছোট ছোট তাঁতে কত পশমের কম্বল, রেশমের নক্সাকাটা চাদর, খদ্দরের মত মোটাসূতোর বেডকভার তৈরী করে। আর তার ওপরে করে অসংখ্যরকম ছুঁচের কাজ। সে কাজগুলির সঙ্গে আমাদের দিশী হাতের কাজের আশ্চর্য মিল, যেমন কল্কা অথবা পদ্মলতার মত লতা। লুসার্ণে একটা দোকানের কাঁচের জানলায়, ঝুলছিল একটা চাদর। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম সে দোকানে, কী আশ্চর্য, ভারতের কুটীর শিল্প এতদূরে রপ্তানি হয়?—উত্তর এল —'না না, সুইস্ মেয়ের হাতের তৈরী এই চাদর।'

ইণ্টারলকেন হচ্ছে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের পোষা জায়গা। কোন হোটেলে তিলধারণের স্থান নেই—ভাগ্যে আমাদের আগে থেকে জায়গা ঠিক করা ছিল। হোটেলে ঢুকে দাম শুনে যদিও মুখ শুকিয়ে আসে, তবু অস্বীকার করবার যো নেই যে, যায়গাটা দর্শনীয় এবং উপভোগ্য বটে। এমন যায়গার এমন দাম না হলেও যেন মানাত না। একেবারে বুর্জোয়া ব্যাপার, যাকে বলে। ট্যুরিষ্টদের আড্ডা, তাই জায়গাটা অসংখ্য ছোট ছোট দোকানে ভর্তি। আর কি সুন্দর সব খেলনা, কাঠের কত ছোটখাট জিনিষ, কাশ্মীরের মত নক্সাকাটা, আর তার সঙ্গে বিলিতী মিস্ত্রীর যান্ত্রিক বুদ্ধি মিলেছে। ছোট্ট একটা চাষবাড়ী, আল্পনা আঁকা, কাগজের

রঙীন ফুল ঝুলছে। পাশেই একটা বোতাম টিপলে বাড়ীর ছাদটা খুলে গেল, ওমা। একটা বাক্স—তাতে চকোলেট ভর্তি—আর ভেতর থেকে মিষ্টি একটা সুর জলতরঙ্গের মত বাজছে। প্রায় সব বাড়ীতেই একটা করে 'কুকু' ঘড়ি আছে।—খুকুকে সবাই ডেকে নিয়ে যায় তাদের ঘরে,—দেখ, আমাদের ঘড়ি তোমার নাম ধরে ডাকে।

কত অজস্র রকম ঘড়ি, আর তাতে কত বিচিত্র কল-কৌশল। কোন ঘড়িতে কোকিল এসে কুহুধ্বনি করে ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কোনটায় টুপিমাথায় হাঁস এসে ড্রাম বাজিয়ে যায়। খুকু তো ঘড়ির কেরামতি দেখে একেবারে 'থ'। খুকুর বাবারও সেই দশা এদের বৈদ্যুতিক কেরামতি দেখে। সমস্ত দেশ থেকে কয়লার ট্রেণ তুলে দিয়েছে,—সর্বত্র ইলেকট্রিক। পাহাড়ের গা বেয়ে একেবারে সোজা এরা ট্রেণটাকে তুলে দেয় অনেক সময়। পাশাপাশি দুটো লাইন পাতা থাকে—লিফটের নিয়মে দুটো ট্রেণ পরস্পরের ভারে ওঠানামা করে। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে এরা ইয়োরোপের কোন জাতের চেয়ে কম নয়। হাসপাতালগুলির ব্যবস্থা আধুনিকতম। অর্থাৎ লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মিলসাধনের তপস্যায় এরা রত—জ্ঞানসঞ্চারের দ্বারা ধনসঞ্চয় করে। সাম্রাজ্য-বিস্তারের স্বপ্ন এরা কখনো দেখেনি,—তাই এতকাল ধরে শান্তিতে আছে। শোনা গেল সপ্তদশ শতাব্দীতে এদের শেষ গৃহযুদ্ধ হয়।

এই যে যুদ্ধের ঝড় ইয়োরোপের বুকের উপর দিয়ে দুবার প্রলয়তাণ্ডবে বয়ে গেল,—এদেশের গায়ে তার আঁচড়টী লাগল না। এরা ছিল রেডক্রসের ভার নিয়ে। দুপক্ষের আহতদেরই সেবা করেছে। লীগ অব নেশনের সম্মিলন বসত এখানেই—জেনিভায়। যুদ্ধে শক্তিক্ষয় না করে সবটা শক্তি প্রয়োগ করেছে দেশটাকে গড়ে তুলতে। সেইজন্যে দেশের প্রভূত অংশ ফসলধারণের অনুপযুক্ত হলেও এরা নানাদিকে নিজেদের বিকশিত করে', দেশের ঐশ্বর্য

আহরণ করে চলেছে। বিদ্যুৎ এদের বাঁধা চাকর। আবার তা সত্ত্বেও ছোটগ্রামের নিভৃত কুটীরে, মেয়ের হাতে চলছে তাঁত, কাঠের টুকরোয় ফুলপাতা এঁকে শিল্পী গড়ছে খেলনা।

এখানে দোকানে বাজারে সর্বত্র ইংলণ্ডের মত চড়া রঙের প্ল্যাষ্টিকের সমারোহ দেখলাম না। সাবেক কালের কাঠের খেলনায় ভদ্ররুচির পরিচয় আছে। বিদ্যুৎকে খাটাচ্ছে অসংখ্য কাজে। এ জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, মহাদেব তাঁর জটা থেকে অজস্র ঝরণাধারায় অবিশ্রাম সে শক্তি এদের প্রতি বর্ষণ করছেন। প্রকৃতির জলরাশিকে বাঁধ বেঁধে এরা সঞ্চয় করে রেখেছে শক্তির ভাণ্ডার। বেশীর ভাগ কারখানাই জলের ধারে তৈরী। কিন্তু এমন পরিষ্কার পরিপাটী ধোঁয়া বর্জিত সুঠাম ছাঁদের তৈরী যে, প্রকৃতির পরে মানুষের হাতের ছাপ পড়েছে বোঝা গেলেও সৌন্দর্যের হানি হয় না।

লম্বা বারান্দার এককোণে বেতের কৌচে হেলান দিয়ে ভাবছি এই অদ্ভুত সুন্দর দেশটার কথা, ইয়োরোপের ভূস্বর্গ যাকে বলে, হঠাৎ চমকে উঠি গলার স্বরে—"ক্ষমা কর মাদাম", প্রসারিত হাতে মাথা নত করে বাউ করেন হোটেল কর্তৃপক্ষের কেউ একজন, —"কাল ভোর সাতটার ট্রেণ তোমাদেরই যংফ্রাউ নিয়ে যাবে। ৬৷৷টার সময়ে তোমাদের ব্রেকফাষ্ট, আর প্যাকেটে করে কিছু লাঞ্চ পাঠিয়ে দেওয়া হবে"।—তাহলে এখন ঘুমতে যাওয়াই সঙ্গত —কাল উঠতে হবে ভোরে।

দু' তিনবার ক্ষুদ্রতর ট্রেণ বদল করে করে তুষার চূড়ার পাদমূলে যখন পৌঁছলাম, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। বরফের উপর দিয়ে লাইন নিতে পারে না, তাই নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে। সাড়ে চার মাইল দীর্ঘ এই সুড়ঙ্গ পথে ট্রেণ চলেছে বিদ্যুতে। মাঝে মাঝে মোটা কাঁচের কেবিন হোলের মতন জানলা। কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে একটু আধটু। একটা যায়গায়

ট্রেণ থামালে আমাদের দেখবার জন্যে। অবাক কাণ্ড! অন্ধকারের ফুটোর মধ্যে দিয়ে আলাদীনের ঐশ্বর্য ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। রোদ পড়ে জ্বলছে রূপোর পাহাড়। বাইরে জ্বলন্ত সাদা, ভিতরে অন্ধকার কালো।—টানেল এসে শেষ হয় ছোট একটা পাতাল স্টেশনে। পাতালের উপরে আছে বরফের স্বর্গ, আর তারো উপরে আছে ইয়োরোপের ধ্যানমন্দির ছোট একটী রেস্তোঁরা।

আশ্চর্য রূপ!—এমন যে দেখা যায় ভাবতে পারি নি। হিমালয়ের তুষার চূড়া দেখা হয়ত কখনো ভাগ্যে ঘটে উঠবে না—তবু তার অনুজকে তো দেখে নিলাম। যেদিকে তাকাই ধূ ধূ করছে সাদা—ঝরণা নেই, হ্রদ নেই, সবুজের লেশমাত্র নেই—যতদূর তাকাও, কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই।—শুধু তরঙ্গায়িত বরফের মরুভূমি—পাহাড়ের মাথাগুলি ঢেকে ঢেকে গা বেয়ে নেমে নদীর আকারে দূরে মিলিয়েছে। শুভ্র কঠিন মৃত্যুর মত এই পাঁচ ছয় শ ফিট গভীর জমাট নদীকেই বলে 'গ্লেশিয়ার'। বরফের উপরে কাঠের টুল গর্ত করে ঢুকিয়ে বসে পিক্‌নিক চললো—কুকুরের গাড়ী চড়ে বেড়ানোও চলছে। অদ্ভুত এই ইয়োরোপীয় জাত—কখনো চুপ করে থাকতে জানে না।

মহামৌনের মাঝখানে দাঁড়িয়েও সমানে চলেছে হো হো। হোটেলের আরামকক্ষে যেমন ব্যবহার চলে এখানেও কি তার একটু ব্যতিক্রম হবে না? ওই যে শুভ্র তুষার চূড়ায় বিরাটের নির্বাক ইঙ্গিত—একি এতই অর্থহীন এদের কাছে—এত ব্যর্থ? আমার সমস্ত শরীর এদের কাছে থেকে দূরে যাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠল। গাইডকে ইসারা করে এগিয়ে চলি—একটু দূরে নিয়ে চল আর একটু—ওই নিষেধের দড়ির গণ্ডি পেরিয়ে আর একটু দূরে—যেখান থেকে ওদের কলকোলাহল কানে আসবে না—স্তব্ধতার গভীর ব্যঞ্জনা আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে ধরবে—ঐ

ওখানে। "যেওনা যেওনা মা", খুকু চেঁচিয়ে ওঠে,—আর উল্লসিত কলরবে সবাই এগিয়ে আসে।—উপদেশ দেবার এমন সুযোগ ছাড়ে কে?

সকলের সমবেত পরামর্শ আমার কানের মধ্যে স্লেটের উপর ছুরির আঁচড়ের মত কর্কশ সুরে বাজতে থাকে। এই উল্টো বিপত্তি দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অসহায় বিপন্ন মুখ দেখে গাইডের মনে দয়া হোল। সে অনেক লোককে নিয়ে এসেছে—দৈবাৎ তার মধ্যে ভাবপ্রবণ লোকও ছিল।—সে বললে,—"তার চেয়ে চল তুমি অব্জারভেটরীর উপরে গিয়ে বসবে,—সেখান থেকে আরো ভাল দেখতে পাবে। এখানে আর এগোনো,—যাকে বলে বিপজ্জনক। কারণ একে তো আগে থেকে পথ ঠিক করা হয়নি, তায় আবার বিকেল হয়ে আসছে। ওখানে যাবার সময় হচ্ছে সকাল ন'টা দশটার মধ্যে। আর তোমার পোষাকও উপযুক্ত নয়। এখানে মাঝে মাঝে ফাটল ধরে, হঠাৎ তার মধ্যে পড়ে গেলে অনন্ত কবর।"

"আচ্ছা এই গ্লেশিয়ার নাকি সরে সরে যায়—এ চলে?"

"হাঁ, চলে বই কী—অতি ধীর, অবোধ একটা চলা, দেখে বোঝা যায় না, তবু এ যাত্রার বিরাম নেই। একটু একটু করে চিরকাল ধরে চলে।"

"একটা অদ্ভুত গল্প শোন", গাইড বল্লে,—"গত শতাব্দীর প্রথম দিকে একদল লোক আল্লস্ এক্সপীডিশনে আসে।" সবাই ঘনীভূত হয়ে দাঁড়ায় গাইডের চারপাশে। উজ্জ্বল সূর্যালোকের বিপরীতে আমাদের মূর্তির কালো সিলুয়েট গুলিকে মনে হয় যেন চীনে সাদার উপরে ভুষো কালির আঁচড়। তুষার ভূতনাথের পাশে শুভ্র তাঁর প্রেতসঙ্গীদের মত আমরা দাঁড়িয়ে গল্প শুনি।

"সেই দলে একই গাঁয়ের পথপ্রদর্শক ছিল জন কয়েক," গাইড বলে,—"পাইক পুঁতে পুঁতে, দড়ি দিয়ে নিজেদের বেঁধে বেঁধে তারা এগোচ্ছিল—হঠাৎ ভীষণ গর্জন করে দুফাঁক হয়ে গেল

পায়ের নীচের হিমরাশি—ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হোল তার ভিতর থেকে বড় বড় বরফের খণ্ড, নিমেষের মধ্যে তিনটি গাইড তলিয়ে গেল। তাঁদের অন্য বন্ধুটি গ্লেশিয়ারের এই স্পর্দ্ধিত ঠাট্টার উত্তর দিতে, নেমে গেল সেই ফাটল পথে কোমরে দড়ি ও মুখে গ্যাসের থলি বেঁধে। ফাঁটল এঁকে বেঁকে চিড় খেয়ে খেয়ে নেমে গেছে কোন গভীর পাতালপুরীতে। তিনশ' ফুট গিয়েও কিছু পাওয়া গেল না, সে ফিরে এল পরাজিত হয়ে। বৈজ্ঞানিক তখন বিচার করে বল্লেন, গ্লেশিয়ারের চলা যদি সত্য হয় তবে ৪০ বছর পরে পাহাড়ের নীচে এ ফিরিয়ে দেবে চোরাই মাল! ঠিক একচল্লিশ বছর পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেখানে পড়ে আছে তিনটী নরকপাল, কয়েক-গুচ্ছ কাল ও সোনালী চুল, কয়েক টুক্‌রো জামা কাপড় ও একটী নিটোল শুভ্র হাত। বন্ধু এল সনাক্ত করতে, ছোটবেলায় বন্ধুপ্রীতি ভরে যে হাতে কতবার করমর্দন করেছে, হঠাৎ সেই একটি পরিপুষ্ট বিচ্ছিন্ন হাত দেখে কথা সরল না মুখে। পৃথিবী যাকে ভুলে গেছে, বরফ তার হিমশীতল বুকে তাকে তেমনি নবীন করে রেখেছে। বৃদ্ধ বন্ধু একবার তার লোলচর্ম কুঞ্চিত হাতের দিকে আর একবার মৃত্যুঞ্জয় সেই যৌবন সুঠাম হাতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এল।"

অজ্ঞাত লোকদের গল্পে ভারী হয়ে এল হাওয়া। সবাই চুপ করে এগিয়ে চলেছে। খুকুর চিত্ত ওদের চেয়েও হালকা—সে বল্লে—'আইস প্যালেস দেখব আগে'—'আমি তাহলে অবজারভেটরীর উপরে যাই।'—'আরে না না—আইসপ্যালেসটা চট করে একবার দেখে নিয়ে, ওখানে গিয়ে যতক্ষণ খুসী বোস," খুকুর বাবা দু'জনকে সামলান। বরফের পাহাড় কেটে গুহার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ তৈরী করে রেখেছে।—বিশাল নাচঘর, থাম দিয়ে ঘেরা, কোণে কোণে তুষারের বেদীতে তুষারের ফুলদানী। তাতে একগুচ্ছ তাজা ফুল। বরফের আলোদানে ইলেক্‌ট্রিক বাতি। তাতে কোথাও লাল,

কোথাও বা নীল আলো স্বপ্নজাল মেলেছে—এ যেন কোন যাদুকরের দেশ।

অবজারভেটরীর ছাতের উপরে বসে আছি—নীচে, উপরে, চারিপাশে যতদূর চাও, ধূ ধূ করছে বরফ, জ্বলছে সূর্যের আলোয়, এক-একদিকে তাকানো যায় না। তীক্ষ্ণ সাদার ধার ছুরির ফলার মত বিঁধছে চোখে। বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন লাগে। মন কেমন করা অদ্ভুত এক অনুভূতির আস্বাদে আচ্ছন্ন হয়েছে সত্ত্বা। আমি যে আমি, সে কথা একেবারে ভুলে গেছি। এই যে আমি এখনি নীচে গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কলরব করতে করতে ট্রেণে চড়ব, ফিরে গিয়ে ডিনার খাব, এ আমি কোথায় দূরে সরে গেছে।—আর এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল তুষাররাশির দিকে তাকিয়ে আছে আমার এক অপরিচিত সত্ত্বা। শুধু তাকিয়ে থাকা—কিছু ভাবা নয়, হাসি নয়, শুধু চোখ দিয়ে অনুভব করা। একেই কি বলে তুষারের মায়া?

আল্পসের মোহমন্ত্র সমস্ত চেতনা ঢেকে ছায়া ফেলে। ধীরে ধীরে বদলে আসে সব। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ সাদা নরম হয়ে আসে নানা রঙের বর্ণিকাভঙ্গে। আরে দেখতে দেখতে একী! এ যে সোনা, একেবারে সোনা। কঠিন স্বর্ণের স্তূপে আগুন লেগেছে যেন। আর তারি খাঁজে খাঁজে চূড়ায় চূড়ায়, রামধনুর বিচিত্র লীলা।—এ কি এ—? একি এই পৃথিবীর? এই যে পৃথিবীতে আমরা সকাল থেকে রাত অবধি কাটিয়ে দিই।—সেকি, যেতে হবে? এত শীঘ্র? আর দেরী নেই, ট্রেণের সময় হয়েছে। হ্যাঁ যেতে হবেই। এমনি সর্বদাই যেতে হয়, ভাল জিনিষ বেশীক্ষণ থাকে না। সুখই ক্ষণিক, দুঃখ অনন্ত। বার বার চোখ বুজে মনের মধ্যে গভীরভাবে এঁকে নিতে চাই ছবি, চোখ খুললেই অপরূপের রূপের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ধ্যানের দৃষ্টি আমার নেই, যাকে চোখে দেখলাম, তাকে মনের মধ্যে তেমন করে বরণ করে নিতে পারি কই? সুন্দরকে দেখতে হয় শুধু চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে।

সেই অনুভবের মন কি আমাদের আছে? কুয়াশা ঢাকা মনের আকাশে তেমন করে ফুটে ওঠে না সেই ছবি—অব্যক্ত বেদনায় মূক হয়ে যায় মন—ধীরে উঠে আসি—ফিরে যেতে হয় প্রত্যহের পৃথিবীতে। ক্ষণিকের স্বপ্ন দূরে যায়।

কোন মন্ত্র বলে নেমে এসেছিল পাহাড় চূড়ার স্বর্গ এই মরদৃষ্টির সীমানায়, আবার গেল মিলিয়ে।

ভিয়েনার আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন

P. E. N. Congress—অর্থাৎ কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও ঔপন্যাসিকের সম্মেলনের,—শুধু সম্মেলন নয়, উৎসবও। যদিও সম্মেলনের সভায় সাহিত্যের একটী বিশেষ দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ এবং তর্কের আয়োজন করা হয়েছিল, তবু তারো উপরে বড় হয়ে উঠেছিল উৎসবটাই। হাওয়ায় ছিল ছুটীর সুর, আর মনে ছিল খুশি। সবে স্বাধীনতা লাভের প্রতিজ্ঞাপত্র পেয়ে অস্ট্রিয়া তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে টলমল করছে। উৎসবের সুযোগ পেয়ে ওরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শোনা গেল প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও অস্ট্রিয়ার সত্যপ্রাপ্ত স্বাধীনতার মুহূর্তে এই ভিয়েনাতেই হয়েছিল সেবারে বিশ্বসাহিত্য সঙ্গম। সেবারও নাকি এইরকম রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল ওরা।

ভিয়েনীজ জাতটা সৌন্দর্যপ্রিয়। তার ওপরে হ্রদ আর পাহাড়ে, ফুলে আর ফলে, প্রকৃতি অকৃপণ ভাবে অস্ট্রিয়ায় ঢেলেছে রূপের সুরা,—সুইজারল্যাণ্ডের চেয়ে কোন কোন স্থানে তা কম নয়, বরং বেশী। কিন্তু দশ বছরের পরাধীনতার চাপে এরা এখন বেশ একটু ম্লান বিপর্যস্ত, এবং ইয়োরোপের অন্যান্য জাতের তুলনায় অনেক দরিদ্র। এদের বহু ব্যবসা এখন পরহস্তগত,—অর্থাভাবে অনেক অনুশীলনাগার বিলুপ্ত। শ্রমের মূল্য অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। প্রতি বৎসর বহু অষ্ট্রীয়ান স্ত্রী পুরুষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সমৃদ্ধতর প্রদেশগুলিতে স্বল্প বেতনে ভৃত্যের কাজের জন্যে যায়। আর যারা দেশে এই ধরণের নিম্ন

শ্রেণীর সাধারণ কাজ করছে তাদের ক্ষমতা ও দক্ষতা দেখেও বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত একই মেয়ে হোটেলে অথবা রেস্তোঁরায় সমানে খাটছে, এ দৃশ্য ইংলণ্ডে কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু ওরি মধ্যে মুখে হাসি এবং অধরে রং মাখবার সময় ওরা কি করে পায় এও আর এক আশ্চর্য। কোথায় আছে ওদের শক্তি-উৎস, কে জানে!

ভিয়েনা সহরের এখানে ওখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন প্রাসাদ। সবগুলিই শ্বেতপাথরে গড়া সোনার জলের গিল্টির তক্‌মা আঁটা, ভেলভেটের পর্দা ঝোলান—হাজার বাতির ঝাড়লণ্ঠন দোলা, দেয়ালে মধ্যযুগের ইয়োরোপের বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রাবলী। এই রকম ৫।৬টা প্রাসাদে বিভিন্ন ব্যবস্থায় বিরাট ভোজ ও পানোৎ-সবের নমুনা দেখলাম। কোথাও লাঞ্চ, কোথাও "মোরগের ল্যাজ" (কক্‌টেল) পান। কোথাও "বুফে" ডিনার। কোথাও শুধু তৃষ্ণাতৃপ্তি ও নৃত্য।

সকালবেলায় বসতো সাহিত্য-সভার অধিবেশন, আর দ্বিপ্রহরে লাঞ্চ অথবা বিশ্রাম—অথবা কোন দূর জায়গায় কিছু দেখতে যাওয়া ও চা পান। আর প্রত্যহ সন্ধ্যায় উৎসবের রোশনাই। এর মধ্যে সম্মেলনের কর্মিক-কমিটীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে দু'একটী বৈকালিক ও সান্ধ্য নিমন্ত্রণ বাদ পড়ে গেল। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমিও ছিলাম সেই গূঢ় মন্ত্রসভাতে। গিয়ে দেখি বেশ মজা,—বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকদের শুধু যে কথার মালা সাজানোর ক্ষমতা আছে তা নয়, বাগ্‌যুদ্ধেও তাঁরা কিছু কম পটু নয়। বাঙ্গালীদের তার্কিক দুর্নামটা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে সাহিত্যিকদের তর্কযুদ্ধের উদাহরণটুকু আমি নোট করে নিলাম। তর্ক করতে করতে নাওয়া খাওয়া ভুলুক ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন দেখলাম 'কক্‌টেল' অবধি ভুলে গেল, তখন বুঝলাম, এর তীব্রতার পরিমাণ অনেক দূর। মন্ত্রণাসভার

বিচারবিষয়গুলি সাধারণত গোপনীয় হয়ে থাকে, কিন্তু প্রায়ই দেখতাম যে, কাগজে বিকৃত আকারে তার খানিকটা খবর বেরিয়ে গেছে। ওরি মধ্যে একদল লেখক খবরের কাগজের ভয়ে অস্থির, আর একদল তাদের বিদ্রূপ করে বলত,—খবরের কাগজের ভয়ে সাহিত্যের আদর্শ বিকিয়ে দিতে চাও নাকি ?

একটা কথা এখানে বলা উচিত মনে করছি।—কমিটির প্রায় প্রতি অধিবেশনেই পাকিস্থানের তরুণ প্রতিনিধিটি সর্বদা আমার পাশে পাশেই থাকতেন। ভারতবর্ষের মত যেখানে তাঁর সুবিবেচিত বলে মনে হয়েছে, সেখানেই নিজে থেকে আমাদের স্বপক্ষে ভোট দিতে তিনি দ্বিধা করেন নি। ভদ্রলোক বাঙালী, এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার যুগল সাহিত্যের সংযুক্ত প্রগতি এবং সম্মিলন কি করে সম্ভাব্য করে তোলা যায় সে বিষয়ে অনেক আলোচনা করলেন। বল্লেন, আমরা তো সত্যি সত্যি প্রাণপাত করে বাংলাকে আমাদের জাতীয় ভাষা করে তুল্লাম—আপনারা তো হেরে গেলেন। হিন্দির হামলায় হারুন আর যাই করুন, দোহাই আপনাদের, বাংলা ভাষাকে যেন হারিয়ে ফেলবেন না।

এই প্রসঙ্গে একটু অবান্তর কথা বলি,—লণ্ডনে অনেক যায়গায় দেখেছি, বাংলা ভাষার ব্যবহার সেখানে যেন লজ্জাকর হয়ে উঠেছে। লণ্ডনে যে কয়েক হাজার ভারতীয় আছেন, তাঁদের অধিকাংশই বাঙালী। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের আলোচনা তো দূরে থাক, তাঁরা নিজেদের মধ্যেও বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে যেন লজ্জা পান,—পাছে লোকে প্রাদেশিক বলে। রবীন্দ্রনাথের গান করতেও লজ্জা—যদি ঐ প্রাদেশিকতার ছোঁয়া লাগে!—আশ্চর্য এই ভাব,—বাংলা একটা প্রদেশ বটে, কিন্তু সে তো ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ হিন্দীতে না লিখে বাংলায় লিখেছেন এ আর এমন কি অপরাধ? রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা, সুর ও ছন্দ—এবং তাঁর মণীষার দান সে তো ভারতেরই জাতীয় সম্পদ। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা না

করলে, তাঁর দু'হাত ভরে দেওয়া অজস্র সম্পদ কাজে না লাগালে ভারতবর্ষ যে নিজের ধনেই নিজে বঞ্চিত হবে!

থাক এসব কথা। আজ শুধু বলি, ভিয়েনাতে কি দেখলাম। এক কথায় বলতে গেলে, দেখলাম, "বাঁধা আছে এক মাল্যবাঁধনে লক্ষ্মী-সরস্বতী।" যদিও এই দুই দেবীর চিরপ্রসিদ্ধ আড়াআড়ি তবু একথা মানতেই হবে যে, লক্ষ্মীর আঁচলেই চাবিকাঠি বাঁধা। ইয়োরোপ কিন্তু বরাবরই দুই দেবীর মধ্যে একটা আপোষে রফা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছে। লক্ষ্মীর সেবায় সরস্বতীর সৃষ্টি, আবার সরস্বতীয় প্রেরণায় লক্ষ্মীর পুষ্টি। ঐশ্বর্যের প্রভাবে ইয়োরোপের নবনবোন্মেশালিনী প্রতিভা বাণিজ্য লক্ষ্মীর নবনব সৃষ্টিধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে আবার বাণীর বরদানে সেই বিভিন্ন ধারায় অজস্র সৃষ্টি সুচারুরূপে সংহত হ'য়ে কমলার সম্পদ সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলছে দেশের ভাঁড়ার ঘরে।

এত সম্পদ, এত সমারোহ, এত আয়োজন, এত বিলাস প্রাচুর্য,—দেখে দেখে অবাক হয়ে থমকে যেতে হয়, মনে হয় সত্যিই এর প্রয়োজন আছে কী?—অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সামন্ততান্ত্রিক বিলাস প্রাচুর্য, যে অমিত ঐশ্বর্যসম্ভারের বর্ণনা বইয়ে পড়ি, বিংশ শতাব্দীর এই গণযুগেও দেখলাম সমারোহ তার চেয়ে কম নয়, বরং যেন আরো উজ্জ্বল—আরও মনোহর। তেমনি হাজার ডালে লক্ষবাতী পলকাটা কাঁচের কত অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন, তবে, মোমের দীপের বদলে বিজ্‌লীর আলো। আরো উজ্জ্বল। অবশ্য, এ উৎসবে সে যুগের মতো হরেক রকম রাজা বাদ্‌শা ধনী ব্যবসায়ী ক্রোড়পতিদের বদলে শুধু সাহিত্যিকদের ভীড়। তিন চার শ' সাহিত্যিক পৃথিবীর নানা দেশ থেকে ভিয়েনায় জড় হয়েছে। এখানে এবার বিশ্বসাহিত্য সম্মেলন,—সর্বদেশের সর্বজাতের সাহিত্যের প্রতিনিধিরা এসে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু, সাদা ছাড়া আর কোনো রঙের চেহারা নজরেই

পড়ে না, পূবদেশের শামলা রঙের অতিক্ষীণ আভাস ছু' একজনের মুখে। ছুজন জাপানী, একজন কোরীয়ান, একজন মালয় আর তিনজন ভারতীয়। তবে কি সাহিত্য বলতে যা কিছু, তাও বিজ্ঞানের মতই এই পৃথিবীর পশ্চিম দেশগুলির মধ্যেই আবদ্ধ? সমবেত সাহিত্যিকরা সকলেই—যাকে এককথায় বলা চলে—সাহেব। সেই সাহেব সাহিত্যিকদের সকলেরই গায়ে সেই চিরাচরিত কালো নৈশ ভোজের পোষাক, কণ্ঠে কালো টাই। তারা তেমনিই মধ্যযুগীয় নায়কোচিত ভঙ্গীতে ঈষৎ নত হয়ে মহিলা অভ্যাগতাদের করপল্লব অতি সন্তর্পণে তুলে ধরে চুম্বন করছে।—মহিলা সাহিত্যিকদের রক্ত নখরলাঞ্ছিত শ্বেতমর্মরসন্নিভ কোমল হস্তাঙ্গুলিতে কালো লেসের দস্তানা। কত বিচিত্র সাজে পোষাকে, অলংকারে আভরণে বিচিত্রতর রুচি পরিচয়—অর্থ ও কামনার রূঢ় বিজ্ঞাপন। নকল হীরে ও কাঁচের টুকরোর ভূষণজাল তরুণীর সঙ্গে বৃদ্ধারও লোল অঙ্গে সমানে ঝলমল করছে। ছু' একজনের মাথায় আবার হীরের টায়রা।

আশ্চর্য মেয়েলি স্বভাব!—সর্বত্র এক। সাহিত্য-আলোচনাও শেষে মেয়েদের মুখে গহনার আলোচনায় এসে দাঁড়াল। সে-কথা যাক, এত সমারোহ আড়ম্বরের মাঝখানে আমাদের পূর্বদেশীয় গৃহস্থের প্রাণ কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। সন্দিগ্ধ মনে প্রশ্ন জাগে,—বাইরের এত আড়ম্বরে, ভেতরকার সত্য সারটুকু ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নষ্ট হয়ে যায় নি তো?—বোধহয় না। ইয়োরোপের সত্য নষ্ট হয় নি। ছুঃখের মধ্যে, অবমাননার মধ্যে, যন্ত্রণার মধ্যে, দাঁত কামড়ে পড়ে থেকে, জিদ্‌ ধরে জিৎবার শক্তিও তো এদেরি আছে দেখি। ভিতরে কোথাও শক্তির উৎসমূল নিশ্চয়ই খোলা আছে, না হলে এই জোর, এই উৎসাহ ছুদিনেই যেত শুকিয়ে। একদিকে যেমন ঐশ্বর্যের আড়ম্বর, উপকরণের প্রাচুর্য, বিলাসের নগ্নতা, অন্যদিকে আবার এও তো দেখি দলে দলে সাধারণ লোক সহর

থেকে বেরিয়ে পড়ছে—শুধু দু' একদিন মাত্র কোথাও গিয়ে খানিকটা নির্জনতা ভোগ করে আসার জন্যে। কাজের চাপে পিষে যাওয়া, অন্যমনে হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলি থেকে যেটুকু পারে কেড়েকুড়ে রাখতে চাইছে একান্তভাবে নিজের জন্যে। সপ্তাহে অন্তত একটী দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্যেও নিঃসঙ্গ হতে চাইছে নিজের সঙ্গে।

ইয়োরোপের সংবেদনশীল মন মরেনি এখনো ঐশ্বর্যের চাপে, ডোবেনি বিলাসের তলায়। রোমের মতই আধুনিক ইয়োরোপও যদিও উপকরণ প্রাচুর্যকে সর্বান্তকরণে কামনা করে—তবু মনে হয়, দুটি জিনিষের জন্যে ইয়োরোপ আজও আপন প্রাণশক্তিকে উপকরণের স্তূপের নীচে পিষ্ট হয়ে যেতে দেয় নি। তার একটি হচ্ছে, আরাম বিলাসের মধ্যেও তার নিরলস কর্মপ্রতিভা; অন্যটী হচ্ছে সর্বমানবের স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস। যদিও বলব না, এই বিশ্বাসের মর্যাদা সে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে—বারে বারেই পথচ্যুত, আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু মত ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করেনি। এই পথচ্যুতির একটা সামান্য উদাহরণ দিচ্ছি,—জামাইকার সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিতে এসেছিলেন একজন খাঁটি ইংলিশম্যান। ইংলিশম্যানের বিশেষত্ব সর্বত্রই এই যে সে আগে ইংলিশম্যান পরে সাহিত্যিক। কথাটা একদিন পাড়তে, অনেকেই দেখলাম মেনে নিল। এমন কি ইংলিশম্যানরাও। শুধু একজন গোঁজ হয়ে বল্লে, তোমরাও কি তাই নও? অর্থাৎ, আগে ভারতীয় পরে সাহিত্যিক? আমি দ্বিধাভরে বল্লাম, আমরা সবাই অর্থাৎ সাহিত্যিক অসাহিত্যিক, লেখক, পাঠক, কেরাণী, মুদি, এমন কি সৈন্য পুলিশ, সবাই প্রথমে দার্শনিক, তারপরে উদাসীন ও সবশেষে ভারতীয়। অনেকেই কথাটা ঠিক ধরতে পারল না।—কেউবা ভাবল, আমি ভারতবর্ষের চিরন্তন স্পিরিচুয়ালিসম্ নিয়ে বড়াই করছি। যারা বুঝল তারা চোখ

টিপে হাসল,—ওদের তর্কে বাধা দিল না। একজন কলহের সুরে বল্লে তোমরা স্পিরিচুয়লিস্ট আর ফিলজফর বলেই বুঝি দেশে এই দারিদ্র স্বীকার করছ?

আমাদের দারিদ্র-কাহিনী ইয়োরোপের অলিতে গলিতে সর্বত্র জয়ঢক্কায় প্রচারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আমি বল্লাম, দেখ, ভারতীয়রা ফিলজফার বলেই রক্ষে। শুধু দারিদ্র স্বীকার করেই ক্ষান্ত হচ্ছি না, দারিদ্রের কারণ সেই শোষক ইয়োরোপকে এতকাল ধরে অনায়াসে সহ্য করে আসছি। একজন রাগ করে বল্লে—"কেন সহ্য করেছ,—কেন টুঁটি টিপে বের করে দাও নি?" "কি করব বল?" আমি বল্লাম,—"আমাদের রক্তে সে প্যাশন্ নেই,—উগ্র প্রতিহিংসার সে জোর নেই। আমাদের প্যাশন্ সমস্ত চিন্তার রাজ্যে। নতুন কথা, নতুন ভাব, নতুন আদর্শের সন্ধান পেলে আমাদের শতপ্রথাবন্দী সমাজও আনন্দে নেচে ওঠে। একবার ইতিহাস খুলে দেখ,—কোন নতুন কথা কখনো আমাদের দেশে ব্যাহত হয় নি, কোন নতুন আদর্শকে কেউ গলা টিপে হত্যা করে নি। যুগে যুগে কত ধর্ম প্রবর্তক, কত মহামানব কত নতুন কথা বলে গেলেন। তাঁদের কথা কেউ শুনল, কেউবা শুনল না, কেউ বুঝল, কেউবা বুঝল না। যারা বুঝল না, তারাও নতমস্তকে ঘরে ফিরেই গেল। তা বলে, যা আমার বুদ্ধির অগোচর তার অস্তিত্বই দেব লুপ্ত করে, এমন অহঙ্কার আমাদের দেশে ছিল না। বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে নানক, কবীর, চৈতন্য কত মহাপুরুষ কত কথা বলে গেলেন। কিন্তু কোন যীশুখৃষ্ট, কোন জোয়ান অব আর্ক, কোন গ্যালিলিওর ঘটনা এদেশে ঘটেনি। মহাত্মা গান্ধীই ভারতের প্রথম শহীদ যাঁকে মতের জন্যে প্রাণ দিতে হোল। ইয়োরোপকে গুরু করায় এই প্রথম ভারত আত্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হোল।"

সেদিনের ভোজসভায় অনেক আলো, অনেক বাজনা অনেক

সমারোহ ছিল,—ভিয়েনার সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাসাদ 'সনব্রুন' সৌধে (অর্থাৎ সুন্দর দুর্গ।)—অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার P. E. Nকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিলেন। মাইলখানেক লম্বা বাগান পেরিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা বাসগুলি এসে থামল প্রাসাদসোপানের সান্নিধ্যে। বাজনা বাজছে আধচেনা সুরে---বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পীরা এদেশের সুরের সাধনা করে গেছেন।—সুবার্ট, মোৎসার্ট, বীঠোভেন,—তাঁদেরই কোন সুর, নানা যন্ত্রের একতানে বাজছে। সিঁড়ির সামনে এসে থমকে গেলাম। এমন পুষ্পসজ্জা দেখিনি কখনো। প্রদীপ্ত প্রচণ্ড পুষ্পসজ্জা—যাকে অনায়াসে বলা চলে aggressive! সিঁড়ির প্রত্যেকটা রেলিংএ একটা গাছ তাতে একটী করে বিশাল রক্ত গোলাপ—সমান মাপের সমান রঙের! আর দেয়ালে থামে থামে তেমনি ফুলের কারিগরী। উপরে উঠতেই দেখা গেল চ্যান্সেলার তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—পুরুষদের সঙ্গে করমর্দন আর মহিলাদের কাছে নত হয়ে হস্তে অধর স্পর্শ করে চলেছেন। পলকাটা কাঁচের ঝলকানির ভিতর দিয়ে বিজলী আলোর হাজার রোশনাই—পুরোণো ছাঁচে নবীনের প্রবেশ যেন আরো উজ্জ্বল, আরো সুদীপ্ত। এমনি হলের পরে হল। দু'পাশে সাদা পাথরের মেঝের পাড়, মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে নরম পুরু কার্পেট। মাঝে মাঝে পানপাত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচিত্র বেশবাসে সজ্জিত নারী পুরুষের দল। একপাশে দু'চারটে লম্বা টেবিলে খাদ্যসম্ভার—চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য। পেয়টা, সকলের হাতে হাতে। কিন্তু খাওয়াটা এখানে গৌণ, মুখ্য হলো—পরকলাকাটা বিচিত্র পানপত্র হাতে পরীর মত হাওয়ায় ভেসে এখান থেকে ওখান আর ওখান থেকে সেখানে ঘুরে ঘুরে উড়ে যাওয়া। এখানে একটু হাসি, ওখানে দুটো কথা, সেখানে কিছু ঠাট্টা। তারি মধ্যে একটা দুটো কথা জমে কোথাও খানিকটা আলোচনার সূত্রপাত।

আয়র্ল্যাণ্ডের মেম্বাররা সকলেই ভারতের খুব ভক্ত। একটী আইরীশ মেয়ে বল্লে,—"জানো একবার একজন ইংরেজ কিছুদিন আয়র্ল্যাণ্ডে ঘুরে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল, আমাদের বিশ্রী গেঁয়োপনা দেখে।" আমাকে অবাক হতে দেখে সে হেসে ওঠে, বলে, "তুমি বুঝি জান না—আমরাও তোমাদের মতই primitive। আমরা বালতি করে কুয়ো থেকে জল তুলি, কাঠের আঁচে সেই জল গরম করি, টিনের টবে ঢেলে মাঝে মাঝে স্নান করে নিই।—কেমন? তোমাদের মত নয়?"—মাথা নেড়ে বলি "মোটেই না। কুয়ো থেকে আমরাও জল তুলি বটে, তবে গরম করবার দরকার হয় না, আর মাঝে মাঝে নয়, রোজই স্নান করতে হয়। আর টবে ঢেলে নয়। পুকুরে ডুব দিয়ে বা বালতি শুদ্ধ একেবারে মাথার উপরে হুড় হুড় করে ঢেলে।"—ওরা চোখ বড় করে বল্লে,—"বল কি, মাথার উপরে ঢেলে?"

পাকিস্থানের সঙ্গে ভারতের ঝগড়ার কথাটাও অবশ্য বিশ্বশুদ্ধ সবাই জানে। পাকিস্থানের প্রতিনিধিকে সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকতে দেখে বল্লে—"একি! তোমরা লড়াই করছ না তো?" বল্লাম—"কি করি বল—ও যে আমার একদেশের লোক।"—আমার স্বামী খুব গম্ভীরভাবে বল্লেন, "হ্যাঁ ওরা দু'জনেই ঝাল খায়, যা আমি পারিনে।" আমি বল্লাম, "বলতে গেলে আমাদের এক গ্রামেই বাড়ী।"—ওরা পর্যবেক্ষণ করে বল্লে, "রংটা অন্তত তোমাদের সকলেরই একই রকম চমৎকার অলিভ্।" মনে মনে বল্লাম,—হবে না? কেষ্ট ঠাকুরের বংশ যে! একজন বল্লে, "তবে কেন কিছুতেই তোমাদের বনে না, এত কেন বিরোধ?" আমি বল্লাম, "বিরোধের অনেকখানিই বানিয়ে তোলা।" পাকিস্থান বল্লে, "না এমন কথা আমি স্বীকার করি না—মূলগত বিরোধও যথেষ্ট আছে।" আমি বল্লাম—"বিরোধ কোথায় নেই? ইস্‌লাম ও হিন্দুসমাজের নিজের ভিতরেও কি বিরোধ নেই? ইয়োরোপে কি বিরোধ নেই?" লর্ড

পেথিক লরেন্স ছিলেন সেখানে।—চুরাশী বছরের বৃদ্ধ, স্বল্প ক'গাছি সাদা চুল, নুয়ে পড়া চেহারা—আমাকে ডেকে নিলেন পাশে। বল্লেন, "দেখ, কেবিনেট মিশন থেকে ফিরে এই প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমার প্রাণান্ত হয়েছিল। সবার মুখে এক প্রশ্ন—কেন ওরা মিটমাট করতে পারছে না। আমিও তখন এই জবাবটাই সবাইকে দিয়েছিলাম, ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা রাশিয়া বাদ দিলে ইয়োরোপের চেয়ে কম নয়।—জাতি বর্ণ ও ভাষাগত পার্থক্য আচার বিচার ও ধর্মের প্রভেদ ইয়োরোপের দেশগুলির তুলনায় আরো অনেক বেশী। তা ইয়োরোপই যখন নিজের মধ্যে শান্তি আনতে পারছে না তখন ভারতবর্ষের দোষ কি।"—ওঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হল।—বৃদ্ধের সঙ্গে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় শেষের দিকের একটা ছোট গোল ঘরের মধ্যে এসে পড়লাম। তার ছাদের সবটা জোড়া প্রকাণ্ড কাটগ্লাসের ঝাড়ে আলো ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে ছিট্‌কে পড়ছে।—আর দেয়ালগুলি সব আয়নার! হঠাৎ সহস্র দিক থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমি একটু বিব্রত হয়ে পড়লাম। প্রায় সেই ইন্দ্রপ্রস্থের সভায় দুর্যোধনের মত অবস্থা আর কি?—পেথিক লরেন্স ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, "জানো, এটা ছিল এম্প্রেস মারিয়া থেরেসার ড্রেসিংরুম।"

দেখে দেখে আমার চোখ ঝলসে গেল। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। আমি বল্লাম,—"একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।—এর পরিণাম কি?—কোথায় গিয়ে এর সিদ্ধি?"—একজন সাহিত্যিক ছিলেন পাশে। বল্লেন, "পথের শেষ কে জানে—? জেনে লাভই বা কি?"

"কিন্তু এতেই বা লাভ কি," বল্লাম, "এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও আয়োজনের প্রয়োজনের সীমা তো প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।—এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা মিটাতে পারে এমন ক্ষমতা কি এই ছোট বসুন্ধরার আছে? যতই তিনি বসু ধারণ করুন তবু কতই বা আর করবেন?"

পেথিক লরেন্স জোর দিয়ে বল্লেন,—"উপায় নেই, চলতেই হবে—মানুষের আশা থামতে জানে না।" বল্লাম,—"না হয় শুধু আপনাদের দেশটুকুকে বিলাসের উপকরণে সাজালেন।—এতকাল তাতে বাধা হয়নি। কারণ পুবের রস নিংড়ে পশ্চিমের বিলাস ক্ষুধা মিটত—কিন্তু আজ?—আজ তো East ক্রমশই আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।—এখনো অবশ্য আফ্রিকা বাকী আছে। তবু, ধরণীর সামর্থের সীমা আছে, আর মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই? সত্যিই কি মনে করেন সব মানুষের জন্যে এমনি সুখের আয়োজন আপনারা করতে পারবেন?"—পেথিক লরেন্স আবেগের সঙ্গে বল্লেন,—"ইয়োরোপ মরবে না। Eastকে আমরা এককালে দোহন করেছি, এ সত্য, এবং আজ তাকে হারিয়েছি এও সত্য। কিন্তু আমরা আবিষ্কার করেছি 'অণু'। এই আণবিক শক্তিকে মানুষের উন্নতির কাজে লাগালে এই ছোট পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হতে পারে। ইয়োরোপ এখন ক্রোধ ও ক্ষোভের বশে যাই করুক ও যাই বলুক, শেষ পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বর্গ গড়ার কাজই সে নেবে।" মাথা নেড়ে সায় দিলাম বটে, কিন্তু মনে তর্ক এল—না মরলে তো আর স্বর্গে যাওয়া যায় না! সুতরাং আগে পৃথিবীর ধ্বংস, তার পরে স্বর্গ।

আমি চুপ করে গেলাম বটে, কিন্তু তাঁর কথাটা মেনে নিলাম কিনা ঠিক বুঝতে পারলেন না,—বলে চল্লেন, "তোমরা একদিক থেকে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছো,—পাতার কুটীরে দারিদ্রের সাধনা, আমরা অন্যদিক থেকে সেই সমস্যার মূল ধরেছি।"—আমি চুপ করেই রইলাম বটে, কিন্তু মনে মনে মাথা নাড়লাম।—ভাবলাম, সমস্যা ওপর ওপর কিছু দূর করলেও, মূল ধরতে তোমরা কিছুতেই পারোনি, মূল ধরতে তোমরা জানো না, মূল সেই বাসনা নিবৃত্তির অতি পুরোণো কথাটা। কিন্তু এসব কথা এদের কাছে এখনি বলার চেষ্টা বৃথা। যতক্ষণ না এরা নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে

দিয়ে নিজেরা কোনদিন এই সত্যের মুখোমুখি পৌঁছুতে পারে, ততক্ষণ এদের কাছে এসব কথার কোন অর্থ নেই।—আর কে জানে সত্যিই কোন পথে সিদ্ধি। যে ধর্মের জন্যে আমাদের দারিদ্র্যের সাধনা—ভিক্ষাব্রত গ্রহণ—সেই ধর্ম, সেই সত্যপ্রাণসম্পদ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিত পিষ্ট হয়ে মরে গেছে—এও তো প্রত্যহ দেখতে পাচ্ছি—আমাদেরই দেশে আমাদেরি চোখের সামনে। সাহিত্যিক বন্ধু বল্লেন—"আমাদের উপকরণপ্রিয়তাকে দোষ দিচ্ছ! দেখ দেখি তোমার ঈশ্বরই বা কি এমন কম উপকরণপ্রিয়?" গিল্টিকরা প্রকাণ্ড জানলার বাইরে তাকিয়ে দেখি—মস্ত বড় একটা পূর্ণ চাঁদ আকাশের মাঝখানে ঝলমল করছে। আর বাগানের গাছ আর লতাকুঞ্জ প্লাবিত করে, শ্বেতপাথরের মূর্তিগুলির ছায়ায় ছায়ায় থমকে আছে।

এই তো গেল 'পেন' সম্মিলনের বহিরঙ্গের দিকটা, কিন্তু এই-দিকেই ছিল তার প্রাণ। অন্যদিকটায় কাজ, সেখানে সাহিত্য আলোচনা। কিন্তু সেদিকটা রসশূন্য প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল যেন। শুধু প্রথম ও শেষ অধিবেশনেই সব সভ্য সভ্যারা উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিনগুলিতে, খুবই কম লোক হোত। অর্থাৎ যার যার বক্তৃতা তার বন্ধুবান্ধবের দলই বেশী।

প্রথম দিনে অধিবেশন সুরু হোল, প্রকাণ্ড একটা থিয়েটারে, শেষ হোল ইউনিভার্সিটিতে। সভাপতি ছিলেন চার্লস মরগ্যান,—বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার। অষ্ট্রিয়ান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক চেয়ারে earphone ঝুলছিল, ছোট ছোট কাঁচের ডোমের মত ঘরে বসে অনুবাদকেরা সমানে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে চলেছে—ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ এবং জার্মাণ ভাষায়। এও অবশ্য সবই বহিরঙ্গ। এত বহিরঙ্গের ভিড়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ কি আর টিঁকতে পারে। এত আয়োজন, কিন্তু ভিতরের সারাংশে যেন ঘাটতি পড়েছে। বক্তৃতা

এবং অনুবাদ কোনটিই তেমন করে অন্তরে প্রবেশ করতে যেন পারল না। বড় বড় সাহিত্যিকরা বক্তৃতা দিলেন,—লেখা এবং বিচার বিতর্কে মুন্সীয়ানার পরিচয় প্রচুর, কিন্তু কেমন যেন প্রাণে লাগল না। সাহিত্যের মূলগত অর্থ, যে সাহচর্যে, যে মিলনে, যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত—তার আস্বাদ যেন তেমন করে পাওয়া গেল না। মনে হচ্ছিল যাঁরা এইসব earphone ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের বক্তৃতা যদি শুনতে পেতাম,—যদি এই ব্যবস্থার মধ্যে মিল, বেন্থাম, বার্কলে-কে শুনতাম,—মার্কস, এঞ্জেলসকে শুনতাম, টলস্টয়, গর্কিকে শুনতে পেতাম। যদি এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে পৃথিবী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথকে শুনত। কিন্তু পৃথিবীর কপাল খারাপ, যখন শোনাবার লোক ছিল তখন এমন ব্যবস্থা ছিল না। যখন ব্যবস্থা হোল তখন শোনাবার লোকেরা অন্তর্ধান করল। আজকের দিনে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রেই যে ঘাটতি পড়েছে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই। লক্ষ্মীর পাদপীঠ বহন করে করে বোধহয় বীণাপাণি একটু হাঁপিয়ে উঠেছেন।

আলোচনার বিষয় ছিল Theatre as an expression of modern age.—প্রতি অধিবেশনে এই বিষয়ে কতগুলি প্রবন্ধ পাঠ হোত, তারপর মেম্বাররা আলোচনা করতেন। যার যা ইচ্ছে হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন। গত মহাযুদ্ধ কিভাবে ড্রামা ও থিয়েটারকে প্রভাবান্বিত করেছিল, এ মহাযুদ্ধই বা কতটা করেছে, এরই তুলনামূলক সমালোচনা হোল বেশী। কেউ বা একেবারে সেক্সপীয়ারের সময়কার ড্রামা নিয়েও বল্লেন,—সবাই নিজের লেখা শোনাতেই ব্যস্ত, অন্যের লেখা শোনার ধৈর্য বা উৎসাহ দুই-ই কম, বিশেষত পুরুষদের মধ্যে। মেয়েরা ওরি মধ্যে অনেক ধৈর্যশীলা। ব্যাপারটা আমার বেশ পরিচিত লাগল, একটু খুশীও হলাম মনে মনে।

প্রবন্ধ পাঠের কোন নিয়ম-ক্রমও তেমন দেখলাম না। আমি

ভেবেছিলাম সব দেশের প্রতিনিধিদেরই কিছু কিছু বলতে বলাবে। তা কিছু নয়। অনেক দেশ থেকে দু' তিনজন বললেন। অনেক দেশ একেবারে বোবা। আমাদের দেশে যদি কখনো P.E.N. সম্মিলন হয় তাহলে এই জিনিষটা ঠিক করতে হবে। সব দেশকে বলার সুযোগ দিতে হবে। সব দেশ থেকেই প্রবন্ধ চেয়ে পাঠাতে হবে। কোন দেশ যদি ৪।৫ কি ততোধিক প্রবন্ধ পাঠায়, তবে সেগুলির জন্যে একটি নির্বাচনী সমিতি করে নির্বাচন করা যেতে পারে—যাক্ সে এখন বহু দূরের কথা। শুধু একথা এইজন্যে তুললাম যে P.E.N.-এর সাধারণ সভ্য সভ্যারা সকলেই একবার ভারতবর্ষে সম্মিলন করবার জন্যে উৎসুক।—আমাকে সবাই প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি বল্লাম, "এত অভ্যর্থনা করব কি করে? আমাদের সব টাকা এখন দেশ গড়বার কাজে লাগছে।" ওরা বললে, "তোমরা ডাল ভাত যা দেবে তাই আমরা সোনামুখ করে খাব, আরে, ভারতবর্ষে যাওয়াটাই তো সবচেয়ে বড় অভ্যর্থনা।" আমি বললাম,—"কিন্তু মদের বদলে ডাবের জল খেতে হবে।" ওরা বললে, "তাই সই,—সেজন্যে ভাবছি না, কিন্তু অতদূরে যাব কি করে? সাহিত্যিকদের অবস্থা তো তোমার অজানা নয়।" আমি বললাম, "তবে আর কি? আশা ছাড়। কারণ আমরা যে টাকা খরচ করে তোমাদের সাপ বাঘ আর মহারাজা দেখাতে নিয়ে যাব, এ অসম্ভব। আর কি দেখতেই বা যাবে? সাপ বাঘ দু' একটা তাড়া করলেও করতে পারে, কিন্তু মহারাজা আর পাবে না।" ওরা বল্লে, "দূর দূর, তোমরা কেন টাকা দিতে যাবে। Unescoকে বল না, ওদের অত টাকা, ওরা অর্ধেক খরচ যদি দেয়, বাকী অর্ধেক লেখক-রা পকেট থেকে দিতে পারে।"

ওরা আমাকে নিয়ে গেল, Unescoর যিনি P.E.N. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাঁর কাছে। তিনি জার্মাণ,—একবর্ণ ইংরেজী বোঝেন না—সঙ্গে সর্বদা বহুভাষণপটীয়সী মহিলা সেক্রেটারী। তিনি

বল্লেন, “Unescoর পরের সভা তো তোমাদের দেশেই হবে। তখন কথা পেড়ো,—যদি তোমাদের সরকার রাজী হয়, তাহলে Unesco নিশ্চয় খানিকটা ব্যবস্থা করবে।” আমি ওঁকে এই সুযোগে ট্র্যানস্লেশন্ স্কীমের কথা জিজ্ঞেস করলাম। বিভিন্ন ভাষার বই অনুবাদ করার জন্যে Unescoর একটা বিভাগ আছে। আমার প্রশ্নে তিনি ভেবে চিন্তে বললেন—সম্প্রতি একটী আধুনিক বাংলা বই তাঁরা অনুবাদ করিয়েছেন।—আধুনিক বইএর নাম জিজ্ঞেস করায় জানা গেল—“কৃষ্ণকান্তের উইল”।

যাই হোক, এখন এই কথাটি বলে আমি শেষ করব যে, P. E. N. এর এই সম্মিলনে আমি এইটুকু লক্ষ্য করতে পেরেছি যে সাধারণ সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৌতূহল মিশ্রিত এক রহস্যময় মোহ এবং তাকে একটু ভালো করে জানবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকার উঁচুভুরু সাহিত্যিকদের কেন্দ্র-গোষ্ঠিতে ভারতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা অতিক্ষীণ ভদ্রতার পালিশ করা আবরণে আবৃত।

নীলনদ ও পিরামিড

অন্ধকার সময়-সমুদ্রের উপর দিয়ে চলেছি। দূরে পড়ে রইল বিদ্যুৎ-দীপখচিত ভারতের পশ্চিম তটপ্রান্ত: ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেমন করে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রলেখা অস্তসাগরে যায় মিলে। কালো আকাশে তারারা উঠল জ্বলে। অজস্র, অগণ্য, অসংখ্য।—নীচে ধরিত্রী স্তব্ধ নীরব। তার নগরে জ্বলছে বাতি, আর গ্রামে দুলছে ছায়া। তার বনানীর নিবিড় গহনে, সূর্যহীন মহাকাশের ঘন অন্ধকার। কত, পাহাড়, নদী, উপত্যকা, কত ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতি, কত ফেনবিভঙ্গিত তরঙ্গোদ্বেল সমুদ্রের বঙ্কিম রেখা পার হয়ে উড়ে চলেছে যন্ত্রপাখী। আর সেই পক্ষীগর্ভের নরম গরম আরামে ভ্রূণের মত স্থাণু হয়ে বসে আছি আমরা। বাইরে সগর্জনে বয়ে চলেছে কাল। নীচে নীরব অজানা পৃথিবীর রহস্য। উড়ে চলেছে পক্ষীযান—তার চলার বেগ দুলছে আমার রক্তে। প্রতি অঙ্গের প্রতি রক্তকোষে প্রাণবীজ আকুল হয়ে উঠে আমার সমগ্র চেতনসত্বাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাথার মধ্যে কারা যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করছে। চোখের দৃষ্টি আসছে ঝাপসা হয়ে।

ওরা বল্লে—ও কিছুনা, তোমার বায়ুরোগ হয়েছে। শুয়ে পড়। হঠাৎ বায়ুরোগ কেন? বায়ুভেদ করে চলেছি বলে কি প্রাণবায়ু বিদ্রোহ জানাল নাকি? হাঁ, না, বিদ্রোহ ঠিক নয়—হঠাৎ নতুন অবস্থাকে মানিয়ে নিতে পারছে না তোমার শরীর।—তোমার দেহটা নেহাৎই মাটির। মহাকাশের হঠাৎ মুক্তিকে সইতে পারছে না সে।

তা বটে, মানুষ হয়ে জন্মেছি, ডানা দেননি বিধাতা। নাকি কোনদিন ছিল ডানা?—যেদিন মানুষে পরীতে ভেদ ছিল না। ফস্ করে মোটা ঘরকন্না থেকে রূপকথার রাজ্যে উড়ে যেতে বিশেষ কোন বাধা ছিল না মনের। মনে পড়ে, কবে যেন একদিন দুই পক্ষ বিস্তার করে উড়েছিলাম। এমন অন্ধকার রাতে নয়। সূর্যালোকে ঝলমল করা নীল আকাশের উপর দিয়ে। সে কবে? সে কি এই জীবনের কোন স্বপ্নে? কোন মোহময় কবিতার ছন্দে? না কি সে কোন জন্মজন্মান্তরের আপেক্ষিক সত্যে,—যখন পক্ষীবংশধারায় নিহিত ছিল মানবের মহাভবিষ্যৎ।

কে জানে সে কবে? কিন্তু আজ এই মুহূর্তে আমার দেহের আদিম রক্তকণাদের কাণে কাণে কে যেন চুপি চুপি সেই বিস্মৃত পুরাবৃত্তের কাহিনী বলে চলেছে। আর সে কথা শুনে তারা যেন মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তাল হয়ে ছুটে যেতে চাইছে। টুকরো টুকরো করে দেহের বন্ধন, উড়ে যেতে চাইছে মহাশূন্যে। ওরা বল্লে,—"বাজে কথা শোনার সময় নেই,—রাখো তোমার কবিত্ব। এবারে সোজা শুয়ে পড়।" দুটো চেয়ার এক করে ওরা একটা ডিভানের মত করে দিল। নরম বালিশ মাথার নীচে দিয়ে কোমর বেঁধে দিল চামড়ার শিকলে।

আধ ঘুমে শেষ হয়ে এল রাত। তখন অন্ধকারে ঘুমন্ত যাত্রীদের মধ্যে পথ করে কে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মুখে।—ভোরের আগেই ছোট লালীর ঘুম ভেঙে যায়। শব্দ না করেই আমরা দুজনে চুপি চুপি উঠে বসলাম। বন্ধ কাঁচের জালনা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম,—ফেলে আসা পূর্বদিকের আকাশ রাঙা করে ধীর পায়ে উঠে আসছেন দিনবধূ উষা—সকল দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে তার ছটা।

দুলে দুলে হাওয়ার ধাক্কার টাল সামলে প্লেনটা এক সময় মাটিতে নেমে পড়ল। চামড়ার বন্ধনীটা খুলে ফেলে, দীর্ঘটানে দেহ

বিস্তৃত করে উঠে দাঁড়াল সবাই। স্প্রীংএর দরজা খুলে দেখা দিল একটা সাদা ধাতুর সিঁড়ি। আফ্রিকার মরুতটপ্রান্তে নীলনদের মোহনায় বিংশশতাব্দীর যন্ত্রপাখী ডানা মেলে বসল। তার গর্ভ গৃহ থেকে বেরিয়ে এল জন কুড়ি যাত্রী।

সব দেশের মতই ঈজিপ্টের বিমান বন্দরটীও কায়মনোবাক্যে আধুনিক। তার গঠন, তার ব্যবস্থা, তার ঠাটঠমক সমস্তই সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত এই বিশেষ কালগত ফ্যাসানের অনুবর্তী। তেমনি পালিস করা টেবিল চেয়ার কৌচ। তেমনি লম্বা কাউণ্টার। আর তার উল্টো দিকে খট খটে অফিসাররা ঝক্‌ঝকে স্মার্ট পোষাক পরে ঘুরছে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। এটা করছে, ওটা দেখছে। এ ফাইলটা খুলছে, ও কাগজটা রাখছে। দু' একটা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে। ছাড়পত্রগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, মিলিয়ে নিচ্ছে চেহারা। ওদের কাজের ও আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা একই সঙ্গে চলেছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি কিউএর ল্যাজের শেষ দিকে। আকাশ যাত্রার বিধিসঙ্গত দায় কমাতে প্রত্যেকের কাঁধে অপর্যাপ্ত ঝোলাঝুলি।

অতি ধীরে একটি করে লোক কাউণ্টারের অপর পারে মিশরীয় সীমানায় প্রবেশ করছে। উষার রঙ মুছে দিয়ে নূতন সূর্য জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ। এপাশের বসার ঘরের গোল কাঁচের গবাক্ষ দিয়ে তার আলো তেরছা হয়ে এসে পড়েছে। সেই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এক তরুণী মা তার গোলগাল ফরসা সুন্দর শিশুটীকে নানা রংএর নরম গরম পশমী কম্বল দিয়ে ঢেকে, বাইরে অপস্রিয়মান তার দূরগামী পিতাকে বিদায় জানাচ্ছে।—"বাই বাই, say bye bye darling."—আনমনা কৌতূহলে দেখে চলেছে চোখ।—কিউ-এর ল্যাজটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। চারিদিকে কতরকমের লোক, কত বিভিন্ন ঢং ঢাং পোষাক,—কত বিচিত্র ভাষার কলরব। ইংরেজ ফরাসী তো আছেই, তারোপরে আছে গ্রীক, ইটালিয়ান।

ঈরাকী, ঈরানী—এবং আরবী। তারপরে আছে এদেশের আপন লোক ঈজিপ্সীয়। মিশরীয় অফিসারদের রক্তে এবং চেহারায় য়ুরোপীয় রক্তের মিশেল ভুল করবার যো নেই। এছাড়া দেখতে পাচ্ছি আরো একদল আছে যারা, আগুল্‌ফলম্বিত শাদা পাঞ্জাবীতে কোমর বন্ধ এঁটে, মাথায় উঁচু ফেজ ও কাঁধে রঙীন ঝাড়ন ফেলে চায়ের ট্রে নিয়ে ছুটোছুটি করছে। ওরা বোধহয় আরবী মুসলমান— হারুণ-উল রশিদের গল্পের পাতা থেকে উঠে এসেছে। দু'জন মিশরী ওদিকের একটা কৌচে বসে খুব জোর কি একটা আলোচনা করছেন,—হয়ত তুলোর ব্যাপারী কিম্বা আতরের। এঁদের মাথায় লাল ফেজ, গায়ে গোড়ালি পর্যন্ত জমকালো আলখাল্লা, হাতে মিশরী কাজ করা চামড়ার পোর্টফোলিও। ওরা কি ভাষায় কথা বলছিলেন কে জানে?—ইংরেজী বা ফরাসী তো নয়ই। কিন্তু মিশরী বলে কোন স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব আছে কি এদেশে?

বোধহয় না। আজকের ঈজিপ্ট আরব সংস্কৃতির রসধারায় পুষ্ট। আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী সঙ্গীত ও ধর্ম, আরবী পোষাক পরিচ্ছদ, সমস্তই আধুনিক মিশরের জাতীয় সম্পদ।

এয়ার লাইনের বাসে উঠে বসেছি। নরম গদী আঁটা বাস। তাকের উপরে ঝোলাঝুলি তুলে রেখে, কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরে মেলে দিলাম চোখ। চওড়া পরিপাটী পীচ ঢালাই রাস্তা। মাঝে মাঝে সাদা রেলিং ঘেরা বুলিভার্ডের টুকরো। চওড়া ফুটপাথের পরে ফুলের পাড় ঘেরা সবুজ ঘাসের গালিচা।—দু'ধারে বাগান ঘেরা নতুন ধাঁচের নতুন ঢংএর বাড়ী। প্রাচীন মিশরী কায়দা আধুনিক স্থাপত্যরীতিতে এক নতুন বৈশিষ্ট ফুটিয়ে তুলেছে। কোথাও কুটোটিও পড়ে নেই। ঝকঝকে রাস্তায় জ্বলজ্বলে সূর্য শুধু জ্বলছে।

শুনেছি ইয়োরোপীয় মানদণ্ডে ঈজিপ্ট এখনো তেমন করে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারে নি। এখনো সে আমাদেরই মত

প্রগতির দূর নীলিমার প্রান্তে শূন্য নয়ন মেলে দিয়ে আধভাঙা ঘরের আধখোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে।

তবু ওই এরোড্রোম আর এই পরিচ্ছন্ন মার্জিত রুচিসুন্দর পথটী দেখে সেকথা মনে হচ্ছে না।

আমাদের কলকাতার এরোড্রোমটী যদিও আজকাল একটু মলিন হয়ে এসেছে, তবু এখনো ভারী সুন্দর ; পৃথিবীর যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেখান থেকে সহরে আসার পথটী তার একান্ত প্রতিবাদ। কলিকাতা মহানগরীতে প্রবেশের প্রথম পথটীর দু'ধারে আজো খোলা ড্রেন এবং দুর্গন্ধ ময়লার গাড়ী। আর অবিন্যস্ত বিপর্যস্ত ছড়ানো ছিটানো বিশৃঙ্খল ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতি—নেহাৎই প্রয়োজনের খাতিরে গড়ে উঠেছে। প্রয়োজনকে কমনীয়তায় নম্র করে, রুচির শৃঙ্খলে বদ্ধ করার কোন নিয়ম আমরা আজো শিখিনি।

সহরে ঢোকার মুখে এই ৬।৭ মাইল লম্বা গৃহবীথি শোভিত চমৎকার সুন্দর রাস্তাটী দেখে মনে হয়, প্রাচীন মিশর আজো মরেনি। তার শিল্পরস-পিপাসু চিত্ত ভূগর্ভনিহিত অন্ধকারে অপেক্ষা ক'রে ছিল, নূতন যুগের নূতন দেবতার যাদুস্পর্শে সে হয়ত আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে। শোনা যায় এখানকার কোন এক কবর খুঁড়ে বার করে আনা বহু জিনিষের মধ্যে থেকে একমুষ্টি শস্য নিয়ে কোন কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক মাটিতে রোপণ করেছিলেন। তা থেকে ছ' হাজার বছর আগের প্রাণবীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল।

আমাদের পান্থনিবাসের নাম—হোটেল সেমিরামিস। প্রাচীন 'নিনাসে'র অসুর সম্রাজ্ঞী দিগ্‌বিজয়িনী সেমিরামিসের নামে এই হোটেল—সাজে সজ্জায় বিলাসে প্রাচুর্যে ঝলমল করছে। আধুনিক আরাম ব্যবস্থা ও বিলাসের সঙ্গে প্রাচীন মিশরী সজ্জার একটু আধটু অনুকরণ। লম্বা আরবী পোষাক পরা পরিচারক দল এখানে ওখানে ছড়ানো। তাদের সঙ্গে বোধহয় মোগল হারেমের

হাবসীদের মিল আছে। আগেকার দিনে যে আরাম বিলাস শুধু নবাব বাদশা আমীর ওমরাহদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, আজকের দিনে ছড়িয়ে পড়েছে তার ব্যাপ্তি অনেক নীচে। সাধারণের নাগালের সীমানায়।

হোটেলের সামনে পিছনে বাগান। পাশের ঢাকা বারান্দার ছোট গেট খুলে একেবারে নেমে আসা যায় কংক্রিটে গাঁথা নীল নদের তীরে। কত রকমের লোক,—শিশু, বৃদ্ধ যুবা। পিঠে খোলা চুল এলো করে, লাল রিবনের ফুল বাঁধা ফ্রকপরা তরুণী মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। পুরুষদের অনেকের সেকেলে আরবী ঢং আছে বটে, পাঞ্জাবীর উপরে আলখাল্লা। কিন্তু মেয়েদের বেশভূষায় প্রাচীন রীতির চিহ্ন নেই। শুনলাম বেশ কিছুদিন হোল এঁদের মেয়েরা পোষাকটা বদলে ফেলেছেন। কিন্তু মনটা বোধ হয় বদলায়নি। য়ুরোপীয় পোষাকের অন্তরালে মেয়েলি বুদ্ধির আচার বিচারে, এখনো পূবদেশীয় প্রভাবেরই নিগূঢ় অধিকার।

নদীর তীরে পাথরে গাঁথা চওড়া নীচু রেলিংএর উপরে বসে আছি। শিশুকালের স্বপ্ন কৌতূহলের কল্পলোকের রং মাখানো 'নীলনদে'র আশ্চর্য নাম, সাধারণ একটা খালের মত জলস্রোতের উপর দিয়ে যেন নিতান্ত তুচ্ছভাবে বয়ে চলেছে। আশেপাশে কৌতুহলী নারীজনতার সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একজন বল্লে,—"তোমরা পাকিস্থান থেকে এসেছ?"

—"না ইণ্ডিয়া থেকে।" ওঃ! ওরা চুপ করে গেল।

আমরা নদীতীর ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে চল্লাম। আস্তে আস্তে ভীড় বিরল হয়ে এল। শীতের বেলায় লেপের নীচে ঢোকবার সময় হয়ে এল বলে।

দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধচূড়া। তারো পরে আরো অনেক দূরে পিরামিডের রুক্ষ ত্রিকোণ ধূসর আকাশে গেছে মিলে। তারই প্রান্ত ঘেঁষে আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠল।

পশ্চিম দিকের সিংহদ্বার দিয়ে সূর্য প্রতিদিন অন্ধমৃত্যুর গহ্বরে প্রবেশ করেন। তাই পিরামিড সহরের পশ্চিম দিকে। পূর্বদিকে জীবন আর সূর্যের অভ্যুদয়। পশ্চিমে মৃত্যু এবং সূর্যের প্রলয়। মাঝখানে সৃষ্টিবিধায়িণী উত্তরবাহিনী নীলনদী। কে একে পুরুষ-রূপে কল্পনা করেছিলো কে জানে। এ যে শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছতোয়া। একে দেখে নারীমাধুরীকে মনে পড়েনি কেন মিশরবাসীর কে জানে!

মনে পড়ে, নীলনদের মূর্তি দেখেছিলাম 'ভ্যাটিকান ম্যুজিয়মে'। থলথলে মাংসল ভুঁড়িদার চেহারা—কুৎসিত বৃদ্ধ বামনের সঙ্গে ষোলটী এণ্ডি গেণ্ডি সন্তান। এই নদীর সঙ্গে সেই শিশু পরিবৃত বৃদ্ধ বামনের রূপকের মিলটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলাম। মরুভূমির দীপ্ত উজ্জ্বল নির্মেঘ আকাশে অল্প একটু রঙের আভাস দিয়ে সূর্য চলে গেল পশ্চিমে,—মৃত্যুর দেশে।

মিশরের দুই প্রধান দেবতা,—সূর্য এবং নীলনদ। দুই পুরুষ দেবতার কন্যা মিশর। এদেশের প্রধান দেবতা যে সূর্য, এ বিষয়ে সন্দেহ করবে কোন সংশয়ী? মিশরের সূর্য মরুসূর্যের মতই তেজস্বী। মিশরের বাতাস মরুর মতই পবিত্র নির্মেঘ নির্মল উত্তপ্ত কঠিন। সূর্যতেজে দেহবিধ্বংসী বীজাণুগুলি মরে যায়। বাতাসে জলস্পর্শ না থাকায় তারা বাঁচে না, জন্মায়ও না। তাই 'মমি' না করলেও বালির নীচে মৃতদেহ আপনিই অবিকৃত থেকে যেত। মিশরের মরুবালু খুঁড়ে প্রথম মানুষের যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে কবেকার কে জানে।

ছয় হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই মানুষকে পশুর মত অন্ধকার অরণ্যের সঙ্গে লড়াই করে কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে চলতে হোত, তখনই এদেশের মানুষ সভ্যতার পাথরে গাঁথা চূড়োর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে এসেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ মানুষ তারো অনেক আগের। বালিগর্ভের অনেক নীচে, কুঁকড়ে দুমড়ে হাঁটুর সঙ্গে মাথা গুঁজে পড়ে থাকা ঐ কঙ্কাল যেন মাতৃগর্ভে

জ্রূণ। আর তার আশে পাশে ছড়ানো জন্তুর হাড়। হিপো হাতি মহিষ সিংহের। এই সব দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ও মানুষ যবেকার, সাহারা তখনো সর্বহারা হয়নি। তখনো কালো অরণ্য ছড়িয়ে ছিল তার বুকে। তখন বর্ষার গোড়ায় আকাশে জমত ঘন কালো মেঘ। নববৃষ্টিধারায় জেগে উঠত বনস্থলী। নতুন পাতায় আর রঙীন ফুলে, সাজ করত শেষ। সেই বনে ঘুরে বেড়াত কত সিংহ মহিষ গণ্ডার। আর তাদের শিকার করতে ছুটে বেড়াত বন্য উলঙ্গ যে মানুষ, ঐ তার কঙ্কাল—তার নিহত পশুর সঙ্গে একসঙ্গে মিলে বিশ্রাম করছে বালুগর্ভে।

ক্রমে জঙ্গল এল শুকিয়ে। কোথা থেকে কেমন করে শুকনো বাতাস দিল কে জানে। বড় গাছ মরে গেল, আর জাগল না তার বীজ। ক্রমে ঝোপঝাড় শুকিয়ে গেল, কোন্ অন্তর্নিহিত কারণে। কোথায় ধরিত্রীর বুকের মধ্যে মাতৃস্নেহের রসধারায় ঘাটতি পড়ল কে জানে। দেখতে দেখতে কার অভিশাপে মাঠ থেকে ঘাসের চিহ্ন গেল জ্বলে। শুকনো রুক্ষ বন্ধ্যা মরুভূমি গ্রাস করে নিল শস্যশ্যামল বনভূমিকে। কিন্তু এই মরুভূমিই শেষ নয়। এরো শেষে আছে আশা, আছে নদী। সাহারাকে দুই ভাগে ভাগ করে বয়ে যাচ্ছে নীলনদ। মরু তাকে গ্রাস করতে পারেনি। শুষে নিতে পারেনি তার প্রাণতোষিণী জলধারা। আকণ্ঠ তৃষ্ণা বুকে নিয়ে হিংস্র লুব্ধ মৃত্যু বাসনার বালুরাশি দুইদিকে বিস্তৃত করে সঙ্কোচে সে দূরে সরে আছে। তারি মাঝখান দিয়ে নির্ভীক সাহসে পথ করে বয়ে চলেছে নীল নদ। তার দুই তীর ভরে উঠেছে অজস্র সবুজ প্রাণের সম্পদে।

কত কাল ধরে এমন হয়ে আসছে কে জানে? কবে কোন যুগে ধরিত্রীর অন্তর্নিহিত কোন্ মূঢ় আবেগের গূঢ় যন্ত্রণার আলোড়নে, অকস্মাৎ ভিক্টোরিয়া হ্রদের উৎসমুখ ভীমগর্জনে উদ্‌ঘাটিত করে এই বিপুল জলধারা এঁকে বেঁকে আপন পথ করে উত্তরবাহিনী হয়ে

'সুডানে'র ভিতর দিয়ে মিশরের নূতন দেশ সৃষ্টি করতে করতে ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। পথে কতবার কত বাধা ওর পথ আগলে ধরেছে। পাহাড়ের মত বাধার নীচে গভীর গহ্বর—গ্রাহ্য করে নি এই নদ; লাফিয়ে নেমেছে দুরন্ত বালকের মত পাহাড় থেকে খাদে। ছোট্ট একটু বাঁধের সৃষ্টি করে আবার চলেছে ছুটে।

তার দুই তীরে ঘন ঘাসের জঙ্গল। সেখানে কুমীর আসে জল খেতে। তার আশে পাশে নরম মাটির ফাঁড়িতে বন্যার জল ঢুকে আটকে গিয়ে রচনা করেছে ছোটো ছোটো জলা। তাতে পদ্মের বন। পদ্মের রং নীল।—কেন? এই কি তবে নীল পদ্মের দেশ? এখান থেকেই কি শিবের প্রিয় নীলপদ্ম সংগ্রহ করে নিয়ে যেত শিবভক্ত? কায়রো মিউজিয়ামে বহু ছবিতে দেখেছি মিশরী তরুণীদের হাতে সবুজ মৃণালে গাঁথা নীল পদ্ম।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে উজ্জয়িনীর নাগরিকাদের মত মিশরের বিলাসিনীরাও অমনি হাতে পদ্ম নিয়ে ঘুরত। 'হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং'—কিন্তু এদের অলকে কুঁদকুড়ির মালা দেখতে পেলাম না। কালো চুলে খোঁপা নেই। এলো করে ছড়িয়ে দেওয়া, কাঁধে অথবা পিঠে। আর কপালে ঝুলছে চুলের ঝালর। কিন্তু নীলপদ্মের কথাটা মনের মধ্যে পদ্মলোভা ভ্রমরের মতই বার বার ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। যে নীলপদ্ম আমাদের দেশে এত গানে এত প্রেরণা দিয়েছে সেই ফুলের কোন চিহ্ন নেই কেন আমাদের দেশে? তাছাড়া নীলপদ্মের সঙ্গে সর্বদাই যেন একটা দূরদেশী অকথিত রূপকথা জড়িয়ে আছে। "পদ্মআঁখি আজ্ঞা দিলে, আমি পদ্মবনে যাব। আনিয়া নীলপদ্ম আমি তোমার চরণপদ্মে দিব।" সেই নীলপদ্মের দেশ কি এই নীলনদের দেশ?—কে জানে।

White Nile ও Blue Nile শ্বেতনীল ও নীল নীল এক হয়ে ঈজিপ্টে ঢুকে প্রথম বাধা পেল 'আসোয়ানে'। গ্রানাইট ও আলবেষ্টারের কঠিন পাথরে গাঁথা প্রকৃতির

নিজের হাতে রচিত বাঁধ রুখে দাঁড়াল পথ। দুরন্ত আবেগে ঝাঁপ দিল নদী। বিশাল নদী, বিশাল জলাশয় তৈরী করে, ঐ জলাশয় থেকে খাল কেটে কেটে, মাঝে মাঝে ক্ষুদ্রতর জলাশয় সৃষ্টি করে, আরো অনেক সরু নালায় জলধারা ভাগ করে বয়ে চলল উত্তর পথে। এখানে মানুষ বাস করতে সুরু করেছিল—খৃষ্ট জন্মের বহু সহস্র বছর আগে। আজকের মানুষ নূতন বাঁধ রচনা করে প্রকৃতির খেয়ালকে পাকা গাঁথনিতে গেঁথেছে। সেখানে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। অন্যদিকে জল সেচনের ব্যবস্থা চলেছে—আধুনিক পন্থার অনুকরণে।

এইখানে নতুন একটি সর্বাধুনিক বাঁধ বাঁধার পরিকল্পনা করেছিল মিশর। তাতে অর্থ এবং সামর্থ দিয়ে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আমেরিকা এই কিছুদিন আগে। কিন্তু কার্যকালে তা কেবল শ্রুতি হয়েই রইল। কাজে লাগল না। হঠাৎ দেখা গেল আমেরিকা তার কৃপণ মুষ্টি বন্ধ করেছেন। এই ব্যবহারের পিছনে ইংরেজের প্রচ্ছন্ন ছায়া যথেষ্ট অস্পষ্ট নয়।

আজ যে একটা নূতন অসন্তোষ পশ্চিম দেশের আকাশে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে উঠছে, তার মূল কারণ বোধ হয় এই ছোট ঘটনাটুকুর মধ্যেই নিহিত। সত্যভঙ্গের অপরাধ তুচ্ছ নয়। বিশেষ করে মিশরের গায়ে এ অপমান তীব্রভাবেই বেজেছিল। কারণ তার ঘরে টাকা থাকতেও তাকে ভিখিরি সাজতে হয়েছিল। মিশরের টাকা যথেষ্ট আছে কিন্তু তার অধিকাংশই পরহস্তগত। তাই আজ অন্য দেশের কাছে হাত পেতে তাকে সইতে হোল প্রত্যাখ্যানের লজ্জা।

সুয়েজ খালের মাধ্যমে ইয়োরোপের সঙ্গে এসিয়ার যোগ রেখেছে ঈজিপ্ট। অবশ্য ফরাসী কারিগর খালটি কেটেছিল, এবং ইংরেজ কোম্পানী তৈরী করে সেই খালের মুখের কাছে বহুদিন ধরে ঘাঁটি আগলে বসে বসে খেয়া পারাপারের মাশুল বাবদ প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার মুনাফা ঘরে তুলেছিল। সেই টাকা ন্যায়ত মিশরের

প্রাপ্য। প্রতি বছর এত টাকা মিশরে উপার্জিত হয়ে বাইরে চলে যায়। আর নিজের প্রয়োজনে মিশরকে অন্য দেশের দ্বারস্থ হয়ে নতমুখে ফিরে আসতে হলো। তাই হঠাৎ একদিন ভোরবেলা সেই কোম্পানীর উপরে আধিপত্য বিস্তার করলে মিশর সরকার। একদা রাত্রি শেষে হঠাৎ দেখা গেল, কোম্পানীর আপিসে এবং খালের ধারে ধারে পুতুলের মত সৈন্য শ্রেণী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে অস্ত্র নিয়ে। জানা গেল সুয়েজ খালের সমস্ত দায়িত্ব মিশর সরকার নিজে গ্রহণ করেছেন। কাজেই লভ্যাংশ সবই পাবেন তিনি। এতদিন পরে প্রাপ্য ধন নিজের জোরে ফিরে নিল মিশর—আর পৃথিবী জুড়ে ক্রুদ্ধ ভ্রমরের গুঞ্জন মুখর হয়ে উঠল। "মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের" মত সবাই ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। এতদিন ধরে পরের বাড়ির কার্ণিশে মৌচাক রচনা করেছিল যে মৌমাছিরা, তারা অধীর চঞ্চল দংশনোদ্যত হয়ে উঠল। যে পাঁঠা বলির জন্য রাখা আছে, তাকে হঠাৎ গুঁতোবার জন্যে রুখে দাঁড়াতে দেখে, সবাই ক্রোধে এবং বিস্ময়ে গর্জন করে উঠল। কিন্তু মিশর ভয় পেল না। দ্বিগুণ জোরে তুলে ধরল নিজের পতাকা। ন্যায় যার পক্ষে, রুখে দাঁড়াতে সে ভয় পাবে কেন? আর ভয় একবার পেতে সুরু করলে আর রক্ষে নেই; তখন বাঘের ভয় থেকে জুজুর ভয় পর্যন্ত সব কিছুই তেড়ে এসে চেপে ধরে। তাই হুমকিতে ভয় পেল না মিশর। নিজের জোরে কারিগর আনলো—মিশর জানে তুইয়ে বুইয়ে দেশরক্ষা হয় না। দেশের জন্যে দেশকে মরণ পণ করেই দাঁড়াতে হয়। তারপরে হারি কিম্বা জিতি। দেশের যিনি দেবতা তিনিও বুদ্ধের মতন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা দাবী করেন। তাঁর জন্যে সর্বস্ব দিতেই প্রস্তুত হতে হবে। লুকিয়ে চুরিয়ে অর্দ্ধেক রেখে দেব আঁচলের তলায়, বাকি অর্দ্ধেকের একটু আধটু ছায়াছবির সঙ্গে বড় বড় তত্ত্বকথার রং চড়িয়ে যারা পরের চোখে ধুলো দিয়ে নিজের দেশকে বাঁচাতে চায়, তাদের ভুল ভাঙে অনেক দুঃখে। মিশর সে ভুল করে নি। জোরের সঙ্গে নিজেকে

প্রতিষ্ঠিত করেছে। ওকে সত্যি সত্যি রুখে দাঁড়াতে দেখে সবাইকেই অবশেষে নিজের নিজের পথ দেখতে হোল। কারণ,—

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায়
ভীরু তোমা চেয়ে।
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে, সঙ্কোচে
সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, জানে সে হীনতা
আপনার মনে মনে।

'আসোয়ান' থেকে সাতশ' মাইল লম্বা এই নদী প্রাচীন মেমফিস অথবা আধুনিক কায়রো নগরী অতিক্রম করে বহুধাবিভক্ত মোহনায় ভূমধ্যসাগরে এসে মিশেছে। নদীর ধারে ধারে গড়ে উঠেছে সবুজ সুন্দর দেশ। আর তারপরেই পূবে পশ্চিমে যেদিকে তাকাও, শুষ্ক ঊষর মরুভূমি, নিষ্ফল বন্ধ্যা—মাঝে মাঝে মরু সীমার ধারে ধারে, এখানে ওখানে ছড়ানো কিছু খেজুর গাছ।

দূর থেকে এই শ্যামল সুন্দর খর্জুরবেষ্টিত দেশটিকে দেখায় যেন গেরুয়াবসনাবৃতা ধরিত্রীর বুকের কাছে সরু একটা সবুজ পাড়।—ক্লান্ত পথিক উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে—ওকি সৌন্দর্যের স্বপ্ন—ওকি সুখের মায়া—ওকি আনন্দের মরীচিকা? কাছে এলে দেখে, মরীচিকা নয় মরুদ্যান। ওই সাহারার চিরতৃষ্ণার মাঝখানে বিধাতা এই শ্যামল সুন্দর চিরতৃপ্তির রসধারা মেলে রেখেছেন।

কে জানে প্রথম মানুষ কেমন করে কোথা থেকে এদেশে প্রবেশ করেছিল। আফ্রিকার ঘন অন্ধকার পটভূমির ওপার থেকে, নুবিয়ার গহন অরণ্যের ভিতর থেকে দক্ষিণ সুডানের জংলী জাতিরাই কি প্রথমে ঈজিপ্টে পদার্পণ করে? নাকি ওরা মধ্য এশিয়ার কোন রুক্ষ কঠিন পার্বত্য জনপদের মানুষ?—আরব মরুভূমি পার হয়ে,

নীল সমুদ্রের ধার দিয়ে এই শান্ত স্নিগ্ধ অনতিবিস্তৃত মরুকাননে এসে তাদের বোঝা নামিয়েছিল!

পণ্ডিতেরা বলেন ঈজিপ্টেই সব প্রথমে এশিয়া ও আফ্রিকার মিলন হয়েছে। উত্তরে এশিয়ার প্রভাব আর দক্ষিণে আফ্রিকার। আর উভয়কে পরিপ্লুত করে নীলনদের বৃহত্তর প্রভাব সমগ্র দেশটী ও তার অধিবাসীদের একটা বিশেষ জাতীয় ভাবে ঈজিপ্সীয় করে তুলেছে। এমন কি এশিয়া থেকে যে সব গরু আসত, কয়েক শতাব্দী পরে ধীরে ধীরে নাকি তাদের পিঠে দেখা দিত এক বিশেষ ধরণের ঈজিপ্সীয় কুঁজ।

সকাল হতেই সেমিরামিস হোটেল বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। দামী পোষাক পরা বিশিষ্ট লোকের আনা-গোনা, আলাপ আলোচনায় গম্ গম্ করতে থাকে। জমকালো প্রাচীন আরবী পোষাক পরা পুরুষ অনেক দেখলাম বটে, কিন্তু তেমন সাজের মেয়ে চোখে পড়ল না। জানা গেল, শুধু বিশিষ্ট এরিস্টোক্রেটিক ঘরেই নয়, আজকাল এদেশে প্রায় সব মেয়েই য়ুরোপীয় ফ্যাশানে গাউন পরতে ভালোবাসেন, কিন্তু য়ুরোপের মত পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে বাইরের কাজ করে বেড়ানো তত পছন্দ করেন না। এবিষয়ে আমাদের দেশে ঠিক উল্টো ব্যবহার। আমাদের মেয়েরা সাজে সজ্জায় আচারে আচরণে প্রায় দেশীই রয়েছে, শুধু আদর্শটা একটু বদলে নিয়েছে য়ুরোপীয় ফ্যাশানে। আমাদের মেয়েরা যেমন ধোয়া মিলের সাড়িতে ব্রোচ এঁটে, খোঁপায় লোহার কাঁটা গুঁজে, সস্তা একজোড়া চটি পায়ে ট্রামে বাসে ঘুরে ঘুরে আপিসে আপিসে কাজ করে বেড়ান, তেমনটি এদেশে দেখা যায় না।

এই প্রসঙ্গে মাদাম ডোরিয়া সাফিক্-এর কথা মনে পড়ছে ;— মিশরের নারীজাগরণের জনপ্রিয়া নেত্রী। যেমন তাঁর রূপ, তেমনি তাঁর রং, তেমনি তাঁর সাজসজ্জা। কিছুটা প্যারিসের, বাকীটা

আমেরিকার। তিনি যখন আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে, দু'দিনের জন্যে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ হয়েছিলো। বহু অভ্যাগতের ভীড়ের মধ্যেও তাঁর রূপের জৌলুস তাঁর গলার হীরের মতই ঝলমল করছিল। তাঁর কাছে শোনা গেল, ঈজিপ্টের নারী জাগরণের ইতিহাস।

তিনি বল্লেন,—পুরুষের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে, নারীকে যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে, এ কথা প্রথম মনে হয়, যখন বয়সে আমি কিশোরী। আমার দাদু ছিলেন পলিগ্যামিস্ট, শুধু থিয়োরিতে নয় কাজেও। আমি ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করতাম, "আচ্ছা ঠাকুমা, দাদু যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন তোমার নিশ্চয় খুব রাগ আর দুঃখ হয়েছিল!" ঠাকুমা বল্লেন,—"নারে, আমার বেশ ভালোই লেগেছিলো। মনে হয়েছিলো, এতদিনে তবু দুটো প্রাণের কথা বলার লোক হোল। বাড়ীতে কথা কইতে গেলে, কেবল ঐ একটি পুরুষ। তার কাছে কি সব বলা যায়? তাই ভেবেছিলাম, এ ভালোই হোল। দুটো সুখদুঃখের কথা বলে মনের বোঝা হালকা করে নেব।"—আশ্চর্য! আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। পরে এ নিয়ে যত ভেবেছি, মনে হয়েছে, ঠাকুরমার এই কটি সরল সত্য কথার মধ্যে দিয়ে, মানব হৃদয়ের একটি চিরন্তন প্রবণতা ও প্রয়োজন আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঈজিপ্টের নারী পুরুষের সঙ্গে তার সমান অধিকারকে এখনো কাগজে কলমে অপিসে আদালতে ছাপ মেরে নিতে পারে নি। বহু বিবাহ যদিও অনেক কমে গেছে। তবু বাইরে বেরুতে গেলে, মেয়েদের পক্ষে স্বামীর অথবা শাশুড়ীর অনুমতিই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে একজন উপযুক্ত রক্ষী চাই।

মাদাম সাফিক্ বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে এখনো অধিকাংশই নিজের অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন নয়। নিজেদের দুঃখের কথা তাদের জানাই নেই। যেখানে অভাব বোধই নেই সেখানে অভাব দূর

করবে কি করে। মেয়েদের ভোটাধিকার নিয়ে রাজার কাছে লেখালেখি করেছিলাম অনেক। ফল হোল না কিছুই। তখন ঠিক করলাম, আমরা জোর করে এসেম্বলিতে ঢুকব। 'এসেম্বলী'র পাশেই একটা মস্ত মাঠ পড়েছিল। সেই মাঠে মেয়েদের এক বিরাট মীটিং ডাকলাম, সেশন্ সুরু হবার দিনে। দেড়মাস ধরে সব ব্যবস্থা করে মীটিং সাজানো গেল, দলে দলে, দূর দূর থেকে মেয়েরা এল। এদিকে আমাদের চরেরা লক্ষ্য রাখছে assembly হলের উপরে। দলে দলে হোমরা চোমরা সভ্যরা বড় বড় গাড়ী করে ভিতরে ঢুকে গেল। তখন আমি উঠে ভাল করে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বল্লাম। বল্লাম—আজ মিশরের ইতিহাসের এক স্মরণীয় মুহূর্ত। এস, আমরা সব বোনেরা মিলে একসঙ্গে যাত্রা করে ঐ শাসন গৃহে প্রবেশ করি। ওখানে গিয়ে হাতে হাতে আমাদের রাষ্ট্রের অধিকার বুঝে নিই। আমাদের নাগরিক দাবী লড়াই করে জিতে নিই। তখন একটা অদৃষ্টপূর্ব মূঢ় আবেগ অধিকাংশ মেয়ের মনে দুলে উঠল। আমরা মঞ্চ থেকে নেমে, ঘুরে গিয়ে এগিয়ে চল্লাম, এগিয়ে চল্লাম সভা গৃহের দিকে। আমাদের পিছনে পিছনে, কাতারে কাতারে মেয়েরা চল্ল। কেউ বা অনাবৃত মুখে কেউ বা বোরখা পরে। সে এক অভূতপূর্ব অভাবনীয় দৃশ্য। ঈজিপ্টের জাতীয় ইতিহাসে এর আগে আর কখনো এমনটি ঘটেনি। আমাদের দেখে রুখে দাঁড়াল রক্ষীরা—বটে,—হুকুম নেই। আমাদের মধ্যে শ'দুই আড়াই মেয়ে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। আমরাও পাল্টা রুখে উঠলাম, বল্লাম,—খবরদার! আমরা হাজার মেয়ে আর তোমরা মাত্র ছ'জন। যদি বাধা দিতে আস তাহলে টুকরো টুকরো করে ফেলব। তারা ভয়ে ভয়ে চুপ করে গেল। আমরা ওদের বন্দুক আর বেয়নেট কেড়ে রেখে দিলাম। ভিতরে খবর পৌঁছে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল

হলের দরজা। ঘাস বিছানো মস্ত উঠোনে বসে রইলাম আমরা প্রায় শ' পাঁচেক মেয়ে। ক্রমে যখন বিকেল গড়িয়ে সাঁঝের দিকে চলে যায় যায়, তখন একজন এসে খবর দিলে। এসেম্বলীর কর্তামশাই আমাদের ছ'জন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে চান। আমরা ছ'জনে ভিতরে গেলাম। অনেক কথার পরে তারা রাজী হোল। বেশ, ভোটাধিকারের দাবী আমাদের মেনে নেবে তারা, যদি আমরা এই মুহূর্তে তাদের দাবী মেনে নিয়ে, শান্ত ভাবে, যে যার ঘরে চলে যাই। আমরা জয়োল্লাসে ফিরে এলাম ঘরে। বিদ্রূপ করে হেসে উঠল রক্ষীদল।

"তারপরে পেলে কি তোমাদের দাবীর স্বীকৃতি?" জিজ্ঞেস করলাম আমি। তিনি বল্লেন—"না পেলুম না। ওরা সেদিন ভুলিয়েছিলো আমাদের। যেমন করে ঘরের মেয়েদের ভোলায় ওরা, বাজে স্তোকবাক্য দিয়ে।"

"তারপরে, সে অনেক কাহিনী। আমরা জোর আন্দোলন চালালাম, ইংলণ্ডের সাফ্রেজিস্ট মুভমেণ্টের অনুকরণে। কিন্তু দেখলাম, লাভ কিছুই হচ্ছে না। আমরা যত হিংস্র হই,—প্রতিপক্ষের প্রতিহিংসার পদ্ধতি তত ভয়ানক হয়ে ওঠে। আমাদের জিভে ও দাঁতে যত জোর, ওদের হাতকড়ার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা পেল, তখন আর সব দেশের মতই আমাদের দৃষ্টিও ভারতের উপর পড়ল। দেখলাম কত সহজে, কী অনায়াসে ভারতের মেয়েরা তাদের রাষ্ট্রের অধিকার পেয়ে গেল। কি করে সম্ভব হোল? আমরা বইপত্তর যোগাড় করে, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মোটামুটি ইতিহাসটা জানবার চেষ্টা করলাম। প্রথমেই হাতে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর 'আত্মজীবন'। ঐ একটি বই বোধ হয় একটা গোটা জাতের পক্ষে যথেষ্ট। মহাত্মার অহিংস অসহযোগের জাতীয় আন্দোলনের কথা আমাদের তেমন জানা ছিল না। বই পড়ে সব সরল হয়ে এল। বুঝতে পারলাম, দুর্বলের পক্ষে
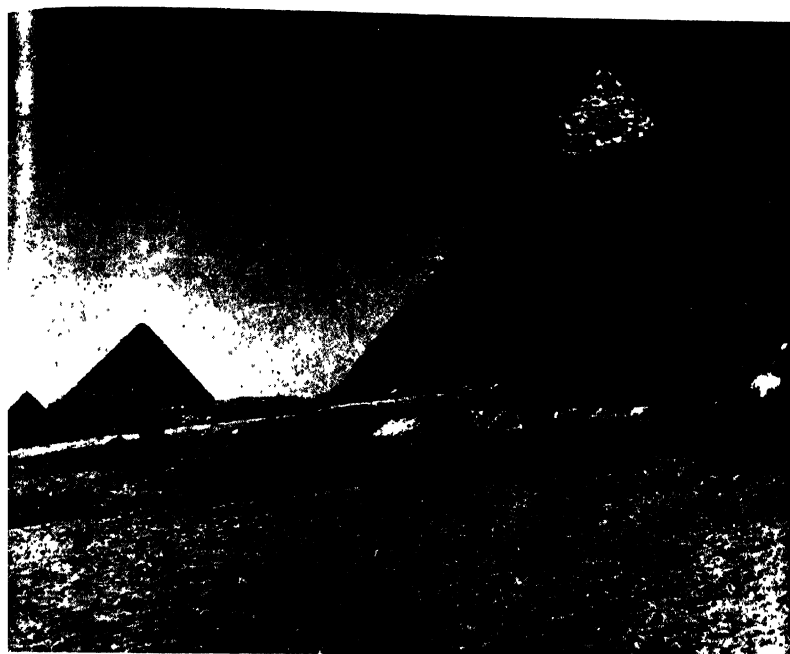
পিরামিড : ইজিপ্ট

শস্য সংগ্রহ : প্রাচীন মিশরের প্রাচীর চিত্র

এমন অস্ত্র আর নেই। লোহার ছুরি দিয়ে কেবল ক্রোধকেই খুঁচিয়ে তোলা হয়। আর এই ছুরি দিয়ে ক্রোধ হয়ত জাগে,—কিন্তু সেই সঙ্গে সহানুভূতিও জাগে। বুঝলাম, আমাদের যুদ্ধের ধারা বদলাতে হবে। আবার আমাদের উদ্দীপনা বেড়ে গেল। বক্তৃতার সুর গেল বদলে। শেষে একদিন আমি মন্ত্রীমশাইকে নারী সভার পক্ষ থেকে একটি চরমপত্র দাখিল করে অনশন সুরু করে দিলাম। আমার স্বামী, আত্মীয়-স্বজন সবাই বারণ করল। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। Assemblyর মেম্বাররা প্রায় সকলেই আমার স্বামীর বন্ধু। তাঁরা এসে অনুরোধ উপরোধ জানাতে লাগলেন। আমি টললাম না। শেষে যখন ডাক্তার বললে আর ২৪ঘণ্টার বেশী মেয়াদ নেই, তখন সব টনক নড়ল। ভয় হোল, পাছে মরে গিয়ে শহীদ হয়ে ওঁদের পরে টেক্কা দিই'। আমি মনে মনে হাসলাম, "মরিয়া হবে জয়ী, আমার পরে এমনি করিয়াছ ফন্দী।" যা হোক, শেষে ফারুক প্রতিজ্ঞা করে চিঠি দিলেন---আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার তাঁরা মেনে নেবেন।"

---সে ইলেক্‌শন কবে? জিজ্ঞসা করলাম আমি।

—"আর কবে?" একটু ম্লান ছায়া খেলে গেল তাঁর মুখে, —"ফারুকের পরে নাশর। নাশরের পরে নাগীব।—কে জানে কবে হবে আবার ইলেক্‌শন।"

—"আচ্ছা ফারুক কেমন রাজা ছিলেন? সত্যি বল?" একথায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন ক্লিওপেট্রার দেশের নারীনেত্রী, বল্লেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না।"

তবু অনেককেই আমি একথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম কায়রোতে। সবাই বলেছিলো—সে আল্লার দুষমন্, দরিদ্রের উৎপীড়ক, কামনার দাস। সে চলে যাওয়ায় সুন্দরী মিশরভূমি নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। এইবারে সে আস্তে আস্তে জেগে উঠবে। দেখছ না, দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে। নূতন উৎসাহে সঙ্ঘবদ্ধ

হতে চাইছে সকলে। দেখো আর বেশীদিন নেই। ঈজিপ্টের সমস্ত দুর্নাম আমরা দূর করব।—তার বন্দরে বন্দরে অর্থ-উপায়ের যত কুৎসিত পন্থা, তার দোকানে দোকানে চড়াদামের যত ভাঁড়ামি, যত জুয়াচুরি সব আমরা দূর করব। ছ'মাস পরে তুমি তো এই পথেই ফিরবে, তখন সৈয়দ বন্দরে তোমার নৌকো থামলে একবার নেমে দেখে যাচাই করে নিও আমাদের কথা।

সত্যিই সেদিন দেখেছিলাম উৎসাহের দীপ্তি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই। যারই সঙ্গে কথা বলি, তারই মুখের ভাষায় আশার আলোর ঝলকানি। ওরা উঠবে, ওরা ছুটবে, ওরা বাঁচবে।—ওরা বাঁচতে চায়। নতুন প্রাণের আশায় ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চলেছে, কোথায় পেল ওরা এই প্রেরণা—ইসলামের গোড়াতেই বোধহয় আছে এই একতার প্রেরণা—ভ্রাতৃভাবের মূল সুর। যে ছিল দাস, ইসলামের অধীনে আসামাত্র সে হোল ভাই।—তার সঙ্গে খাওয়া বসা তো বটেই, এমন কি বোনের বিয়ে দিতেও আর বাধা রইল না। এমন কি সিংহাসনে বসে তার রাজা হবার দাবীকে কোন জাতবিচারের দোহাই দিয়ে অগ্রাহ্য করবার উপায় রইল না। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুসলিম ভ্রাতৃত্বের ঐক্য বন্ধন, খৃষ্টান ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অনেক দৃঢ়। এই ঐক্যবুদ্ধি যদি কোনদিন স্বকীয় ধর্ম আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বধর্মসমন্বিত মানবমহামন্দিরের বেদীমূলে আপন চিত্তকে প্রসারিত করে তুলতে পারে, তবে সেদিন বিশ্বদেবতার পূজার থালায় যে অপূর্ব অর্ঘ নিবেদিত হবে, জগতে তার তুলনা বিরল।

একতার শক্তিই ইসলামের শক্তি।—তবু বলব ঈজিপ্টের ঐক্যবোধ ইসলামের উপরেই নির্ভর করে নেই। সাদা জলে সূর্যের হাসি ঝিক্‌মিকিয়ে তুলে নীলনদ বলে—"ঈজিপ্টের একতার মূলে যদি কেউ থাকে, তো আমি,—সে আর কেউ নয়"।

নীলনদের দুইপাশ বেয়ে নেমে এসেছে উর্বরা দুই সরু জমির

ফালি। যেন নীলফুলের এক গাছি মালা হাতে হাতে মিলিয়ে ধরে দুই তন্বী শ্যামা অপ্সরী নেমে আসছে। তার কোলে কোলে মানুষ এসে বাসা বেঁধেছে। চাষ করেছে তার সবুজ আঁচলের ছায়ায়। সোনার শস্যে ভরে উঠেছে দেশ—নৌকো বোঝাই হয়ে গেছে, পৃথিবীর নানা দিকে,—মধ্য এশিয়ার পণ্যহাটে। সেখান থেকে বোঝাই এসেছে ধন -জমে উঠেছে মানুষের হাতের সৃষ্টিতে, মন্দিরে, মূর্তিতে, আর কালজয়ী পিরামিডের চূড়ায়।—

ঈজিপ্টের মত এমন বিশাল মরুদ্যান পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।— এমন সাতশ' মাইল লম্বা, আর, পনেরো থেকে তিরিশ মাইল মাত্র চওড়া সরু লম্বা দেশও বোধ হয় আর নেই।

নীলনদের দেবতার নাম হাপি। হাপির সন্তান ঈজিপ্ট। পিতার মতই সে সন্তানের জন্যে প্রতিবৎসর খাদ্যসম্ভার আহরণ করে আনে। প্রতিবছর বর্ষার শেষে বন্যা নামে নীলনদে। মরুভূমির প্রান্ত পর্যান্ত দুইতীর দু'ফুট জলের তলায় ডুবে যায়। তিনমাস পরে জল কমতে সুরু করে,—আস্তে আস্তে নেমে যায় সাগরে। যাবার আগে রেখে যায় তার দান—বিছিয়ে দিয়ে যায় তার জমিতে, প্রতিকোষে খাদ্যভরা এক ঘনকালো পলিমাটির চাদর। ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে লেগে যায় কাজে,—প্রতিবছর নূতন মাটিতে করে চাষ।

বছর ভোর জলসেচের ব্যবস্থা ওরা করে রেখেছে খালে এবং বাঁধে। ওদের সরু দেশের উর্বর জমির প্রতি ইঞ্চিতে ওরা সোনা ফলাতে চাইতো, তাই বাড়ীগুলিকে প্রায় ঠেলে নিয়ে যেত মরুসীমার কাছাকাছি।—আর ক্ষেতভরে কাজ করত চাষী।

এই সরু জমির ফালি আর ঐ হাপি আর নদীই ওদের প্রাণ—ওদের মান ওদের সর্বস্ব। কিন্তু হাপির দানকে কাজে খাটাতে হলে, চাই নিজেদের মধ্যে একান্ত সহযোগিতা। ঐ নদীর জল যদি কেউ দূষিত করে, সমস্ত দেশের তৃষ্ণা হাহা করবে মরুর মত। ঐ

খালগুলিতে যদি কেউ কখনো বাঁধ বেঁধে শুধু নিজের জমির ভোগে লাগায় তাহলে 'সেচ' ব্যবস্থা যাবে উল্টে। 'আসোয়ানের' মুখ থেকে মোহানার মুখ পর্যন্ত এক একদিক মাত্র সাত থেকে পনেরো মাইলের মধ্যে। কোন কোন যায়গায় তা এত সরু যে, প্রায় তীরভূমি অতিক্রম করে নি বল্লেই হয়। এই জন্যেই এদেশে সহরের সংখ্যা খুব কম। কারণ সহরের বড় বড় রাস্তা প্রাসাদ ইত্যাদিতে জমি নষ্ট না করে, যতটা সম্ভব চাষে খাটানোই ওরা প্রয়োজন মনে করত। গ্রামে চাষীরা তাদের খেজুরগুঁড়ির ঠেকনা দেওয়া, ঘাসের ছাউনিমেলা খড়পাতার ঘরগুলি ঠেলে নিয়ে যেত মরুসীমার প্রান্তে। প্রতি চাষীর সঙ্গে অন্য চাষীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা না থাকলে এই ক্ষীণদেহা লম্বা দেশকে এমন সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তোলা যায় না। অথচ সেই যুগে এখানে মানুষের বসতি ছিল সন্নিবিষ্ট ঘন।

সেই মানুষের দল নীলনদের আশীর্বাদ শিরোধার্য করে বাঁচতে চাইল এই দেশে। সেইযুগেই ওরা জানতে পেরেছিলো যে, পরস্পরের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতা ছাড়া এদেশে বাঁচা সম্ভব নয়। নীলনদের দান ব্যর্থ হয়ে যাবে, যদি তারা সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, যদি না স্বীকার করে নেয়, বাঁচার প্রয়োজনেই একের সঙ্গে অন্যের অবিচ্ছেদ্য যোগ, একের সুবিধা অন্যের সঙ্গে অভিন্ন যোগসূত্রে গ্রথিত। তাই ওরা সঙ্ঘবদ্ধ হোল, ওরা বাঁচল। আদিম যুগে এমন এক আশ্চর্য রাজশক্তির সৃষ্টি করল, যার অধীনে সমগ্র মিশর কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে উঠল।

ওরা বাঁচল, শুধু ফসল ফলিয়ে নয়, ওদের স্বর্ণগর্ভা নদীতীরের খনি থেকে সোনা তুলেও নয়, ওরা বাঁচল মনুষ্যত্বে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষ এই মাটিতেই চলছে ফিরছে বটে, কিন্তু পশুর মত তার দৃষ্টিকে আটকে রাখেনি মাটিতে, তাকে মেলে দিয়েছে আকাশে। প্রয়োজনের সীমা থেকে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছে

প্রয়োজনের উর্ধ্বে। এই প্রয়োজনাতীতের ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্বের প্রথম বিকাশ, এইখানেই তার সংস্কৃতির আদি সোপান, তার আনন্দের প্রকাশ।

কিন্তু মিশরের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা দুয়েরই সুরু বোধহয় প্রয়োজনের তাগিদেই, প্রয়োজনাতীতের আহ্বানে নয়। এইখানেই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন মিশরী সভ্যতার মূলগত অমিল। ভারতবর্ষ প্রয়োজনকে যেন আমলই দিল না।—বল্লে,—এহ বাহ্য। আগে চল আর। বল্লে, ঐ নিতান্ত বাইরের জিনিষটার দাবী বড় কম, সেটা যেমন তেমন করে মিটিয়ে দাও। ওকে অতিক্রম করে যে অদেহী অন্মার আনন্দ ক্বচিৎ কখনো তোমার চিত্তকে দোলা দিয়ে যায়, তাকেই ধরবার চেষ্টা কর।—বল্লে, ঐ প্রয়োজনটার দাবী তো মাত্র এই দেহটার উপরেই। কিন্তু এই দেহটারই বা কতটুকু আয়ু? ফেলে দাও, পুড়িয়ে দাও ওকে নিঃশেষে ছাই করে। থেকো না ওর মায়ায় বদ্ধ হয়ে, ও শেষ হয়ে গেলেও আমি থাকব, থাকবে আনন্দ।

এরা বল্লে,—না না এই দেহটাই সবচেয়ে বড়, এরই মধ্যে দেবতার বাস।—যে দেবতা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত, যার নাম 'ক'। কাজেই এই দেহ পবিত্র। একে নষ্ট কোর না, একে ওষুধে ডুবিয়ে, আরক মাখিয়ে রেখে দাও, কাঠের বাক্স করে, যদি সাধ্য থাকে তার উপরে দাও মোটা সোনার পাত, তাতে চিত্র বিচিত্র কত কাহিনী খোদাই করে তুলি বুলিয়ে লিখে রেখে দাও। তার উপরে রচনা কর স্তূপ, উচ্চে তোল তার চূড়া। এত উঁচু যে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ দোলা যেন লাগে না তার গায়ে।

আমরা বলেছিলাম দেহকে ভস্মীভূত করেও আমরা বাঁচব, ওরা বলেছিলো এই দেহকে নিয়েই আমরা বাঁচব। মরে গেলেও রেখে দেব এই দেহ, নীরব নির্জন পাষাণের কোলে চিরবিশ্রামের সুখ-

শয্যায়। জীবনের সব সুখ সব ভোগের উপকরণ রেখে দেব তার কাছে।—রেখে দেব শষ্য কণা থেকে সুরু করে মণিরত্নের আভরণ কৌচ কেদারা গদীপালঙ্কের বিলাস আয়োজন,—রেখে দেব অস্ত্রশস্ত্র রথ। আর তার গুহাশ্রমের দেয়ালে ছবি এঁকে লিখে রেখে দেব—তার কীর্তিকাহিনী তার নাম ধাম। তার 'ক' (আমাদের বুদ্ধিতে অনুবাদ করলে 'ক'কে প্রেত বলব না জীবসংস্কার বলব, ঠিক করা শক্ত) ভোগবিলাসে তৃপ্ত হয়ে থাকবে তার দেহের পাশে পাশে, ক্ষুধার তাড়নায়, ভোগের বাসনায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়বে না ঘর ছেড়ে।

ওরা যতদিন বেঁচে থাকে, প্রাণপণে কাজ করে, চাষ করে, তাঁত বোনে, আর পাথর ভেঙে মন্দির গাঁথে, কবর খোঁড়ে। ওদের পণ্ডিতের দল নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে রাতের পরে রাত, গোণে সূর্যের ঋতুবিবর্তনার দিনগুলি। জানতে চায় আবার কবে আসবে সেই বন্যা,—মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে যাবে কালো সোনার আঁচল। এরা আশা করে বসে থাকে, পূজো দেয় অসিরিসের মন্দিরে।—পণ্ডিত পূজারী বলে,—ভেবো না, বসে থাক আশা করে, আর ভোগ দাও, নীলদেব তুষ্ট হয়ে দেবে আবার বর।—শুনে ওরা চুপ করে থাকে। পণ্ডিতের গণনা নানাদিকে,—শেষে একদিন সে বলে দেয়, অমুক তারিখ নাগাদ নামবে ঢল।

প্রয়োজনের তাগিদেই অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র ধরা দিয়েছিল মিশরী পণ্ডিতের জ্ঞানের সীমানায়। ঋতুচক্রের কাল হিসেব করে ওরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে ভাগ করা কালখণ্ডকে বৎসররূপে কল্পনা করে নিল। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের চরম উন্নতির দিনেও, সে হিসেবের সঙ্গে দিনের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ ভাগের হিসেবে গরমিল দেখা যাচ্ছে, যে ষষ্ঠভাগ চার বছর অন্তর লীপ ইয়ারের জন্ম দেয়।

ওরা পৃথিবীর আহ্নিক আত্মপ্রদক্ষিণ ও বাৎসরিক সূর্যপরিক্রমার দিনগুলি হিসেব করে, মাসে সপ্তাহে ভাগ করা যে ক্যালেণ্ডার সৃষ্টি

করেছিল, আধুনিক ক্যালেণ্ডার তার চেয়ে খুব বেশী উন্নতি করতে পারে নি।

ফ্যারাও বংশেতিহাসের আগেকার রচনা, সোপানে গাঁথা পিরামিডের গর্তে পাওয়া গেছে এই ক্যালেণ্ডার। এ যেন আধুনিক বিজ্ঞানাধীন এই যুগটার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ কটাক্ষে যেন বলছে,—'রাখো তোমার বড়াই। ছয় সাত হাজার বছরের বিবর্তনার ফলে মানুষের বুদ্ধি কি খুব বেশী বেড়েছে? যে যুগে চারিদিকে কেবল পাথর আর সাগর আর অরণ্য, যে যুগে মানুষের বুদ্ধি সবে চেতনার আলোয় এসে পৌছেচে, এমন দিনে আমরা এই মরুবেষ্টিত ধরণীর ছোট্ট টুকরোয় বসে, আকাশ এবং পৃথিবীর মন-মিতালীর হিসেব কষেছি, বলে দিয়েছি কবে নামবে বন্যা। বন্যার জল মাপবার উপায় উদ্ভাবন করেছি।— তোমাদের আধুনিক যন্ত্রের চেয়ে তার গুণ কম নয়। আমরা জানতাম কত উঁচু বন্যায় নামবে সুখসমৃদ্ধি, কিসেই বা হবে দুঃখ দুর্দশা। বন্যার জল যদি মাত্র বারো এল বাড়ে, তবে দুঃখ ঘুচবে না, ক্ষিদে মিটবে না। তেরো এলে তবু কিছু হবে, চোদ্দতে একটু হাসি ফুটি ফুটি করবে মানুষের মুখে, পনেরোতে নিশ্চিন্ত হবে তারা, আর ষোলোতে প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়বে দেশে, ঘরে ঘরে ভরে উঠবে তৃপ্তি— নৌকো বোঝাই হয়ে যাবে দূর দেশে। হে দেব, হে নীল, আমাদের জন্যে বর এনো ষোলো এল জল—তোমার ষোলটি সন্তান তারা। বুড়ো নীলের ষোলোটি এঁড়ি গেঁড়ি সন্তান আর কিছু নয়, ষোলো এল জলের মাপের রূপকনিশান।'

* * *

ভোর ফুটে সকাল হ'তে না হতেই হোটেলে এসে জুটেছে যত দালালের দল। কেউ নিয়ে যেতে চায় পিরামিডে, কেউ বলে, চলো আগে মিউজিয়ামটা দেখিয়ে আনি। কেউ লোভ দেখায়, একদিনেই লাক্সর ঘুরিয়ে আনবে ট্যাক্সি করে। যদি লাক্সরেই

যাওয়া চলে তবে কেন উল্টো দিকেই বা চলবে না যাওয়া, কেনই বা যেতে পারব না,—আলেকজেণ্ড্রিয়া ? "রাখো তোমাদের বন্য কল্পনা,—ওসব কিছুই হবে না।" শেষ পর্যন্ত পিরামিড দেখা হয় কিনা সন্দেহ, অধীর হয়ে উঠছে খুকু, আর ট্যাক্সিদের সঙ্গে সমানে আমাদের দর কষাকষি চলেছে। এদিকে বেলা ক্রমশঃ হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে আসছে। সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন হোটেলের অফিসার, ফিটফাট একজন ফরাসী জু। এখানে এসে একটা জিনিষ ভারী আশ্চর্য লাগছে। ফরাসী আর ইটালীয়দের সঙ্গে মিশরীদের তেমন তফাৎ করা যায় না। দু'তরফেরই রংটা লালচে। বোঝা যায় রক্তে রক্তে মেশামেশি অনেক হয়েছে। অনেকের আবার দেখি পুরু ঠোঁট আর কোঁকড়া চুল। ওদের রক্তে —লিবিয়ার ঘন জঙ্গলের ইসারা। কত সহস্র বছর ধরে, কত অজস্র জাতের লোক এখানে এসেছে আর মিশেছে আর পান করছে নীলনদের জল।

ফরাসী ঈজিপ্সিয় বল্লেন,—দুপা এগোলেই ট্যুরিস্ট অপিস। সেখানে একবারে ভয় নেই, কারণ তার উপরে প্রতি মাসে সরকারী চেকিং হয়। শুনে আমাদের দলকর্তা লাফিয়ে উঠলেন। 'অপিস' এই কথাটির পরে তাঁর মোহ আছে। যেন আপিসে আর চুরি চলে না। চলে বই কি, অপিসী মানুষটি হেসে ওঠেন, তবে সে হোল গিয়ে অফিসিয়াল চুরি।

যাই হোক আমরা য়িহুদী সাহেবের কথা মত ঠিক জায়গায় এসে পৌছলাম। ছোট্ট একফালি ঘর, কিন্তু সাজানো গোছান চমৎকার।—লালটুকটুকে কার্পেট পাতা, সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা কাঠের মাচা, পিতলের রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে বসে দু'জন লোক কি যেন খুঁজছে। নীচের ঐ সরু ঘরে চার পাঁচজন হোমরা চোমরা ভদ্রলোক বসে আছেন,—তাদের গায়ে রেশমী আলখাল্লা, মাথায় মস্ত ল্যাজ দোলান ফেজ, আমাদের দেখে তাঁরা

একটু চকিত হয়ে উঠলেন। উপরের লোক দুজনের কথাবার্তাও হঠাৎ যেন থমকে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই যেন হঠাৎ কি একটা চলতি জিনিষ চলতে চলতে থেমে গেল। আমরা একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হোমরা চোমরাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কুর্ণিশ করলে,—বৈঠিয়ে, বৈঠিয়ে! ঐ সরু ঘরে অতগুলি নাম না জানা লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার মনটা কেবলি দ্বিধা করতে লাগল। কিন্তু অজানা ট্যাক্সিতে চড়তে আরো ভয়; যদিও কবি বলেছেন,—"জয় অজানার জয়", তবু আবার তিনিই স্বীকার করেছেন মনুষ্য চরিত্রের এই দুর্বলতা, "ঐদিকে তোর ভয়"। খুকু কেবলি অধীর হয়ে উঠছে, "যত সব বাজে ভয়। আমাদের সঙ্গে যখন একতিল গয়না নেই, তখন কে আর কি করবে—? ডাকাতের ট্যাক্সি হলেই বা ক্ষতি কী?" কিন্তু পিরামিডের আশে পাশে মামদোভূতের আড্ডাখানার ধারে ধারে জনশূন্য মরুভূমির শূন্যতায়, এই সুদূর প্রবাসে যদি কিছু হয়। "রাখো তোমার যদি",—মনকে কষে ধমক দিয়ে দরদস্তুর ঠিক করে বেরিয়ে এলাম।

ওরা বল্লে,—"এখন ৯টা, সব দেখে শুনে লাঞ্চের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে কথা দিচ্ছি।" বলে তারা বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন, তাঁর মাথায় ফেজ আর গায়ে বিলিতী স্যুট। তাঁকে দেখে ট্যুরিষ্ট বুরোর কর্তামশাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বল্লেন,—"আর ভাবনা নেই,—প্রফেসর এসে গেছেন, এঁর সঙ্গে যেখানে খুসী যেতে পারেন।"

প্রফেসরও মনের মত কাজ পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন,—ভাঙা ইংরেজীতে তাঁর মনের উৎসাহ জানা গেল। অনেক কম ভাড়ায় এক ছোট ট্যাক্সি ঠিক করে আনলেন। গাইড হিসাবে তাঁকে যা দিতে হবে, সব মিলিয়ে আমাদের আগের দরের চেয়ে অবশ্য একটু

বেশীই পড়ল,—কিন্তু সাইকোলজীর এমনই কারসাজী যে এবারে আর মন খারাপ হোল না। বরং প্রায় একটার দামে দুটো পেয়ে গেলাম, এই কথা ভেবে মন খুসী হয়ে উঠল, ট্যাক্সির দামে ট্যাক্সি এবং গাইড, আর যে সে গাইড নয়, একেবারে প্রফেসর,—আজে বাজে কলেজের প্রফেসর নয়, একেবারে ইউনিভারসিটীর। সত্যি, অবসর সময় গাইডের কাজ করে একসঙ্গে লোকের এবং নিজের উপকার করা, অর্থ এবং পুণ্য একই সঙ্গে অর্জন করা কম নয়। কিন্তু প্রফেসর মাথা নাড়লেন—না না, দুটো কাজ একসঙ্গে হয় না, তাই তিনি প্রফেসরী ছেড়ে দিয়েছেন। গাইডের কাজে কাজও বেশী, মুক্তিও বেশী। রোজ রোজ একই কোর্স পড়াবার এক-ঘেঁয়েমী থেকে মুক্তি। সাবাস্—আমাদের দলকর্তা লাফিয়ে উঠলেন। অমনি বেপরোয়া যদি আমরা হতে পারতুম।—

কি করে হবে শুনি? এরা তো আর পুরাকালের চাষী মিশরী নয়। এদের রক্তে আছে আরব বেদুঈনের আগুন জ্বালা রক্তের ছোঁয়া—সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ? বেপরোয়া হতে বাধা নেই।

তা বলে পাকা প্রফেসরী ছেড়ে দিয়ে লোককে কবর দেখিয়ে বেড়ানো, এ শুধু বেদুঈনী রক্তের ঝাঁজ নয়। আরো কিছু রহস্য আছে। কোথাও নিশ্চয় লুকানো আছে, বেপরোয়া মুক্তির উৎস মূল—হাঁ গো প্রফেসার মশাই, আপনি বিয়ে করেছেন?—প্রফেসর সলজ্জে ঘাড় নাড়লেন।

আঃ হাঃ, উনি লাফিয়ে উঠলেন। ওই জন্যই চাকরী ছাড়তে পেরেছেন, কারো নাকের নোলক গড়বার ফরমাস তো আর খাটতে হয় না। প্রফেসরও হাসলেন, কিন্তু গায়ে পেতে নিলেন না তাঁর ভাবী বধূর অপমান। বল্লেন, My fiance does not mind, আমার প্রিয়তমা কিছু মনে করেন না।

"কেমন এইবার?" আমি জোর পেলাম।—"আপনার ফিয়ান্সের

সঙ্গে বিয়েটা কবে হবে? যদি শীঘ্র হোত, আমরা একটা ঈজিপ্সীয় বিয়ের ভোজ খেতাম।"

"সবই কপাল"। প্রফেসর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন। "বিয়ে যে কবে হবে জানি না।"

কেন, কেন?

কারণ সেই সনাতন। সমস্ত এশিয়ায় এই একই কারণ। প্রাচীন ও আধুনিকের দ্বন্দ্ব। প্রফেসরের প্রিয়া হলেন আধুনিকা। তাঁর ফ্রকের ঝুল হাঁটুর নীচে নামে না, তাঁর বব্ করা চুল, আর ঠোঁটে রাঙা রঙ। এদিকে প্রফেসরের মা প্রাচীনা। বাড়ির বাইরে পা দিতে হলে, নিজেকে ঢেকে নেন বোরখায়। নখে মেহেদি-পাতার রঙ থাকলেও, অধরে রক্তিমা স্পর্শ করাতে তাঁর ঘৃণা। একা একা খোলা পথে পা বাড়াতে তাঁর ভয়। এই ভয়ঙ্কর অমিল-যুগলের মিল করাতে প্রফেসরের আবার ভয় হয়। পাছে সব কিছু গরমিল হয়ে যায়। তাই প্রফেসর অপেক্ষা করে আছেন, যতদিন না উভয়ে উভয়ের কাছে এগিয়ে আসছে, স্নেহে এবং শ্রদ্ধায়,—চেষ্টা করছে পরস্পরকে বুঝতে, ততদিন পর্যন্ত না হয় জীবন শূন্য হয়েই থাক।

গাড়ী চলেছে গড়িয়ে, শহর শেষ হয়ে শহরতলীর পথ ধরেছি। চওড়া, কালো, পালিশ করা রাস্তা সোজা চলে গেছে। এপাশে দেখা যায় একটু দূরে, তরঙ্গায়িত বালির রেখায় সবুজের পাড় গেছে কেটে। মাঝে মাঝে জলা, তাতে ফিকে ঘাসের জঙ্গল। রাস্তার দুধারে পাম গাছের সারি, আর তার পরেই প্রাসাদ শ্রেণী। সবগুলিই ঝক্‌ঝক করছে। কে জানে কত ওদের বয়স? কিন্তু ওদের মধ্যে মিশরী চরিত্রের দৃঢ় কাঠিন্য লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ওদের গড়ন আধুনিক বটে, কিন্তু ওদের ঢঙে ঢাঙে পিরামিডের বলিষ্ঠ দৃঢ়তা। আর ওদের চারপাশ ঘিরে বাগানের পাড়।

এ সব কাদের বাড়ী? সব আমীর ওমরাহদের। কতক বা

ফারুকের নিজস্ব সম্পত্তি—ধনী ব্যবসায়ীদের ভাড়া খাটে। বাড়ীগুলি কি চমৎকার সুন্দর!

"কিন্তু", প্রফেসর বল্লেন,—"রাজদম্ভে পূর্ণ।"—রাজশক্তির অবসান তো হোল,—এখন কি এ বাড়ীগুলি সাধারণের কাজে লাগবে? এ প্রশ্নের জবাব মেলে না। সাধারণ কারা? তারা কোথায় আছে?—এই সহরের বিশাল প্রাসাদগুলির আনাচে কানাচে কোথায় তারা লুকিয়ে আছে কে জানে! বাইরে থেকে কয়েকদিনের জন্যে এসে যারা অনেকদিনের খোরাক সংগ্রহ করে নিতে চায়, তাদের ঘুরে বেড়ানোর পথে এরা তো তেমন করে পড়ে না। ভিখিরিও তো তেমন দেখলাম বলে মনে হোল না। আছে নিশ্চয় লুকিয়ে ছাপিয়ে কোন কোন গূঢ় পাড়ার অলিগলির ছায়ায় ছায়ায় মিলিয়ে। আমাদের দেশের মত চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে বেড়াচ্ছে না। কিন্তু নাঃ,—কোথাও তাদের দেখতে পেলাম না। সেই যে রুক্ষকেশ উলঙ্গপ্রায় জীর্ণশীর্ণ প্রেতায়িত মানব সন্তানের দল ভারতের তীর্থে তীর্থে, পথে পথে, প্রতি মন্দিরের দ্বারে দ্বারে, পণ্যবিপনীর আশে পাশে হাত বাড়িয়ে পথিকের পিছন পিছন ছুটতে থাকে,—তারা কোথায়? এদেশে তো তাদের অস্তিত্ব বেশী রকমই ছিল জানতাম। তবে কেন দেখতে পেলাম না? জিগ্যেস করতে ভরসা হোল না। পাছে ফস্ করে বলে বসে, রাজশক্তির অবসানে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সেই বানিয়ে তোলা মিথ্যে দারিদ্র্যের হাত থেকে খানিকটা উদ্ধার করতে পেরেছে নিজেদের।

যাই হোক, এসব হোল আধুনিক ঈজিপ্টের কথা। আমি কিন্তু দেখতে গিয়েছিলাম প্রাচীন ঈজিপ্টকে, যার ছবি আজো এদের সমাধি মন্দিরের নানা উপকরণের গায়ে গায়ে নানা রঙের তুলির ফলকে লেখা আছে। মিউজিয়ামে রাখা ঐ চিত্রগুলি রুদ্ধকালের যবনিকা একটুখানি খুলে দিয়ে মানুষকে নিয়ে যায়

সাত আট হাজার বছর আগের মানুষের জীবনে। ঐ যে নৌকো বোঝাই হয়ে পাপিরাস চলেছে,—তাঁত বুনছে তাঁতী, হিসাবে লিখছে সরকার, গয়না গড়াচ্ছে স্যাকরা, আর বাটনা বাটছে ময়দা ঠাসছে দাসদাসী। ঐ যে সরু নৌকায় করে রাজা চলেছেন মৎস্যশিকারে, পদ্মসরোবরে—সঙ্গে চলেছেন সখীরা। তাঁদের গায়ে সূক্ষ্ম সাদা আগুল্‌ফলম্বিত উড়নি দুই কাঁধ বেয়ে পিঠ ঢেকে ঝুলছে। তাঁদের কপালে চুলের টায়রা, চুলের বাবরী ঘাড়ের নীচে ঝালরের মত দুলছে, আর গলায় নীলাপ্রবালে গাঁথা চওড়া চিক্‌। কোথাও সূক্ষ্মবেশধারিণী বীণাবাদিনী গায়িকার দল। কোথাও মাননীয় অতিথির পরিচর্যা চলেছে, দাসীরা বয়ে আনছে ভারে ভারে ফুল ফল। কোথাও পদ্মবনে হংসযুগল তাদের বিচিত্র রঙীন ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে।

ওদের ছবিতে যেমন সূক্ষ্ম কারুকলা, টেম্পারার উজ্জ্বল বর্ণিকাভঙে বিচিত্র রূপের ছন্দ, ওদের ভাস্কর্য কিন্তু তেমনি কঠিন গম্ভীর বর্ণহীন। ওদের স্থাপত্যেও সেই রীতি। কী কঠিন ওই পিরামিড—ওই যে দেখা যাচ্ছে, অদূরে, বিরাট বালু সমুদ্রের মাঝখানে, ধূসর প্রহরীর মত, নীল আকাশের উধাও স্বপ্নের কাছে মূর্তিমান রসভঙ্গের মত দাঁড়িয়ে আছে, ওর মধ্যে না আছে রূপ, না আছে রঙ, না আছে কোন আনন্দ। শক্তির লীলা অথবা শক্তির দীপ্তি দেখতে পেলাম না। মনে হোল, ওই ত্রিকোণ পাষাণের উচ্চ চূড়ায় শুধু অন্ধশক্তির মূঢ় আবেগের অধিকার।

কায়রো থেকে "গীসের" এই পিরামিড মাত্র ন'মাইল দূরে। পীচে বাঁধানো মোটরের সোজা সড়ক একেবারে মরুপ্রান্তে এসে থেমেছে।

পুরাকালে এই সমস্ত জুড়েই মরুভূমি ধূ ধূ করত। "মেমফিস্" নগরী ছিল অনেক দূরে,—অন্তত মাইল কুড়ি তো হবেই।

প্রাসাদে, মন্দিরে, বাগানে বাজারে, স্তম্ভে এবং সৌধে, আলোক মালায়, রূপে রঙে নৃত্যে গানে আমোদ বিলাসে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় যে নগরী তিন হাজার বছর ধরে ঝলমল করতে করতে দপ্ করে নিভে গেছে, অদূরে দেখতে পেলাম তার ধ্বংস-স্তূপের উপরে এক সারি খেজুর গাছের মালা। প্রফেসর হাত তুলে দেখালেন—ঐ দেখ পুরোণো সহর।—কই কোথায়? ঐ যে বালিয়াড়ির উপরে খেজুর গাছের বীথিকা,—বিধাতার আপন হাতের স্মারক চিহ্ন, যত্নে গাঁথা মালা। তার উপরে আকাশে জ্বলছে, 'আতন্' দেবের তরোয়াল ইস্পাতের মত।

ওই মেম্ফিস্ নগর থেকে হৃতপ্রাণদের নিয়ে আসা হোত এই পশ্চিম মরুপ্রান্তে—যে দিক সূর্য নামে অস্তাচলে। বালির নীচে গর্ত খুঁড়ে, চামড়া অথবা মাদুরে মুড়ে শুইয়ে দিত তাদের। ঢেকে দিত বালি দিয়ে।

কবে কেমন করে ওরা 'মমি' করতে শিখল কে জানে। আরবী ভাষায় 'মমি' অর্থ পীচ। আরবরা এদেশে এসে মৃত দেহগুলির গায়ে কালো রঙমাখা দেখে, ওদের নাম দিয়েছিল 'মমি'। কিন্তু ওদের মৃতদেহ রক্ষার অসংখ্য বিচিত্র প্রক্রিয়ার প্রায় কোনটাই আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকু জানা যায় যে 'মমি' করার জন্য বিশেষ শ্রেণীর লোক থাকত। তাদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে দেহ দিয়ে দেয়া হোত। সত্তর আশী দিন ধরে নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহগুলি প্রস্তুত হোত। তখন মস্লিনের মত অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ওষুধ আরকে ভিজিয়ে দেহের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধত।

জানতে ইচ্ছে করে ঐ মসলিন কি বাংলা থেকে আমদানী হোত? ছয় হাজার বছর আগে কি বাংলার সঙ্গে মিশরের কোন যোগ ছিল? না কি—দুই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তুলার ফসলের সাদৃশ্য এনেছে তাদের তাঁতের কারিগরীতে মিল। কিন্তু

এর মধ্যেও ভাববার কথা এই যে, যদিও আজকের দিনে মিশরের প্রধান উৎপাদন তুলো,—সে যুগে মিশর ছিল শস্যের খনি।

কে জানে কবে কোন রাজার প্রথম খেয়াল হোল তাঁর দেহের উপরে চিরস্থায়ী গৃহ রচনা করতে হবে। খবর রটল দিকে দিকে—দক্ষিণের পার্বত্য অঞ্চল আসোয়ান থেকে দলে দলে লোক জুটল এসে। তাদের কোমরে জড়ানো সাদা কোপীন, মাথার বাবরী চুলে সরু গামছা বাঁধা। তারা আশায় উৎসাহে ছুটে এল। জয়গান গাইলে রাজার জন্যে, যে রাজা দেবতার মতই মহীয়ান,—নীলনদের মত গরীব পরবর,—দয়ার সাগর। নদী খাবার দেয় বছরে ন'মাস,—বাকী তিন মাসের ভার নিলেন রাজা।

এই তিন মাস, যখন বানের জলে ঢাকা পড়ে থাকত তাদের চাষের জমি, তখন ভিক্ষা এবং উপবাস এবং মৃত্যুই ছিল তাদের একমাত্র গতি। ফ্যারাও দিলেন নূতন পথের ডাক, নূতন কর্মের আহ্বান। ওরা চাষী ছিল, হোল শ্রমিক, অন্তত তিন মাসের জন্যে। এই সময়টা প্রায় সমস্ত দেশের সমস্ত জনসাধারণ ফ্যারাওর স্বর্গবাসের গৃহরচনার কাজে লেগে গেল।

তারপর যখন জল নেমে গেল, আর নূতন জমি নূতন মাটির ভিজে সুগন্ধে চাষীদের ডাক দিল ইশারায়, তখন দলে দলে লোক কুড়ুল ছেড়ে কোদাল নিয়ে লাফিয়ে পড়ল—থুড়ি, কোদালও হয়ত নয়, নতুন জলে ধোয়া নতুন মাটির আলগা বাঁধনে কোদাল বসাবারও প্রয়োজন হোত না। বিনা লাঙলে চাষ হোত। ওরা খোলা মাটিতে ছড়িয়ে দিত বীজকণা। দেখতে দেখতে সবুজ শস্যে ঝলমল করত ক্ষেত। "হোরাসের" মন্দিরে বলি হোত, ভোগ আসত ফলের এবং সুরার। মৃতমন্দির রচনায় ঘটত বিঘ্ন। কাজ গড়িয়ে চলত মন্থর গতিতে অতি ধীরে, শুধু দাসদের দ্বারা, যারা নুবিয়া ও লিবিয়ার গহন অরণ্য থেকে হঠাৎ এসে পড়ত সভ্যতার বোঝা বইতে।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন রাজা। কাজ চাই, কাজ—আরো আরো কাজ—ওই যারা নুব্জপৃষ্ঠে কুব্জদেহে পাষাণের বোঝা নিয়ে মরুভূমির পথ বেয়ে সারি সারি আসছে,...দলে দলে হাজারে হাজার,—ওদের দুর্বলতাকে ক্ষমা করেন না ফ্যারাও। ওরা অলস তাই অক্ষম,—তাই ওদের প্রতি ঘৃণার অন্ত নেই ফ্যারাও দেবের। বেতের পর বেত পড়ে ওদের পিঠে, ওরা ধুঁকতে ধুঁকতে মরতে মরতে চলে, —চলতে চলতে মরে। সেই মৃতের স্তূপের উপরে গড়ে ওঠে জীবিত রাজার ভাবী প্রেতের মন্দির।

—ঐ তো আজো দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণ করে বহু সহস্র বছর আগের মানুষের দুরাশা,—ঐ যে মস্ত একটা পাহাড়ের মত অভ্রংলিহ ধূসর চূড়ায় নীল আকাশকে ফুঁড়েছে।

পৌঁছে গেছি পিরামিডের কাছাকাছি। পৃথিবীর সর্বোচ্চ সমাধি-মন্দিরের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলাম।

কুঁজের উপরে হাওদা চড়িয়ে বেদুইন সহিসদের লাগামবদ্ধ হয়ে উটেরা বেড়াচ্ছে ঘুরে। ওদের নিরীহ চোখে হাসির ঝিলিক, দেখে মনে হয় যেন সব জানে সব বোঝে, শুধু রহস্য করে চুপ করে আছে। জেনেশুনে বোবা সেজে বসে আছে। যদি মুখে কথা ফুটত হয়ত হেসে উঠে বলত,—"উঃ কী বোকা!" সত্যি আমরা কিন্তু বোকার মতই দাঁড়িয়ে রইলাম, আর আমাদের ঘিরে চারিদিক থেকে উষ্ট্রপালকরা দর কষাকষি সুরু করে দিল।

..."রক্ষে কর, এই রোদ্দুর মাথায় নিয়ে উটে চড়ার সখ নেই।" অমনি একজন বলে উঠলেন,—"কেন মা, উটে চড়লে কি রোদ বেশী লাগবে না কি? রোদ তো সব জায়গাতেই সমান"। অন্যজনের এখনো অত যুক্তির ক্ষমতা নেই, সে শুধু লাফাতে লাগল, "হ্যাঁ মা—উটে চড়ব।" বোঝা গেল আমাদের সখে ভাঁটা পড়ে এসেছে বটে, অন্যপক্ষের সখের এই সবে সুরু। এতদূর মরুভূমিতে এসে ওদের উটে চড়ার সখের মর্যাদা না দিলে চলবে কেন।

—"বেশ তবে তোরা উটের পিঠে আয়, আমরা হেঁটে চলি।"

—"বাঃ বয়স হওয়াটা এমন কি অপরাধ যার জন্যে উটে চড়ায় ফাঁকি পড়তে হবে"? দেখা গেল তথাকথিত বয়স্ক লোকটির চোখে ছেলেমানুষী সখের নেশা। "বেশ চড়।" তখন একটায় লালী আর তার বাবা, আর অন্যটায় খুকু রওনা দিল। আমি চললাম পায়ে হেঁটে।

ওরা এগিয়ে গেল।—তীক্ষ্ণ রোদের ঝলক সর্বাঙ্গ বিঁধিয়ে সবুজ চশমার ভিতর দিয়েও চোখে এসে ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। ছোট একটু অভিমানের ছায়া সেই রোদের উপরে কালো হয়ে পড়ল। বেড়াতে এসে এই রোদ্দুরে একা একা হাঁটার দুঃখ পায়ে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। কই কেউ তো আর দ্বিতীয়বার সাধল না। যে যার নিজের বাহনে চড়ে চলে গেল। ইচ্ছে হোল চেঁচিয়ে বলি —আর একবার সাধিলেই উঠিব। কিন্তু কোথায় কে? ঐ দূরে ওরা চলেছ, আমার দৃষ্টি অতদূরে চলেছে বটে কিন্তু গলা পৌঁছবে না। আর একটা উটে চড়ে গেলে কেমন হয় —উল্টোদিক দিয়ে?

খুঁজে পাবে না যখন, বেশ হবে—ভাববে এই পিরামিডের মৃত্যুগৃহের দ্বারের কাছে কি হ'তে কি হোল কি জানি!

কিন্তু ওদের কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হতে হয়। কেমন এগিয়ে চলেছে।—পিছন ফিরে একবার চাইলোও না। ঝুঁকে আবার কি যেন বলাবলি হচ্ছে।—নাঃ, যতটা হৃদয়হীন ভাবা গিয়েছিলো ততটা নয়।—ওরা উটের মুখ ফিরিয়েছে। আমাকে দেখতেও পেয়েছে এবং আমারই উপরে খুব রাগ দেখিয়ে কী যেন বলছে।—পিছিয়ে পড়েছি কেন এই বোধহয় অভিযোগ।—

ওরা বললে—"সখ মিটল তো? এখন ওঠো।—স্বর্গে পৌঁছতে গেলে সিঁড়ি ভাঙতেই হবে।—একা বেড়ানোর সখে যদি অরুচি ধরে থাকে তো উটে চড়ার দুঃখও তোমাকে সইতেই হবে।"—অগত্যা উট-বাহিনী হতেই হোল। কিন্তু রাগ গেল না।—উপরন্তু ওর ঐ অজস্র

সুলভ নিরীহ শান্ত চোখকেও যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার সেই কথা মনে হোল—জেনে শুনে ন্যাকা সেজে আছে।—চেঁচিয়ে বল্লাম,—"খুকু, এই উষ্ট্রই বেচারা কালিদাসকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, আজ আমাদের রাবড়ি খাওয়াবে কিনা কে জানে।"

আমার কথায় কর্ণপাত না করে মরু-সম্রাজ্ঞী দুলে দুলে পিরামিড প্রদক্ষিণ করতে সুরু করলেন। সর্বাঙ্গে মন্থিত হোল তপ্ত সূর্যের প্রবাহ।

পিরামিডের একপাশে স্ফিঙ্কস্। স্ফিঙ্কসের প্রভাব পিরামিডের চেয়ে কম নয়। সাদা বালির উপরে সাদাটে পাথরের এই বিশাল নরসিংহ মূর্তি হাজার ছয়েক বছব ধরে পিরামিডকে পাহারা দিচ্ছেন—সমাধি মন্দিরের যোগ্যতম দ্বারী। কে জানে ছ'হাজার বছর আগে এর রূপ কেমন ছিল।—পাথরের যন্ত্র দিয়ে পাথর ঘসে ঘসে সেই প্রস্তর যুগের শিল্পী তাঁর কল্পনার যে রূপ এই পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, আজ তার চিহ্ন নেই। কালের বাতাস মুহুর্মুহু ঘসে ঘসে তার নাকমুখ একাকার করে দিয়েছে। তবু সেই খণ্ডিতনাশা মহাবীর বালির উপরে দুই থাবা বিস্তার করে, বহু সহস্র বছর ধরে এখানে বসে আছেন।

স্ফিঙ্কসের কৃতিত্ব সম্রাট শেপ্রেনের।- সিংহের দুই থাবার মাঝখানে তাঁর একটী ছোট মূর্তি ছিল। এখন সেই ছোট মূর্তিটির বদলে পাওয়া যায় একটী ছোট পাথরের লিখন—তাতে লেখা আছে এক কাহিনী।

স্ফিঙ্কস্ যিনি তৈরী করেছিলেন তিনি মারা যাবার পরে আরো হাজার দুই বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে কত রাজা এল গেল, মিশরের রাজনীতিচক্রে কত পালার বদল হোল।—কালের হাওয়া বালি উড়িয়ে বয়ে গেল এই স্ফিঙ্কসের উপর দিয়ে।—ক্রমে ঢেকে গেল তার দেহ। -আর তাকে চেনার উপায় রইল

না—মনে হোত, ও যেন পিরামিডের পায়ের কাছে উঁচু একটা বালিয়াড়ীর স্তূপ।

একদিন লোকজন উট গরু সৈন্য সামন্ত নিয়ে উজীর চলেছেন। পথে আশ্রয় নিতে হোল এই পিরামিডের নীচে।--রাতে শুয়ে আছেন ঐ বালির ঢিপির উপরে, উটের চামড়ার শয্যা পেতে। নির্মেঘ আকাশে লক্ষ তারা ঝিক্‌মিক্ করছে আর দিনের গরম বাতাস অন্ধকারের সমুদ্রে ডুব দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে। মরুবক্ষের সেই ধূ ধূ শূন্যতার মধ্যে শুয়ে পড়ে শ্রান্ত পথিক ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এলেন স্ফিঙ্কস,—বললেন, —আমাকে এই অন্ধ বালির তলা থেকে উদ্ধার কর।—আমি তোমাকে রাজা করে দেব—সমগ্র মিশরের ফ্যারাও।

পূবদিক রাঙা করে সূর্য উঠল যখন, তখন উজীর প্রস্তুত হলেন তাঁর স্বপ্ন সফল করতে।—খবর রটল চারিদিকে। -দাসেরা খাটো কাপড় আঁট করে কোমরে কষে, বাবরীচুলে ফেটি বেঁধে, তামার কোদাল আর পাপির ঘাসের ঝুড়ি করে বালি সরাবার কাজে লেগে গেল। দেখতে দেখতে মাথা ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠলেন স্ফিঙ্কস্। দু'হাজার বছরের বালির আবরণ খসে গিয়ে বেরিয়ে এলেন এই নৃসিংহ মহারাজ।—তাঁর দুই থাবার মধ্যে—শেপ্রেনের মডেল।

এই মূর্তি নির্মাণের কৃতিত্ব যদি বা শেপ্রেনের হয়, একে আবিষ্কারের গৌরব উজীরের।—তাই যখন স্ফিঙ্কসের বরে উজীর হলেন ফ্যারাও এবং নাম নিলেন দ্বিতীয় থুংমোসিস, তখন শেপ্রেনের মূর্তির বদলে একটা ছোট ফলকে লিখে রেখে গেলেন এই স্বপ্নাদ্য কাহিনী।

স্ফিঙ্কসের পায়ের কাছে পাথরে গাঁথা সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম মন্দিরে, চৌকো পাথরের স্তম্ভগুলিতে সেকেলে পালিসের

আভাস এখানে ওখানে টুকরো টুকরো হয়ে মুছে মুছে আছে।—বাকি সব এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ।—

আমাদের গাইড প্রফেসর বল্লেন, আর এখানে সময় নষ্ট না করে চলুন পিরামিডের ভিতরে নামা যাক। - বেশ চল, কিন্তু তার আগে লালীর সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ শেষ করতে হবে। ওকে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে অত নীচে নামা হয়ত ঠিক হবে না।—কিন্তু ওই বা কেন থামাবে তার জিদ্! —সেও তো মনুবংশ সম্ভূতা,—মনুজাই বটে।—অনেক বকাবকি, অনেক ভূতের ভয়, অনেক খেলনার লোভ দেখিয়ে ওর মরালটা ভাঙার চেষ্টা হোল। অবশেষে যখন প্রফেসর বল্লেন যে তিনি ওর কাছে থেকে একটার পর একটা গল্প বলে যাবেন, তখন ও অনুমতি দিলে,—আচ্ছা তোমরা যেতে পার।—প্রফেসর বল্লেন, সিঁড়ির মুখে পাণ্ডা গাইড পাবেন,—তাদের সঙ্গে নির্ভয়ে দেখে আসুন,—আমি লালীর সঙ্গে গল্প করব।—

বেদুইন গাইডের সঙ্গে আমরা পিরামিডের ভিত্তির উপরে আরোহণ করলাম।—দূরে দাঁড়িয়ে লালী হাত নাড়ল।—অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে ও তখন ব্যস্ত।—জানে, যেতে যখন পাবেই না তখন যথালাভ ওই স্বল্পক্ষণের স্বাধীনতার মজা।

পিরামিডের উপরে যায়গায় যায়গায় এখনো প্রাচীন পলাস্তারার চিহ্ন আছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সব সভ্যজাতির মধ্যেই পাথরের উপরে কোনরকম পালিশ বা পলাস্তারা ব্যবহার করার রেওয়াজ ছিল, আধুনিক যুগ ভুলে গেছে যার ব্যবহার।—গ্রীসেও বহু পালিশকরা মূর্তি ও স্তম্ভ পাওয়া গেছে।—কিন্তু এ বিষয়ে অশোক স্তম্ভের খ্যাতি বোধ হয় সবচেয়ে বেশী।—

পিরামিডের গা বেয়ে উপরে ওঠার অনেক সরু সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুদূরে উঠলে একটা অপরিসর গুহার প্রবেশদ্বার।—সুড়ঙ্গমুখে অনেক লোকজন।—একদল যাচ্ছে তো আর একদল বেরুচ্ছে।—আমাদের মাত্র তিনজনের দল,—সঙ্গে

বেদুইন গাইড।—গর্তের ভিতরে ঢুকতেই ভ্যাপসানি গন্ধের ঝাপটায় বোঝা গেল—পৃথিবীর ভিতর মহলের রাস্তায় এসে পৌঁছেছি।

পিরামিডের গর্ভগৃহে রাজারাণীর মৃতদেহ রেখে ওরা সেখানে পৌঁছাবার জন্যে একটা রাস্তা তৈরী করত বটে,—কিন্তু পথটীকে একেবারে লুকিয়ে রাখতে হোত কবর চোরদের ফাঁকি দেবার জন্য।—নইলে চোরদের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারত না যাদের বাঁচাতে চেয়েছিলো কালের হাত থেকে। চোর ভোলাবার জন্যে মন ধাঁধানো অনেক মিথ্যা পথ, অনেক বন্ধ অলিগলির সৃষ্টি করেছিলো ওরা।—

পিরামিড রাজ্যের মৃত অধিবাসীরা সে যুগে চোরদস্যুদের হাতে বড়ই নাস্তানাবুদ হতেন। তাঁদের রক্ষণকারীরা তাই সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে চেষ্টা করেছে নানা উপায়ে মৃত দেহ রক্ষার। প্রাচীনকাল থেকে মিশরে চোর ডাকাত,—বিশেষত কবর চোরের প্রাদুর্ভাব ছিল।—সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের করে, শীতে গ্রীষ্মে খোলা মাথায় কটিবাস মাত্র সম্বল করে যাদের দিনান্তে দু'মুঠা অন্নের বদলে পরের মৃতদেহের জন্যে সৌধরচনা করতে হোত, তাদের পক্ষে মৃত্যুকে ভয় অথবা মৃতকে সম্মান করা অর্থহীন। অপরিসীম দারিদ্রের চোখের সামনে অপর্যাপ্ত ধনদৌলত মাটির নীচের অন্ধকারে অনন্তকাল ধরে মৃতের তুষ্টির জন্যে ব্যর্থ হয়ে পড়ে থাকবে এই কল্পনায় সেদিনের মানুষ প্রেতলোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ভয় পায়নি।

ক্ষুধাই যে চিরকাল মানুষের মধ্যে থেকে চোর ডাকাত সৃষ্টি করে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়।

ভূগর্ভে প্রোথিত এই অজস্র ধনদৌলতের খবর পৃথিবীর সর্বত্রই রটেছিলো। মরুপ্রান্ত পার হয়ে মধ্যএশিয়ার সমৃদ্ধ দেশগুলি থেকেও আসত শিক্ষিত ডাকাতের দল,—লুটে নিয়ে যেত মৃতের

সম্পদ। এমনি কতকাল ধরে এদের কবর চুরির ব্যবসা চলেছে কে জানে। আলেকজাণ্ডারের ঈজিপ্টজয়ের মধ্যেও এই উদ্দেশ্যের একটা ক্ষীণ আভাস ছিল কিনা কে বলতে পারে। তারপর কত যুগ কেটে গেল। গ্রীক ঈজিপ্টের মিশ্র সভ্যতা খৃষ্টধর্মের প্রবল বন্যায় সবে ভেসেছে, এমন সময় ৭০০ খৃষ্টাব্দে,—আরব খলিফার সেনাপতি 'ওমর' ওইরকম একদল ডাকাত সৈন্য নিয়ে লুটতে এল মিশরের কবর,—আর সেই সুযোগে ভগ্নরাজশক্তি গোটা মিশর দেশটাই লুটে নিল।

'গিসে'র পিরামিড লুটতে এসে ওরা বাধা পেয়েছিল এই বিফল দেয়ালের অলিগলিতে। কিন্তু ওরা তো যে সে চোর নয়, রাজ-ডাকাতের দল, তাই মানল না বাধা। নতুন করে তৈরী করল সুড়ঙ্গ পথ। সেই পথ ধরেই আজকের টুরিষ্ট তার কৌতূহল মেটায়। পুরোণো পথ কত অন্ধ পাথরের গহন নিগূঢ়তায় বন্ধ হয়ে আছে, আজো জীবিত মানুষের চোখে তার সন্ধান মেলে নি। ডাকাতের পথও কিন্তু কিছুদূরে গিয়ে থেমে গিয়েছিল,—পারে নি ঈপ্সিতকে আবিষ্কার করতে। সেই বিপুল ধনসম্ভার তেমনি নিষ্পলকনেত্রে চেয়ে বসেছিল বিংশ শতাব্দীর মানুষের হাতের স্পর্শ পাবে বলে। ১৯২৫ সালে মানুষ প্রথম এই কবর ঘরে ঢুকেছিল,—৬০০০ বছর পরে।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতরে কম শক্তির বিদ্যুৎ আলোর ব্যবস্থা। সেখান দিয়ে ঘুরে ঘুরে সরু সরু অনেক খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে নেমে আমরা রাণীর সমাধিঘরে এসে পেঁছিলাম। ছোট একটা ঘরের এক কোণায় একটুখানি পাথরের ফাঁক। সেখান থেকে একফালি সূর্যের আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে শূন্য ঘরের মেঝেতে। ঐ ফাঁকটুকু নাকি ছিল রাণীর আত্মার বাইরে যাবার পথ। অন্ধভূমিগর্ভে মৃতদেহের বন্ধ কারাগার ভেদ করে মহাশূন্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে আত্মীয়তা পাতিয়ে আসার ঐ একটীমাত্র পথ।

ঘরটার একেবারেই ঘরছাড়া ভাব। কোথায় বা তার দীপাবলী, —কোথায় বা তার আসবাবপত্র, সোনা রূপা হীরা মাণিক, যার জন্যে এত লোকের এত দিনের পরিশ্রম, ভাঁড়ার উজাড় করা যার প্রেতলোকের পাথেয়। আজ শূন্য ঘর হাঁ করে রয়েছে। না আছে ঐশ্বর্যের চিহ্ন,—না আছে সেই বিশ্বাস, যার জন্যে ওরা মৃত্যুর উদ্দেশে দান করে যেত চিরজীবনের পরিশ্রম। তবু কিছুই কি নেই? এমন কি সেই আত্মারাও, আশ্রয়হীন, দেহহীন হয়েও যাদের অস্তিত্ব বাধা পায় না।

মনে মনে একটু ভয় পাবার চেষ্টা করলাম,—এমন অবস্থায় এমন পরিবেশে ভয় পাওয়া উচিত বই কী,—কিন্তু অনেক লোকের নানা ধরণের প্রশ্নোত্তরের হট্টগোলে ভয়েরা সব ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। শোনা গেল, এই কবর যখন প্রথম খোঁড়া হয়, তখন এর ভিতরে অতুল ধনভাণ্ডার দেখে মানুষ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়েছিলো, ভিতরে রাণীর দেহ নেই দেখে।—যার জন্যে এত বিলাস বৈভব, বৈতরণীপারের এত ভোগের আয়োজন, সেই রাণীর মৃতদেহই এখানে ছিল না। কেন? কে বলতে পারে কেন?—কত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে, কত অত্যাচারে, কত সন্দেহে অবিশ্বাসে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল সে যুগের মৃত্যু ও জীবন,—কে আর স্মরণ রেখেছে তার ইতিহাস? যদি কেউ রেখে থাকে তবে সে এই পিরামিড। আজ যদি পিরামিড ভাষা পেত, তবে তার বলার বেগে এই গুপ্ত গৃহ থর থর করে কেঁপে উঠত,—গম্ভীর গর্জনে ভূগর্ভ গুম্ গুম্ করে গলিত অগ্নির স্রোতে নীল নদ জ্বলে উঠত, আর তারি হাওয়া আকাশ বাতাস দগ্ধ করে সূচীতীক্ষ্ণ বালুর ঝড় উড়িয়ে হাহা করে ছুটত।—ওই তো শোনা যাচ্ছে গুরু গুরু আওয়াজ,—ওই তো চারপাশে কাদের অস্পষ্ট পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছি। পাঁচ হাজার বছরের আত্মারা আসছে,—পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে ওরা আসছে চুপি চুপি, চুরি করে শুনে নিতে নিজেদের ইতিহাস,—আর একবার

ফিরে যেতে নিজেদের গত জীবনের মাঝখানে, যে জীবনের বোঝা তারা ফেলে গিয়েছিলো এইখানে।—অনেক পরিশ্রমে অনেক বুদ্ধি খরচ করে, অনেক উপকরণের সাজ চড়িয়ে, নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রলেপ বুলিয়ে, ব্যর্থ অমরতার ভাণ করার চেষ্টা করেছিলো।—সেই বোঝাগুলি আজ মিউজিয়ামের কাচের আলমারীতে বন্ধ।

কতকাল হয়ে গেল,—কত মেঘ জমে জমে জল হয়ে ঝরে পড়ল। কিন্তু এদেশের আকাশে শুনি নাকি মেঘ জমে না,জল ঝরে না,—শুধু হাওয়ায় ওড়ে বালি,—শুকনো তপ্ত সূর্যদগ্ধ বালি।— তারা কালে কালে উড়ে উড়ে মরুর সীমানা বাড়িয়ে নিয়ে চলল।—তবু ওদের আত্মারা কি শান্তি পেল না?—ওদের আত্মা,—ওদের "ক"—ওদের জড়জীবনের বাসনা সংস্কার কি এখনো এই পিরামিডের পাথরের খাঁজে খাঁজে নিষ্ফল মুক্তির আবেদনে মাথা কুটে মরছে। এখনো মরুভূমির নির্মেঘ কঠিন অনাবৃত অমলিন দেবতার মত দ্যুতিমান গলিত সূর্যের দীপ্ত নীলিমায় বিলীন হয়ে যেতে পারে নি? ওই তো শুনতে পাচ্ছি,— পদশব্দ দ্রুততর হচ্ছে, নিশ্বাসপতন গভীরতর হচ্ছে, ওই যে চাপা ফিস ফিস, যেন কারা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে টেনে টেনে কথা কইতে কইতে আসছে—

ও হো, ওরা আর কেউ নয়, আমাদেরই মত আর একদল সাধারণ দর্শক, খাড়া সিঁড়ে বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে আর ফিস ফিস করে কথা কইছে। আহা, এতক্ষণে একটু রোমান্সের গল্প পেলাম না। ভূত হলে ভয় ছিল যদিও, তবু নেহাৎ মন্দ হোত না, অন্তত লেখার খোরাক কিছু মিলত, কিন্তু ওরা নেহাৎই মানুষ। আমাদেরই মত, ভূত নয়,—ভূতের বাহন। অবশ্য আমাদের ভূতের কথা আলাদা।—গরীব ফকিরের দেশের ভূতদেরও ফকিরিগীরির বেশি আর কিছু জুটবে না। তাদের মৃতদেহের উপরে কোনদিন পিরামিড রচিত হবে না,—শুধু গঙ্গার জলে ভেসে যাবে কয়েক মুষ্টি

ছাই। আবার কোন শস্যক্ষেত্রের পলিমাটিতে প্রাণের রস সঞ্চয় করে রাখবে কে জানে? কিন্তু কোথায় যাবে বাসনা, কোথায় যাবে সংস্কার, আর কোথায় যাবে আত্মা?—দূর হক যত মৃতকল্প কল্পনা, ইংরাজীতে যার নাম মরবিডিটি। স্বীকার করছি দোষ, কিন্তু এই মাটির নীচে, পিরামিডের গর্ভলীন কবরের ভ্যাপসা গন্ধে, ও ছাড়া আর কি ভাব মনে আসতে পারে? কি পারে, আর কি পারেনা সে তর্ক থাক, এখন বেরুনো যাক চল।

সরু সিঁড়ি বেয়ে আমরা সাবধানে নেমে যাই। দেয়ালে মালার মত করে ঝোলানো তারে অতি ক্ষীণ বিদ্যুতের আলো। সেই আবছা আলোয় আমাদের নিজেদেব ছায়াগুলি, বড় বেশী অন্ধকার করে পথ রোধ করছে। খুকুর কলকণ্ঠ অনেকক্ষণ স্তিমিত হয়ে থেমে এসেছে। অকারণ একটা অখুশাব বোঝা, স্যাঁৎস্যাঁতে কাপড়ের একরাশ স্তূপের মত প্রাণের উপরে যেন চেপে আছে। আমরা একটা একটা করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি আর নামছি; ফিরে চলেছি এই গগনচূড় মৃত্যুনিকেতনের গর্ভ থেকে।

দরজার মুখ থেকে বাইরে পা দেবা মাত্র আলো আর হাওয়া, রং আর সুখ আমাদের দুই হাতে আলিঙ্গন করে ধরল।—অদূরে ফারুক সাহেবের প্রমোদভবনেব বাগানে রঙীণ ফুলের আল্পনা। এদিকে ছোট্ট লালীর হাসিমুখের অভ্যর্থনা। দলে দলে মিশরী বালিকা ও তরুণী রঙীণ ফ্রক পরে, প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে চলেছে। ওদের চলায় বলায় চোখের চাওয়ায় জীবনের বিচিত্র ছন্দের সুর।

ওরা আমাদের দেখে চাওয়া চাওয়ি করে একটু হাসাহাসি করে উঠল। একজন আমার বিচিত্র বেশবাসের দিকে ইসরা করে কাণে কাণে কিছু বলল। আরেকজন খুকুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তার গাল টিপে বল্লাম, তোমার নাম কি? সে হেসে গড়িয়ে পড়ল। আরেক জন সাহসিনী বলল, কোথায় তোমার দেশ?

আমার উত্তরের আগেই ওদের পুরুষ রক্ষীদের একজন বললে,—দেখছ না—পাকিস্তান?

—না, ভারতবর্ষ।

—ও তো একই। হাঁ, সবই তো এক।—ভাবলাম, এই সুযোগে এদের Social condition, অর্থাৎ কিনা, যার নাম হচ্ছে সামাজিক অবস্থা আরেকবার জানার চেষ্টা করা যাক। কৌতূহল মেটানো নারীধর্মানুগ। একটী তরুণীর সঙ্গে ভাঙা ইংরেজী ও গুঁড়িয়ে যাওয়া ফরাসীতে দু'একটা বাৎচিৎ করতে করতে ফস্ করে বলে বসলাম, তোমাদের জেনানারা তো দেখছি সব এখন স্বাধীন হয়ে গেছে। এই তো কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছো ঘোমটা খুলে, পর্দা তো আর নেই? ওরা হাসলে। শুধু কুমারীদের পর্দা নেই। বিয়ের পরে বেপর্দা ঘোরা এখনো এখানে বিষম বেদস্তুর। আমি বল্লাম,—"কিন্তু তোমরা গাউন পরেছ, চুল কেটেছ? সবই তো মেমেদের মত?" একটি মেয়ে গলায় ধানীলঙ্কার ঝাঁজ মিশিয়ে বললে—"হাঁ, মেমেদের কাছে অনেক কিছুই তো শিখেছি। তবে ওদের কাছে ফ্যাসন শিখতে, কায়দা শিখতে, দস্তুরী শিখতে রাজী আছি বটে, কিন্তু বেচাল বেদস্তুরী শিখতে চাইব না, বেসরম বেপর্দা হতে শিখব না।" আমাদের দলকর্তা দূর থেকে চোখ টিপে পা চালাতে বল্লেন। পথের মধ্যে সমাজনীতির আলোচনা ফস করে বেদস্তুরের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

তাই চুপ করলাম। সমাজনীতি বন্ধ করে, প্রখর সূর্যনীতির মধ্য দিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। তারপরে আবার সেই মনোরম পথ দিয়ে ফিরে চল্লাম হোটেলে। পৌঁছলাম যখন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণপ্রায়। মধ্যাহ্নভোজের বিপুল আয়োজন ও নিঃশেষিত প্রায়। অবশ্য এই দীর্ঘ উত্তপ্ত ভ্রমণের পরে, মিশরী অথবা আরবী পারসী কোনরকম খাবারই উপযুক্ত নয়। তাই অর্ডার করলাম ঠাণ্ডা স্যালাড আর মাছ। ফরাসী নামতালিকা ঘেঁটে মাছের যে নামটা

চোখে ঠেকল সেটা যে মাছ ভাজারই ফরাসী নামান্তর, একথা বোঝা যায়নি আগে। তারপরে এল মাছ ভাজা। দেখে মুখ শুকিয়ে এল, কী প্রচুর কী প্রভূত—রীতিমতো অভিভূত হয়ে যাবার যোগাড়। আসছে তো আসছেই, মাছের পরে মাছ, ভাজার পরে ভাজা। এত মাছ কেউ খেতে পারে? এর সিকিতে আমাদের চারজনের বেশ ভালোরকম পেট ভরবে। বাকীগুলো? কী আর হবে? মিশরী খানসামারা নিয়ে যাবে। কিন্তু দাম দিতে হবে সবগুলোর জন্যেই। হাঁ সে তো জানিই। সেই দুঃখেই তো চুপ করে আছি।

সন্ধ্যেবেলা দোকান দেখতে গেলাম, দেশী পাড়ায়। দেশী হলেও বোধহয় পুরোপুরি দেশী নয়। কারণ সঙ্গে ছিলেন সেই প্রফেসর গাইড। বিদেশীদের নিয়েই যাঁর কারবার।

দোকানে যাবার আগে দেখা হোল আরো যা যা আছে দ্রষ্টব্য। গোলাপী অ্যালবেষ্টার পাথরের বিশাল মস্‌জিদ। সেখানে ঢুকতে জুতো খুলতে হবে কিনা ভাবছি, ওরা কম্বলের আবরণ দিয়ে জুতো মুড়ে দিল। সেই মসজিদের ভিতরটা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় চার্চের অনুকরণে সাজানো বিশেষ করে জানালার চিত্রিত রঙীণ কাঁচখণ্ডগুলি। মসজিদের বিরাট বাঁধানো উঠোনে বহু লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হেঁটে যেতে আমাদের পা টন্‌ টন্‌ করতে লাগল। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে গম্বুজের পাশেই দেখি ছাদের একটি ছোটখাট নিভৃত কোনায় কোন এক নাম না জানা গাছের ঝাঁকড়া মাথায় একটা ঝিরঝিরে ঠাণ্ডার ছায়া। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই আজানের সুরে যায়গাটা ভরে উঠল। তাকিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে লাল সূর্য সারা আকাশে সোনা ছড়িয়ে পিরামিডের রেখায় একটা ধূসর বেগুনি মিশ্রিত রঙের আভা ফুটিয়ে তুলেছে।

মসজিদ থেকে মৃত সহরের ধার দিয়ে আমরা জীবিত নগরের হাটবাজারের কেন্দ্রে এসে পৌঁছিলাম। মৃতনগর অথবা city of the dead কায়রোর পশ্চিম দিকে মাইল দেড়েক লম্বা একসারি ছোট ছোট পাহাড়। সহরের সব লোকের কবর এইখানেই হয়ে থাকে। এই একটা যায়গায় সকলের মাটি কেনা আছে। প্রফেসরের ইচ্ছে ছিল ওখানে আবার আমাদের নিয়ে একটু ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সকাল থেকে কবর দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। আর সখ নেই। এ কী দেশ! খালি মৃত্যু মৃত্যু আর মৃত্যু সারা দেশটা জুড়ে কেবল কবর। এখন এখান থেকে পালিয়ে একটু আলো, একটু কথা, একটু চেঁচামেচির মধ্যে, জীবিত মানুষের স্পর্শের ভিতর ফিরে যেতে চাই।—চল চল, গাড়ী চালাও জোরে। ফিরে চলে মানুষের মাঝখানে। যে মানুষ বেঁচে আছে।

সেইখানেই এলাম অবশেষে। লোকজন গাড়ীঘোড়া উট সব কিছুই আছে সেখানে। চেঁচামেচি, ঠেলাঠেলিরও অভাব নেই। তবু সব কিছুর উপরে যেন একটা মৃত্যুভার চেপে আছে। আঁকা বাঁকা অলি গলির ভিতরে বাঁকা চোরা উঁচুনীচু দোকানবাড়ীগুলির ভিতরে যদিও আলো জ্বলছে, পেঁয়াজ রসুন মসলা মাংসের গন্ধ আসছে, তবু যেন প্রাণ হাঁপিয়ে আসছে। ছোট্ট সরু সিঁড়ি বেয়ে দোকানের নীচের তলায় নেমে এলাম। কী অজস্র কী বিচিত্র দ্রব্য সম্ভার। কোনটা ফেলে কোনটা কিনি। কোনটা রেখে কোনটা দেখি। এত হাঙ্গামার চেয়ে ভালো হচ্ছে কিছুই না কেনা। উনি বল্লেন,—হুর‍্যা! ধরেছ ঠিক—সেই নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পথ—একঢিলে একেবারে দু'পাখী।—পছন্দ করার এই বিষম strain থেকে brainকে বাঁচানো, আবার খরচের দায় থেকে পকেটকে বাঁচানো।—আমি মুখে বল্লাম—হুঁ। সারাদিনের পরিশ্রমে তখন গা গুলোচ্ছে, এই ছোট ছোট খুপরি ঘরের অজস্র ঝক্‌মকে জিনিষের ভীড়ে ক্লান্ত

চোখ যেন বুজে আসছে। তবু আমি মনে মনে হাসতে ছাড়লাম না। সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাপুরুষও বুঝি হাসলেন।

পরদিন সকালবেলা পায়ে পায়ে হেঁটে নদীর তীর দিয়ে মিউজিয়ামের বাগান পার হয়ে একটু ঘুরতেই দেখি—সারি সারি কয়েকটা দোকানে কালকের দেখা জিনিষগুলি উঁকি দিয়ে হাসছে। ভোরবেলাকার স্নিগ্ধ আলোয়, খোলা হাওয়ায় তাদের দেখে আর বিরক্তি এল না। সরাসরি ঢুকে গেলাম ভিতরে। আধা ফরাসী আধা ইটালীয় এবং আধা মিশরিনী একটী সুন্দরী তরুণী আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল। যত্ন করে এগিয়ে দল নরম কোচ। রূপার আধারে দামী কাঁচের পান পাত্রে যত্ন করে নিয়ে এল ঘন সুগন্ধী টার্কিস কফি। আমাদের আশেপাশে টেবিলের উপরে জমতে লাগল জিনিষের পাহাড়। টুকিটাকি কত অজস্র খেলনা। কত বিচিত্র সাজ সজ্জা, খুঁটিনাটি কত সৌখীন উপকরণ। দামও যেন গত সন্ধ্যার চেয়ে কম বলেই মনে হল। তবে তার জন্যে হয়ত এই পরিবেশ, আর ভোর বেলাকার এই খোসমেজাজটাই দায়ী।

আমাদের হোটেলের দক্ষিণ দিকের দরজা খুললেই নীলনদ দেখা যায়। তার তটরেখা ধরে চলেছে রেলিং-এ ঘেরা সুদৃশ্য প্রমেনাড,—কংক্রীটে বাঁধা। সেই পথ দিয়ে পায়ে পায়ে চলে ছোট একটু বাগান পেরিয়ে কায়রো মিউজিয়াম। মিশরী স্টাইলের স্থাপত্যরীতি অনুসারে পাথরের বিশাল প্রাসাদে মিউজিয়ম সাজানো আছে। ঢুকতেই প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মাঝখানে ছোট্ট একটু বাঁধানো জলের ধারা। তার ভিতরে অনেক যত্নে লাগানো আছে কয়েক গুচ্ছ পাপিরাসের চারা। কায়রোর ধারে কাছে পাপিরাস নেই। অনেক দক্ষিণে নীলনদের দুইধারে তীরের কাছ ঘেঁসে স্বল্পজলের বদ্ধজলায় পাপিরাসের জঙ্গল।

কোন আদিকাল থেকে এই সরু সরু পাপিরাস মিশরের সব

প্রয়োজনের দায় মেটাচ্ছে কে জানে। পাপির ঘাসের শিকড় সেদ্ধ খেতে মন্দ নয়, সাধারণের পেট ভরানোর কাজ চলে। আর তার ডাঁটায় হয় দড়ি, সরু নৌকো, ঘরের বেড়া, আরো কত কী। আর সেগুলিকে সরু সরু করে চিরে আড়াআড়িভাবে রেখে জোরে চেপে চ্যাপ্টা করে তৈরী হয়েছিল, ঈষৎ হলদে রংএর প্রথম কাগজ। আজো কাগজ আপন নামের মধ্যে পূর্বপুরুষের নামের স্মৃতি বহন করে চলেছে—'পেপার।'

পিরামিডের কঠিন পাথরের চেয়েও এই তুচ্ছ ঘাসের মূল্য কম নয়। ওরই মত এই ঘাসের চাপড়াও বহন করে চলেছে, ছ'হাজার বছর আগের মানুষের ইতিহাস। পাপিরের চ্যাপ্টা পাতায়, পাপিরেরই খাগড়া কলম অথবা তুলি দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ছবির সারিতে প্রতি রাজা লিখে রেখেছে আপন মহিমার ইতিবৃত্ত, উজীর লিখেছে হিসেব। লক্ষ লক্ষ পাপিরের লেখন নানা মন্দিরের গর্ভগৃহে পড়ে থেকে আজ নিঃশব্দ মুখরতায় ব্যক্ত করছে মিশরের ইতিহাস। আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন রাজা কত ধনের মালিক ছিল। কার কত ছাগল, কত গরু।

এরা পশুপ্রিয় জাত। এক একটা পশু ছিল এক একজনের অধ্যক্ষ দেবতা, তারই নামে নামকরণ হোত। গলায় ঝুলত তার ছবির তবক। গরু গাধা ছাগল কুকুর বেড়াল সকলেরই বিশিষ্ট স্থান ছিল মানুষের জীবনে এবং সমাজে। পোষা বিড়ালটা মরলেও ওরা দুই ভুরু কামাত, আর কুকুর মরলে কামিয়ে ফেলত মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীর।

ইসলামের আওতায় সেই কুকুর অস্পৃশ্য হয়ে অচ্ছুৎ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। কেউ তাদের আর ঘরে ঠাঁই দিল না। অবস্থার গুণে আজ যে রাজা কাল সে ভিখারী। আজ যে দেবতা কাল সে ঘৃণিত পশুমাত্র।

কায়রো মিউজিয়ামটা বিশাল বিপুল। রোমের ভ্যাটিকানের

মত বিস্তৃত হয়ত নয়,—কিন্তু আরো বিরাট, আরো গভীর, আরো মর্মভেদী তার প্রভাব। ঘরগুলি বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু। পাথরের সব বিরাট মূর্তিগুলি ছোট ছোট বেদীর ওপরে দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে। তাদের গায়ের রং পুরাণো তামার মত। কপালে ঝালর দিয়ে নেমে আসা কাণঢাকা বাবরী করা চুল। প্রকাণ্ড কঠিন ঠাস বুনট চেহারা। বড় বড় টানা চোখে মোটা সুর্মা আঁকা—তারা হয় দুই হাত দুই হাঁটুর উপরে রেখে চেয়ারে বসে আছে। নয়ত একটা পা একটু ফাঁক করে এগিয়ে যাবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেরই পরণে কটিবাস, কারো বা ঝুল নেমেছে হাঁটুর নীচে। মন্দির থেকে তুলে এনে চিত্রিত অংশগুলি দেয়ালে লাগানো হয়েছে। রোদ লেগে পাছে রং জ্বলে যায় তাই ঘরগুলি অসূর্যম্পশ্যা। হাজার হাজার বছরের প্রাচীন ভাস্কর্যের বিষণ্ণ ছায়া যেন বোঝার মত প্রাণের পরে চেপে থাকে।

এইখানেই গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে মিশরের তফাৎ। গ্রীক ভাস্কর্যের প্রধান উপাদান মার্বেল।—পাথর নয়, সে যেন আলো। মার্বেল যেন নিজেই তার স্বরূপের প্রতিবাদ। যদিও সে জড়প্রস্তর, তবু সে যেন জড় নয়, বরং তার বিপরীত। সে আলো, সে বাধা নয়। সে বহন করছে রূপের আহ্বান—আলোর ডাক। মার্বেল পাথরে গ্রীক ভাস্করের মূর্তি তাদের প্রস্তররূপ পরিত্যাগ করে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর হৃদয়াবেগ পাথরে করেছে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পাথর ফেটে বেরিয়ে এসেছে লাবণ্যময়ী নারী, বলদর্পিত বীর, লতাপাতা ফুল। প্রকৃতি তার সহস্রবিচিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন পাথরে। কিন্তু মিশরে লীলাময়ী অহল্যা পাষাণী হয়ে গেছে। পাথরের মধ্যে এসে প্রকৃতিও হারিয়েছে আপন প্রকৃতি। এই ঈগল, ওই নরসিংহ স্ফিঙ্কস্, এই সব বিশাল রাজমূর্তি—যেন শুধু উপাদানে প্রস্তর নয়,—এদের আত্মাও যেন জড় হয়ে গেছে। এদের সকল প্রকাশে রুদ্ধ কঠিন ধূসর পাথর তার বিষাদাচ্ছন্ন

জড়প্রভাব বিস্তার করে আছে। মানুষের দেহ যেমন 'মমি' হয়ে আছে, মানুষের মূর্তিও তেমনি পাথর হয়েই আছে। পাথর মানুষ হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু ছবিতে ঠিক উল্টো। প্রাচীন মিশরের যেটুকু আনন্দ তার সবটুকুই যেন ধরা আছে তার চিত্রকলায় আর চিত্রলিপিতে। নীলনদবিধৌত যত পাপিরঘাসের জঙ্গলে আর শস্যক্ষেত্রে, কত পাখী, কত মাছ, কত হাঁসবলাকার পাখার ঝটপটি। কত সরু সরু ঘাসের নৌকোয় কত অর্দ্ধবাসা কেশবতী কন্যাদের দল। তাদের কেউ বাদিকা, কেউ নর্তকী, কেউবা শুধু ফলপুষ্পবাহিনী। গাঢ় সাদা এবং ঘননীলের সঙ্গে আরো নানা রঙের মিশ্রিত বর্ণিকাভঙ্গে এগুলি যেন সেই প্রাচীন কালের রসমূর্তির ছবি। প্রাচীনকালে শুধুই যে কবর খোঁড়া আর মমি করা হোত, তা নয়, সে যুগেও জীবন দুলত আনন্দে;—নৃত্যগীত বাজনায় মুখর ছিল অন্তত কতগুলি লোকের দিন। ছবিগুলি সূক্ষ্ম তুলিতে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে উজ্জ্বল 'টেম্পারা'য় আঁকা। দেখে মনে হয়, এ ছবি যদিও পাষাণ ফলকে জড় রং তুলি দিয়েই আঁকা, তবু যেন এর মধ্যে প্রাণের চকিত লীলা থেমে থাকেনি;—কাল থেকে কালান্তরে পাখা মেলে উড়ে চলেছে। যারা ওই পাথরের মূর্তি গড়েছে, এই ছবিও যে তাদেরই সৃষ্টি একথা মন হঠাৎ মানতে চায় না;—মনে হয়, হয়ত ছবিগুলো পরবর্তীযুগের এশিয়ার শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত।

রং তুলিতে আঁকা শুধু ছবি নয়, ছবি লেখা। এই চিত্রলিপিতে লেখা বিচিত্র প্রেমের কবিতার একটা বই হাতে পড়ল ওখানেই। ইংরেজী অনুবাদ পাশে পাশে দেওয়া আছে। মিশরী প্রেমের পাত্র-পাত্রী ভাই বোন। এই ধর্মবিদ্রোহী সমাজবিরুদ্ধ কাজ সে যুগের মিশরে ধর্ম এবং সামাজিক রীতি হিসেবেই পালিত হোত। সম্পত্তির লোভে দুর্নীতিও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি আলেকজাণ্ডার এদেশে যে গ্রীকরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তারাও ক্রমশ

মিশরী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের সমস্ত প্রথাগুলিই গ্রহণ করেছিল। তাই রোমান সীজার এসে দেখলেন, গ্রীক 'টলেমি' বংশজাতা সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা তার বালক ভ্রাতা ও স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। মিশরে কোন মহাকাব্যের সন্ধান পাওয়া না গেলেও ছোট ছোট গল্প উপকথা অনেক আছে। তার মধ্যে ওদের যে জীবনী দেখতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে সে যুগের অন্য দেশের কাহিনীর বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

সমাজ এবং ধর্মনীতি যদিও দেশকাল সাপেক্ষ, তবুও মানুষের জীবননীতি বোধ হয় যুগে যুগে একই পথ ধরে চলেছে। তার যে বিশেষ কোন বদল হয়েছে এমন মনে হয় না। তেমনি বীজ বোনা ক্ষেত চষা, শস্য তোলা, ছাড়ান নাড়ান, গোলাজাত করা, এ সব চিরকালই এক;—যদিও পদ্ধতির হয়ত কিছু বদল হয়েছে আজকাল। শত সহস্র সাধারণ লোকের জীবন তখন যেমন চলত আজো প্রায় তেমনি চলছে। ধনীদের জীবনও বোধ হয় এক ছাঁচেই চলেছে সেই পুরাকাল থেকে,—তেমনি বিলাসবহুল, অলস আরামে নিষ্ক্রিয়।

ছোট ছোট মডেলে এই সব বিভিন্ন জীবনের ছবি ধরে রাখা আছে। মিউজিয়ামের বিরাট ঘরগুলি ভরে উঠেছে অসংখ্য ছোট বড় ফিগারে। বড় মূর্তিগুলি রাজা, রাণী, উজীর এবং পুরোহিতের। আর ছোট মূর্তিগুলি বয়ে নিয়ে চলেছে সে যুগের জীবনযাত্রার রূপ। সেযুগের দিনপঞ্জী যেন পড়ে নেওয়া যায় ওদের মধ্যে থেকে।—ঐ ঝি চলেছে কাপড় নিয়ে, শিল নোড়াতে বাটনা বাটছে চাকর। এদিকে যুগলমূর্তি চলেছে ঘাসের বোঝা নিয়ে। ওদিকে নৌকো নেমেছে জলে, দাঁড় বাইছে ষোলো দাঁড়ী। আর দেখলাম, একটী কালো-কোলো ছোট মানুষের নেড়া মাথায় পরিষ্কার একটি টিকি।

ওপাশের তাকের মাঝখানে বসে আছে কাঠের এক বালক

রাজা। তার চোখ দু'টাতে জল জল করছে কোন নাম না-জানা পাথর।

কত বিচিত্র অলঙ্কার বাসন অস্ত্রশস্ত্র। হাতলগুলি সোনার পাতে মোড়া। দেয়ালের খাঁজে খাঁজে প্রতি ঘরেই মৃতদেহের 'মমি'। দেহগুলি কঙ্কালের মতই, শুধু তাতে কালো কাপড় জড়ানো। ওরা ওষুধ ভেজানো কাপড় দিয়ে মৃতদেহ টেনে বেঁধে রাখত। তখনকার দিনে আরো কোন দেশে এইরকম নিয়ম ছিল কিনা কে জানে? আমাদের দেশের মহাভারত রামায়ণ অথবা পুরাণ ইত্যাদিতে এর কোন নির্দেশ আছে বলে শুনিনি। শুধু মহাপরিনির্বাণসূত্রে, গৌতমের নিজ মুখের বাণীতে যেন এর খানিকটা ইসারা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বলেছেন,—"হে আনন্দ, এই কুশীনাড়াতেই এই শালবৃক্ষতলায় আমি এখন শেষ শয্যা পাতলাম। কাজেই এখন এই জনপদবাসী মল্লদের প্রথামতই আমার সৎকার কোর। মল্লরা যেমন করে তাদের রাজচক্রবর্তীদের নিয়ে যায়, তেমনি করে মহার্ঘ্য নববস্ত্র দ্বারা আমার দেহ সপ্তবার বন্ধন করে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টি সম্পাদন কোর।"

আজকাল আমরা শুধু একখানি মাত্র নূতন কাপড়ে মৃতদেহ ঢাকা দিয়ে থাকি। কাপড় র‍্যাশনের দিনে তাও পাওয়া শক্ত হোত।

মিশর এখন তূলার দেশ। তূলা রপ্তানী করেই আজকের মিশরের যা কিছু ধনসম্পদ। সে যুগে মিশর ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শস্যখনি। আজ ওরা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁধ বেঁধে বছর ভোর চাষের ব্যবস্থা করেছে। তাতে বন্যার জল নামতে চায় না। তার সেই সোনাভরা পলিমাটির চাদর বিছিয়ে দিয়ে যেতে পায় না। তাই শস্যের বদলে তূলোর চাষেই আজকাল মিশরের ঘর ভরে ওঠে।

মমিদের গায়ে জড়ানো একরকম অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র পাওয়া গেছে,

সেগুলি বাংলার মসলিনের সমগোত্রীয়। আশ্চর্য, প্রাচীন মিশরী চেহারাতেও যেন বাংলা দেশের পলিমাটির ছাপ। অবশ্য ঠিক আধুনিক বাংলা নয়—যে বাংলা জোলো দুধ, পুলিশের লাঠি, আর হাওয়া খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছে, সেই বাংলা নয়। এই শ'খানেক বছর আগেও যে বাংলা তেলমালিসে পালিসকারী ঘাড়েগর্দানে ঠাসামাষা কালো কালো গাঁট্টা-গোঁট্টা চেহারায়, কদমছাঁটা চুলে, হাঁটুর উপরে ঠেঁটে তুলে, টানা টানা কালো চোখে, দূরবিস্তৃত বহুবিস্মৃত অতীত জীবনের আভাষ বয়ে, রোদে জলে চাষ করে বেড়াত, সেই বাংলার আদল যেন দেখতে পেলাম এদের মূর্তিতে। শুধু যেন আর একটু বিষণ্ণ, আর একটু গম্ভীর ছায়া ফেলা। বহু সহস্র বছরের জড়মৃত্যু যেন তাদের অন্ধকার পাষাণের মূঢ়বিষাদে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মাথায় সাদা গামছা জড়িয়ে, কোমরে কৌপীন কষে বেঁধে ঐ যারা ঝুড়ি বয়ে পাথর নিয়ে যাচ্ছে, ওদের মধ্যে যে বিশেষ পরিচিত ভাব দেখছি, গ্রীকমূর্তি দেখে তা মনে হয়নি। নীলনদের মোহনায় যারা থাকত, গঙ্গানদীর মোহনার দেশের মানুষের সঙ্গে তাদের মিল থাকা আশ্চর্য নয়। কিম্বা হয়ত দুইই মিশ্রজাতি বলে চেহারার এই মিল ;—দুই দেশেই সাদার সঙ্গে কালো মিলেছে। কিন্তু সে মিশ্রণ তো ভারতের সর্বত্রই ঘটেছে। আধুনিক ঈজিপ্টেও সেই একই প্রভাব। কিন্তু আধুনিক ঈজিপ্টের সঙ্গে বরং উত্তর ভারতের পাঞ্জাব ইত্যাদি প্রদেশের মিল আছে, অথচ প্রাচীন ঈজিপ্টে মিশরীকে পাঞ্জাবী বলে ভুল করার যো নেই। কিন্তু যদি বল, বাঙালী নয় তো ? তবে একবার দ্বিধাভরে দেখে তোমায় বলতেই হবে, —হবেও বা। কালীঘাটের কাঠের পুতুলের সাদৃশ্যমাখা অনেককিছু দেখা গেল। কে জানে এ দেখা শুধু কি ভ্রম, না,— এর মধ্যে কোন সত্যের বীজ আছে। নির্বাক কালসমুদ্রের নিঃশব্দ অন্ধকার তরঙ্গগর্জনের ভাষা শুনে এখবর কে উদ্ধার করবে ?

অবশ্য মিশরের অতীত ভারতের মত বোবা নয়। সে তার অনেক কথাই পুঁতে রেখে গেছে, মাটির নীচে। নিজের আত্মাকে মৃতদেহের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার দুঃসাধ্য প্রয়াসে প্রাচীন মিশরের প্রত্যেকটী রাজা তার নিজের কালের অসংখ্য মানুষের জীবনকে অহোরাত্র তটস্থ করে মৃতের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছিলো বটে, তবু তার সেই অর্থহীন ব্যর্থ প্রয়াস একরকমভাবে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বই কী? শুধু রাজাদের নয়,—সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বাঁচিয়েছে সেদিন যাদের কথা কেউ কখনো ভাবেনি, যারা শুধু পরের জন্যে কবর খুঁড়ে আর পাথর বয়ে জীবনটা কাটিয়ে দিয়ে, মৃত্যুর পরে পাপির ঘাসের মাদুরজড়ানো বালির নীচে পড়ে থাকত,—শোকতপ্তা ধরণী যাদের ফিরে নিত নিজের গর্ভে,—দীপ্ত সূর্য যাদের ধীরে ধীরে গ্রহণ করত নিজের তেজের মধ্যে। সেই যে লক্ষ কোটি মানুষ, যাদের নামহীন কর্ম উপহারে গড়ে উঠেছে ফ্যারাওদের কীর্তিদীপ্ত নাম, তাদের জীবনও কিছু কম বেঁচে নেই তাদের প্রভুদের কবরের মধ্যে।

—তারা চাষী মজুর শিল্পী এবং দাস। ওরা চিরকাল প্রভুর প্রয়োজন মেটাতে জীবন কাটিয়েছে, বিনিময়ে পেয়েছে ওদের আত্মাহীন জড়জীবনের শুধু আয়ুষ্কালটুকু বেঁচে থাকার অধিকার। তবু সেই ওরাও পেল অনেক আয়ুর অমরতা ;—আজো রইল বেঁচে ছোট ছোট মডেল মূর্তিতে সেজে। ঐ তো ওরা চলেছে মৃত প্রভুর প্রয়োজন মেটাতে। প্রভুর সঙ্গেই ওদের আত্মাও বাঁধা হয়ে গেছে অছিন্ন বাঁধনে। ঐ যে গিল্টীকরা নৌকায় দাঁড় বাইছে দাঁড়ী, প্রভুর আত্মাকে স্বর্গের নীলনদী পার করাবে বলে। শোনা যায় আগে নাকি প্রভুদের সঙ্গে তাদের কিছু দাসদাসীকে কবর দেওয়া হোত, পরপারে মৃতের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। ক্রমে সে প্রথার বদলে দাসদাসীদের মডেলমূর্তি এল কবরে। শুধু দাসদাসী বা প্রত্যক্ষ নিত্যব্যবহারের জিনিষগুলিই নয়। সেই সঙ্গে এল সমস্ত

মিশরের সাধারণ জীবন। ছোট ছোট মডেল করা খুঁটিনাটি সব কিছু।

সে যুগের ধনীগৃহের সঙ্গেও সবকালের ধনীগৃহের কোন বিশেষ প্রভেদ নেই। গেট খুলতেই রেক্ট্যাঙ্গুলার গড়নের ঘাসের বাগান, তার চারিধারে ফুলের কেয়ারী। মাঝখানে হয়ত ছোট্ট একটু জলাশয়, তার বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি নেমেছে জলের তলায়। কোনটা হয়ত সবটাই বাঁধানো। বাড়ীর সামনের দিকে বড় বড় বৈঠকখানা-ঘর। ভিতর দিকে ভাঁড়ারঘর রান্নাঘর ইত্যাদি। পিছন দিকে উঠোন,—সেখানে শস্য ছড়ানো মাড়ানো পেষা ইত্যাদি হয়ে থাকে। ওরা আটায় ঈস্ট দিয়ে রুটী বানাতো—ইয়োরোপীয় রুটীর আদিপুরুষ। ওরা বড় বড় গামলায় রুটীর জন্যে আটা ঠাসত। আর শিলনোড়ায় বাটনাজাতীয় কিছু বাটত। রাজা রাণীরা চেয়ারে বসে নক্সাকাটা সোনার বাটীতে করে পান করতেন সরবৎ অথবা সুরা, স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে দেবীরা এসে রাজার প্রসারিত পাত্রে ঢেলে দিত সুরা। দাসীরা নিয়ে আসত থালাভরা ফলের অর্ঘ্য, তরমুজ কলা আর খেজুর, আঙুর ছিলো কোন কোন পাত্রে। আঙুর ফলত উত্তর মিশরে মোহনার অন্তর্বর্তী দেশে।

লোহিতসাগরের ওপার থেকে এশিয়ার যাযাবর রাজারা যখন ঘোড়ায় চড়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মত মিশরের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তখন ওরা সঙ্গে করে এনেছিলো আঙুর। আঙুর নইলে এশিয়াবাসীর কোনকালে চলে না। আঙুরের গেঁজে যাওয়া রস নইলে ওদের প্রাণ জেগে উঠতে চায় না। তাই ক্রমশ মিশরের উত্তরপ্রান্তে দেখা দিল কিছু কিছু আঙুরের ক্ষেত। শস্য পচানো বীয়ার মদের সঙ্গে চলন হোল অভিজাতঘরণী আঙুর-রস-মদিরার।

মৃত রাজাকে খুসী করতে মডেল নটীরা নাচছে। গায়ে গয়না ঝল্‌মল্ করছে। মাথার উপরে পা তুলে, ধনুকের মত পিঠ বাঁকিয়ে, দু'হাত মাথার উপরে দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে মাটিতে পেতে একপা

আকাশে তুলে অন্য পায়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে পিছিয়ে দলে দলে মিশরাণী নটীরা নাচছে। সঙ্গে সঙ্গে কেউ বাজাচ্ছে গ্রীক lyreএর মত কোন যন্ত্র, কেউ বাজাচ্ছে বাঁশী। এতরকম, এত অজস্র এত বিচিত্র জিনিষ, আর এত অজস্র মৃতদেহ। মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত নেওয়া আছে,—লেখা আছে সব মৃত্যুর ইতিহাস। কোন রোগে কে মরেছে তার সব খবর।

আশ্চর্য, এদের এই মৃত্যুযজ্ঞই কিন্তু এদের জীবনকে বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছে। এই যজ্ঞেই প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে শিল্প। মূর্তিতে যদিও তেমনি মিশরীয় কাঠিন্য, তবু তার মধ্যে ভাবের প্রকাশ তাকে যেন সুন্দর অসুন্দরের অতীত শুদ্ধ শিল্পসত্বের অমৃতে ডুবিয়ে তুলেছে। অষ্টাদশ রাজবংশের সময়কার একটী মস্তকের প্রস্তর অনুকৃতি দেখলাম। ক্ল্যাসিকাল ইয়োরোপের যে কোন মাষ্টারপীসের সঙ্গে তা তুলনীয়। শেষ যুগের মিশরী শিল্প যে গ্রীসের মাধ্যমে ইয়োরোপকে প্রভাবিত করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গ্রীক ভাস্কর্যের বহু অবদান, মিশরের পরবর্তী যুগের অমর্ণা শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে বহুলাংশে তুলনীয়। ধর্মে দর্শনে এবং শিল্পকলায় মিশর বাস্তববাদী।

এইখানেই ভারতের সঙ্গে প্রভেদ। মিশরের মূর্তি গুলির প্রতি ভঙ্গীতে বাস্তব প্রকৃতির অনুকৃতি পাথরের কঠিন সত্বাকে অক্ষুন্ন রেখেও ফুটে উঠেছে। মিশরের শিল্প, কবর ও মন্দিরের জন্যে একই ভাব, প্রায় একই বিষয় নিয়ে রচিত। শিল্প পদ্ধতি প্রায় এক বলে মনে হয়। তাই অনেকে মনে করেন মিশরী শিল্পে গতির বিচিত্রতা নেই। তা একই ধরণে একই ঢঙে চিরকাল ধরে রচিত। কিন্তু তা বোধ হয় নয়।

—আমাদের দেশের কথাই যদি ধরি, আর ইয়োরোপের কথাও। দু'হাজার বছর ধরে ইয়োরোপে এবং ভারতে শিল্প দুই ভিন্ন পথে যাত্রা করেছিল। আজো পর্যন্ত তাদের বিষয়গুলি এক।

অর্থাৎ ইয়োরোপের শিল্প খৃষ্ট বিষয়ক এবং ভারতের শিল্প বুদ্ধের জীবনী অথবা দেবদেবী বিষয়ক। এই দুটি হাজার বছরের কাল পথ অতিক্রম করতে তাদের অনেক আলোকিত এবং অন্ধকার আশ্রম পার হতে হয়েছে। চার হাজার বছর পরে যদি কেউ এই সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে এই দু'হাজার বছরের শিল্পকলাকে চোখের সামনে মেলে ধরে, তবে এর উত্থান পতনের ইতিহাস নিয়েও তাকে এমনি মাথা ঘামাতে হবে। কাছ থেকে যে তফাৎগুলি প্রকট হয়ে দেখা দেয়, 'দূর' তার মস্ত র‍্যাঁদা চালিয়ে তার সমস্ত খোঁচখাঁচ মিলিয়ে তাকে অনেকটা একাকার করে আনে।

প্রাচীন মিশরের সঙ্গে আজকের মিশরের কোন অংশে মিল আছে বলে মনে হয় না। না চেহারায়, না কর্মে না ধর্মে ; তবু দেশটা তো এক। এই দেশেই তো মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে ঐ রাজা আর উজীর আর ঐ পুরুতরা ঐ মানুষদের চরিয়ে নিয়ে বেড়াত। এই দেশ যদি সেই দেশ, তবে এই কাল সেই কাল নয় কেন? একই দেশে, দুই যুগে কেন এত আশ্চর্য প্রভেদ?

—কে বলবে কেন?—কে দেবে উত্তর। শুধু এই মিউজিয়ামের সারা দোতালাটা জুড়ে তুতেন খামেনের কবরের ঐশ্বর্য স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকবে। কতযুগ ধরে এমনি তারা পড়েছিল, অন্ধ ভূমিগর্ভে। ১৯২২ সালে, সহসা উদঘাটিত হোল মাটির ঢাকনা—পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল,—তিন হাজার বছর আগের রাজৈশ্বর্য তার সমস্ত বৈভব, তার খুঁটিনাটি বিচিত্র বিলাসোপকরণ এবং তার তরুণ বীর রাজা ও তরুণী রাণীর অসংখ্য মূর্তি প্রতিকৃতি নিয়ে আবার এযুগের ধরণীতে প্রবেশ করছে।

নিতান্ত তরুণ বয়সেই তুতেন খামেন এশিয়ার কবল থেকে ঈজিপ্টকে উদ্ধার করে বীরত্বের প্রতীক স্ফিঙ্কসরূপে নিজের মূর্তি

গড়তে সমর্থ হয়েছিল। মিশরের শিল্পকলা এসিয়ান শিল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, এই যুগে তার চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল সন্দেহ নেই। শিল্পের এত বহুল এত ব্যাপক এত বিচিত্র নিদর্শন অকস্মাৎ কবরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে বিংশ শতাব্দীর চোখের সামনে প্রমাণ করে দিল যে মানুষের সভ্যতার অনেক রদবদল, রকমফের হয় বটে, কিন্তু তার উঠতি পড়তির একটা নির্দিষ্ট মান বরাবরই আছে।

সারি সারি 'মামি',—এবং তাদের অনুরূপ ঢাকা দেওয়া কাঠের বাক্স। তার উপরে কত কী চিত্রলিপি লেখা।

তুতেনখামেনের দেহ পর পর চারটী সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখা ছিল। প্রত্যেকটী মোটা সোনার পাতে মোড়া রত্নখচিত আবরণ। সেগুলি সব সযত্নে সাজানো আছে মিউজিয়ামে। ওরই পাশে পাশে রয়েছে সোনার রথ, সোনার চতুর্দোলা। কত অসংখ্য মহার্ঘ্য জিনিষ, আর সারি সারি কত কালের কত মানুষের মৃতদেহ। এই মৃতের রাজ্য ধীরে ধীরে পার হয়ে আসতে আসতে, এক যায়গায় দেখি দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের প্যানেলে, তুতেনখামেন তার নবোঢ়া রাণীর হাত ধরে তার মুখের দিকে প্রোফাইলের বিশাল একচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে। সমস্ত মৃতরাজ্যের জড় আঁধারের মাঝখানে হঠাৎ যেন এক টুকরো জীবনের আলো কেঁপে কেঁপে উঠল।—শোনা যায় তুতেখামেনের মৃত্যুর পরে তাঁর নবীনা বিধবা পত্নী, এসিয়াবাসী শত্রুপক্ষের হিটাইট রাজকুমারকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে আমন্ত্রণ জানান। প্রজারা টের পেয়ে বিধবা রাণীর ভাবী স্বামীকে পথের মধ্যেই হত্যা করে। কে জানে এ কাহিনী সত্য কিনা। যদি সত্যও হয়, তবু সেদিনের সেই তরুণতরুণীর প্রথম প্রেমের দৃষ্টি বিনিময়টুকুও মিথ্যে নয়। আজো তার শাশ্বত সত্য কালের হাত এড়িয়ে, কালেরই বুকের উপরে চিত্রলেখায় জ্বলজ্বল করছে।

ফিরে এলাম যখন সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে গাঢ় হয়ে। ঘরে এসে দেখি খুকু ও লালী দু'জনেই অসুস্থ। নীল নদীর মাছ ওদের সহ্য হয় নি। হোমিওপ্যাথীর টুকিটাকি সঙ্গে থাকত। সেই সব দিয়ে টিয়ে, নিজেরা অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনো বেশী রাত হয় নি। অদূরে মিউজিয়ামের থ্যাবড়া মাথায়, একটুকরো বাঁকা চাঁদ হেলে পড়েছে। সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘুমের মধ্যে তাকে নিবিষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

পাশাপাশি খাটে আমরা ক'জনে শুয়ে আছি। এসেছি কতদূর থেকে,—তিন সমুদ্র পার হয়ে। এ কোন দেশ? আবার সেই অর্থহীন প্রশ্ন আমার মাথার মধ্যে বর্ণহীন কালের ঘূর্ণাচক্রের মত ঘুরতে লাগল।

কে বলেছে দেশ স্থাবর ;—আর গতি আছে শুধু কালের। দেশ চলেছে ছুটে, কাল থেকে কালে ;—পথে পথে বদল করেছে বেশ। উত্তর আফ্রিকার এই প্রান্তজুড়ে বনভূমি কেন হঠাৎ কালের নিঃশ্বাসে শুকিয়ে শুকিয়ে রিক্ত সাহারার গৈরিক বসনে ঢাকল নিজেকে। কেমন করে কালের হাওয়া মেঘ টেনে নিয়ে বৃষ্টি ঝরাল, দক্ষিণ আফ্রিকার নীলনদের উৎসপথে। সেই জল বয়ে বয়ে কেমন করে আসোয়ানের বাঁধ ডিঙিয়ে বন্যা হয়ে ভাসিয়ে নিল তটরেখা, গড়ে তুলল সুন্দরী মিশরী ভূমিকে। কেমন করে ক্রমে ক্রমে কোথা থেকে দলে দলে মানুষ এল ধীরে ধীরে ;—গড়ে উঠল মিশর জাতি। হাজার চারেক বছর ধরে উন্নতাবনত পথে পথে বার বার বেশ বদল করে করে মিশর এসে পৌঁছল আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়ের কাল সীমার প্রান্তে। এর মধ্যে কতবার কতরকম ভাবে বিপর্যস্ত হল মিশর। এশিয়া থেকে দলে দলে এসে পেঁাছল 'হিক্সস্' রাখালের দল।

মিশর দেশটা ছিল জলে ডোবা ডোবা, আল বাঁধা বাঁধা। সেই সব আলের পথে ঘোড়া ছুটিয়ে ওরা ধ্বস্তবিধ্বস্ত করে

দিল সে যুগের মিশর। কতদিন মাথা তুলতে পারল না দেশ —তা প্রায় শ'প'াচেক বছর ধরে তো বটেই। সর্বত্র অসুস্থ দেহ মনের চাপা যন্ত্রণার গোঙানি উঠতে লাগল। ক্রমে মিশরের প্রাণশক্তি আগন্তুককে সরিয়ে দিয়ে নতুন রূপে প্রতিষ্ঠা করল নিজেকে। আবার নতুন সাজে সাজল দেশ। শিল্পকলায় এল নতুন আবেগ। জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় এল নতুন জোয়ার। এমনি করে হাজার খানেক বছর কাটার পরে আবার যখন কালের একটা অন্ধ সুড়ঙ্গ পার হয়ে চলছিল দেশ, সর্বত্র চলছিল ভগ্নমনোরথের নিরুৎসাহ বিষণ্নতা, তখন আলেকজাণ্ডার এলেন এদেশে।

—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বীরের আগমনে বহুদিন পরে মিশর বুঝি তার ভূমিশয্যা ছেড়ে চকিতে উঠে বসল। নীলপদ্মের মালা গেঁথে অর্ঘ্য সাজিয়ে নীল-নদের অভিষেকে, মিশর তাকে বরণ করে নিল। এতদিন ধরে দুই সভ্যতার গুপ্ত প্রণয় চলছিল সন্দেহ নেই,—সেদিন থেকে প্রকাশ্য মিলনের গ্রন্থি পড়ল বাঁধা।

মিশরে গ্রীসের যত প্রভাব পড়েছিলো, গ্রীসে মিশরের প্রভাব পড়ল তারো চেয়ে অনেক বেশী। শুধু শিল্প স্থাপত্য এবং চিকিৎসাতেই নয়। গ্রীকদর্শনেও নাকি মিশরের প্রভাব সুপরিলক্ষিত। অনেকে বলেন—মিশরী গুরুর পদপ্রান্তে বসেই এরিস্টটলের জ্ঞানশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

গ্রীকরাজপ্রতিভু যখন মিশরী সুন্দরীর গর্ভে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন দলে দলে গ্রীক এসে পত্তনি গাড়ল মিশরে। 'মমি'কারদের কাছে শিক্ষানবীশী করে গ্রীক সার্জনরা মৃতদেহ ডিসেকশন করতে শিখল, যে প্রথার প্রতি ঘৃণার অন্ত ছিল না সে যুগের পৃথিবীর,—বীভৎস ধর্মবিরুদ্ধপ্রথা বলে। ঈজিপ্টই ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম দ্বারোদ্ঘাটন করল।

রোমান এল পরযুগে। তখন মিশর গ্রীকের বিচিত্র মিশ্রিত কামনা বিলাসের প্রাচুর্যে, উন্মত্ত দেশের ধনীসমাজ। সত্য ও

সভ্যতা লুপ্তপ্রায়। সেই মূঢ় অন্ধযুগ থেকে আবার ধীরে ধীরে অভ্যুত্থিত হোল দেশ খৃষ্টধর্মের অধীনে। রোম্যান বাইজানটীনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। এবারে মিশর জেগে উঠল ধর্মের মাধ্যমে। মিশরের খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের কঠোর তপশ্চর্যা সে যুগের পৃথিবীতে এনেছিল বিস্ময়। কিন্তু শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত অথবা বিজ্ঞানচর্চায় মিশর আর কোনমতেই তার পূর্ব আসন ফিরে পেল না। ক্রমে তার ধর্মের আবেগও নিস্তেজ হয়ে এল।

নীলনদের নেতৃত্বে, অতি প্রাচীনকাল থেকে দেশব্যাপী যে একতা-সূত্র গ্রথিত হয়েছিল, দুর্বল রাজনীতি তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এল আরব নওযোয়ানের দল। ঘোড়া ছুটিয়ে বন্দুক নিয়ে নবধর্মে দীক্ষিত আরব লুটতে এল কবরের চোরা ধন। কিন্তু শুধু মৃতের ধন নয়, দেখতে দেখতে দুর্বল জীবিত রাজ্যটাও এসে পড়ল ওদের হাতের মুঠোয়। বহুকাল ধরে সভ্যতার দায় বহন করে মিশর তখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বার বার আক্রমণে ধ্বস্তবিধ্বস্ত হয়ে এসেছিল তার মজ্জা। এমন সময় ইসলাম তার তীব্র, দীপ্ত, তীক্ষ্ণ ইস্পাতের ঝিলিকে রক্ত ক্ষরণ করতে করতে সমস্ত মিশর পরিব্যাপ্ত করে বিস্তৃত করল তার প্রভাব—দেখতে দেখতে জোয়ার এল মরা গাঙে। ওরা ভেসে গেল, ডুবে গেল, মরল শত শত। ঐ চাষী, ঐ মজুর ঐ মৎস্যশিকারী জেলে, বদলে নিল তাদের ধর্ম, তাদের বেশবাস আচার ব্যবহার। ক্রমে এই তেরশ' বছর ধরে, প্রাচীন মিশর তার সমস্ত বৈশিষ্ট নীলনদের জলে বিসর্জন দিয়ে আজ আধুনিক যুগের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ান এসে তার হাত ধরেছিলেন, —কিম্বা বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—বীরের হাতে সেধেই হাত মিলিয়েছিল প্রাচীন মিশর—তার বুকছেঁড়া ছোট্ট একটু পাথরের অর্ঘ্য দিয়েছিল বীরকে। সেই দানের মহিমায় আধুনিক কাল

তাকে চৌকাঠ পার করে একেবারে তার বড় বৈঠকখানার ঘরের ভিতর বরণ করে নিয়ে এল।

যায়গাটার নাম 'রসেটো'—নেপোলিয়নের শিবির পড়েছে তারই কাছে। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে পিরামিডের দিকে মুখ করে সূর্যাস্ত দেখছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। মরুভূমির রক্ত রঙীণ সূর্যাস্ত,—ছুটে এল তরুণ বালক,—সৈন্য হলেও ফরাসী ;—জ্ঞান কৌতূহলে উৎসুক চিত্ত। ছুটে এসে সেনাপতিকে অভিবাদন করে হাতে দিল ঐ পাথর। কী আছে এতে—প্রাচীন মিশরের রহস্য যবনিকা উদ্ঘাটনের কোন গোপন মন্ত্র কী ? সেনাপতি শুধু বীর নন,—জ্ঞানোৎসাহীও বটে। তিনভাগে ভাগ করা লেখা বোধহয় কোন একটি বিশেষ কথাই বলতে চাইছে। একটি লেখন যেন চেনা চেনা,—পরিচিতির ছায়ামাখা,—ওকি প্রাচীন গ্রীক লেখা না কি ? হাঁ তাইতো বটে। তবে কি চিত্রলিপি, হায়রোগ্রাফি এবং এই তিন ভাষাতে কোন একই কথা লেখা আছে। একথা নিশ্চিত স্থির করতে এবং গ্রীকের সঙ্গে মিলিয়ে বাকী ভাষাগুলি পড়তে যদিও বহু বৎসরের সাধনা ও পরিশ্রম ব্যয় হয়েছিল,—তবু ঐ পাথরের টুকরোই সেই গৌরবের প্রথম অধিকারী।

ইয়োরোপের ছোঁয়ায় দেশটা বদলাতে লাগল দ্রুত। তার কিছু ভালো, কিছু মন্দ। তৈরী হোল সুয়েজ খাল,—ফরাসী বিজ্ঞানীর চেষ্টায়। নতুন প্রথায় বাঁধ উঠল গড়ে,—কিন্তু কোন্ গূঢ় কারণের প্রভাবে নতুন যুগ আসি আসি করে, আজও যেন ঠিক এসে উঠতে পারছে না। অর্থাৎ তার সদরমহলেই যেন কেবল জায়গা পাওয়া গেছে ;—যেখানে তার রূপমহল,—তার form, তার ইমারতের কাঠামো। কিন্তু তার ভিতর মহলের চাবী যেন আজো খোলা হয় নি ;—যেখানে, তার খাস অন্তঃপুরে, নতুন আদর্শ, নতুন চিন্তার উৎস নবজাতকের নবজাগ্রত চোখের আভায় মিলিয়ে আছে। তাই মনে হচ্ছে সমস্ত দেশটা যেন মরে যাওয়া বিত্তের

ভারে কঠিন পাষাণ হয়ে আছে। এই অন্ধকার রাত্রে আমার ঘুম না আসা, হাঁপধরা প্রাণের যেন দম বন্ধ করে দিচ্ছে। একটা অর্থহীন ঠাণ্ডা কালো ভয়, ধূসর পাথরের স্তব্ধ কঠিন মূর্তিগুলির সেটকরা চোখের ভিতর থেকে, ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে। আমার পাশে পাশে শুয়ে আছে, জীবন আর আনন্দ। আমার বুকের উপরে জমাট হয়ে জড়ো হচ্ছে, দুঃখ আর মৃত্যু।—

হয়ত এ আমার মনের ভুল—হয়ত কেন নিশ্চয়ই। মৃত্যুকে এদেশে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে বটে, তবু মৃত্যু এখানে জমে থাকে নি। জীবন তাকে প্রতিপদক্ষেপে অতিক্রম করে গেছে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি, নিজের অধিকার নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে ঈজিপ্ট,—বাঁচার অধিকার। নিজের কর্মশক্তির পরে অখণ্ড আত্ম-বিশ্বাস না থাকলে,—এই মনোবল সংগ্রহ করা কঠিন। যে কাজ করে, সে মরে না। ঈজিপ্টও মরে নি। যা দেখেছি, তা শুধু মৃত মানুষের কঙ্কাল। শাশ্বত মানুষ আজো ঈজিপ্টের সত্যনিদ্রোত্থিত প্রভাতী চিত্তের মধ্যে বসে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে। তবু সেদিন আমার প্রাণ-হাঁপানো বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল কবর খোঁড়া মৃতদেহের সারি। মাঝে মাঝে কষ্ট করে অন্ধকারের মুখোমুখী দু'চোখ মেলে দিতে চেষ্টা করলাম, জানলার বাইরে। ঘরের চেয়ে দূরের চাওয়ায় আরাম বেশী চোখের।

দেখতে দেখতে চাঁদ ডুবে গেল,—নীরন্ধ্র অন্ধকারে প্লাবিত হোল দিক। জন্মমুহূর্ত থেকে যে মৃত্যু প্রাণের উপরে চেপে বসে আছে, তার ভার মর্মে মর্মে পীড়িত করতে লাগল। তখন বিনিদ্র রাত্রিশেষে দয়াপরবশ বিধাতা কোটি যোজন দূর থেকে শান্ত একটা নরম আলো ঘর ভরে পাঠিয়ে দিলেন আমার জন্যে। সেই আলোর অমৃত আস্বাদ গ্রহণ করে সর্বচেতনার দ্বারা শান্ত জীবনরস পান করতে করতে আমার ক্লান্ত চোখ আরামে ঘুমিয়ে পড়ল।